সমকালীন

পাঞ্জাবী গল্প

অনুবাদ ও সম্পাদনা
শ্যামল ভট্টাচার্য

অক্ষর পাবলিকেশনস্
আগরতলা ত্রিপুরা

samakalin punjabi galpa
translated from original gurumukhi & edited by shyamal bhattacherjee

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ২০০২
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মানিক দেব
ISBN-81-86802-44-1
অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক অনিল লিথোগ্রাফিং কোং ১৩ শশীভূষণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত এবং কৃষ্ণনগর আগরতলা থেকে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।
মূল্য একশ' পঞ্চাশ টাকা

উ.ৎ.স.র্গ

ত্রিপুরার সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক
বিমল চৌধুরী
কালিপদ চক্রবর্তী
সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির
উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

১৯৮৭ সালের মে মাসে রাজস্থানের যোধপুর শহর থেকে আমার বদলি হয় পাঞ্জাবে। তখন আমি ও কয়েকজন বন্ধু রাজস্থানের প্রথম বাংলা পত্রিকা 'সূর্যনগরী' করতাম। কাজেই ঐ স্বপ্নের শহর ছেড়ে আসা আমার পক্ষে কতটা কষ্টকর ছিল তা অনুমেয়। কিন্তু কী করবো, চাকরি জীবনে নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার স্থান কোথায়? সৈনিকের জীবনে তো প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৮৭ সালের ১৯শে জুন আমি পাঞ্জাবের সাংগ্রুর জেলার ছোট্ট শহর বারনালা পৌঁছুই। তখন পাঞ্জাবে আতংকবাদের ভয়াবহতা চরম শিখরে। সেজন্যেই আগরতলার বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠি লিখতে হতো। কোন সপ্তাহে কোন কারণে চিঠি না পৌঁছুলে মা-বাবার মুখ শুকিয়ে যেত। কোয়ার্টারে থাকতাম। ডিউটির পর এয়ারফোর্স স্টেশানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ও অনুমতি খুবই কম পেতাম। তবু ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষজনের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়েই যাচ্ছিল। ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে হঠাৎই একদিন পাঞ্জাবী ঔপন্যাসিক ও কবি ওমপ্রকাশ গাসোব সঙ্গে পরিচিত হই। আমি ওর হিন্দীতে অনুদিত উপন্যাস 'বিখরী বিখরী বাতে' পড়ি, ওর দীর্ঘকবিতা 'নীম দী ছায়াতলে' বাংলায় অনুবাদ করে 'পূর্বমেঘ' সম্পাদক নকুল রায়কে পাঠাই। গাসো-ই আমাকে রামসরূপ আণখীর কাছে পাঠান। সেই বছরই অণখীর উপন্যাস 'কোঠে খড়ক সিং' ১৯৮৭ সালের ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পেয়েছিল। আমি ওর হিন্দীতে অনুদিত গল্পসংগ্রহ 'বাতুনী লড়কী' এবং ইংরেজীতে অনুদিত গল্পসংগ্রহ 'The Wrinklcs' পড়ি। পাঞ্জাবী জীবনযাত্রার কিছু আঁকাড়া চিত্র আমার কাছে স্পষ্ট হয়। এর থেকে দু-তিনটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করে ত্রিপুরার 'দৈনিক সংবাদ', 'ত্রিপুরা দর্পণ' ও কলকাতার 'অনুবাদ পত্রিকা'য় পাঠাই। পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্পর্কে রামসরূপ আণখীর একটি সাক্ষাৎকারও 'অনুবাদ পত্রিকা' ছাপে। এছাড়া ত্রিপুরা দর্পণে প্রকাশিত হয় তরুণ পাঞ্জাবী গল্পকার জোগিন্দ্র সিংহ নিরালার 'শতুরমূর্গ'। ইতিমধ্যে আণখীর 'জখমী অতীত' গল্পসংগ্রহ ছেপে আসে, তা থেকেও কয়েকটা গল্প আমি অনুবাদ করি, সেগুলি ত্রিপুরার 'একুশ শতক' ও কলকাতার 'অনুবাদ পত্রিকা'য় ছাপা হয়। ১৯৯১ সালের শেষে আমি গুরুমুখী লিপি শিখে ওঠার আগেই লাদাখ বদলি হয়ে যাই। সেই থেকে প্রায় ছ'বছর পাঞ্জাবের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল আণখীর চিঠি, ওর পরবর্তী গল্পসংগ্রহ 'কহাঁ যাও' এবং 'কমরেড মনশা রাম'-এর মধ্যে সীমিত। ১৯৯৭-র শেষে কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে আবার পাঞ্জাবে বদলীর আদেশ পেয়ে আমার মনে মিশ্র অনুভূতি হয়। কলকাতা ছাড়ার কষ্ট এবং পাঞ্জাবে যাওয়ার আনন্দ। সপরিবারে জলন্ধর পৌঁছুনোর কিছুদিন পর রামসরূপ আণখী এখানে আসেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কথা সাহিত্যিক জসবন্ত সিংহ ভিরদী ও তরুণ গল্পকার দেশরাজ কালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে অণখী বলেন, এবার তুমি গুরুমুখী শিখে সরাসরি পাঞ্জাবী থেকে অনুবাদ করো আর আমাদেরকে মহাশ্বেতা দেবী

পরবর্তী বাংলা গল্প ও গল্পকারদের সঙ্গে পরিচয় করাও। ওর প্রস্তাব আমার খুব ভাল লাগে। এবং সেই থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবীর সমকালীন কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অনুবাদের কাজে হাতে বাড়াই। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাঙালী পাঠকদের হাতে এই গল্পগুলি তুলে দিতে পারছি।

প্রথমেই স্বীকার করে নিই যে জীবিত সকল পাঞ্জাবী গল্পকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়নি। রামসরূপ আণখী সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'কহানী পাঞ্জাবী'-এ সমস্ত গল্পকারের কাছে আমন্ত্রণ জানানো হয় ১৯৯৮ সালের মে মাসে। সেই থেকে অনেকের গল্প ও গল্পসংকলন আমার কাছে এসেছে। এছাড়া ইতিহাসের স্বার্থে আমি কয়েকজন অগ্রজ গল্পকারের গল্প কয়েকটি সংকলন থেকে অনুবাদ করেছি। কাজেই কোনরকম সম্পূর্ণতার দাবী আমি করি না, কোন ভাষার কোন সংকলনই সম্পূর্ণ হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। পরবর্তী সময়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিগুলি অনুবাদের ইচ্ছা রাখি।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতনই পাঞ্জাবী গল্পের উৎস নানা লোককথা, ধর্মকথা, আর লোকজীবনের নানা প্রেমকথায় নিহিত। আজ যে শিল্প প্রকরণকে আমরা গল্প বলি আর পুরাতন লোকগাঁথা থেকে আলাদা করি, গঠনগতভাবে তা আধুনিক পাশ্চাত্য ছোটগল্পের কথন আর সম্প্রেষণ দ্বারা প্রভাবিত একথা অস্বীকার করা যায় না। কোন ভারতীয় ভাষার ছোটগল্পই পাশ্চাত্য গল্পশৈলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও পাঞ্জাবী গল্প নিজস্ব সজীবতা ও শিল্পশৈলীকে লোকশৈলী ও লোকশিল্পের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে।

কয়েকজন সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আধুনিক পাঞ্জাবী গল্পের সূত্রপাত খ্রীষ্টান মিশনারীদের হাতে হয়েছে বলে দাবী করেন। অবিভক্ত পাঞ্জাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্মপ্রচারের খাতিরে বাইবেলের গল্পগুলিকে স্থানীয় রঙ দিয়ে ওরা গুরুমুখী লিপিতে প্রকাশ করেন। কিন্তু ঐ গল্পগুলিতে খ্রীষ্টধর্মীয় দর্শন স্থান কাল পাত্রের মানবিক সত্যকেও ছাপিয়ে গেছে। পাঞ্জাবী গল্পের বিকাশে এই গল্পগুলির কোনই ভূমিকা আছে বলে বেশীরভাগ আলোচক স্বীকার করেন না।

পাঞ্জাবী লোক সংস্কৃতি এত প্রগাঢ় এবং সমৃদ্ধ যে তা থেকে আলাদা করে শিল্প সংস্কৃতির কোন প্রকরণকেই ভাবা যায় না। সেই প্রগাঢ় ও পরিপুষ্ট পরম্পরাই পাঞ্জাবী ভাষাকে বিকশিত করেছে আর সাহিত্য ধারাকে সততার সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে আগলে রেখেছে মায়ের মতন। এজন্যেই অন্য প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার মতন যথার্থতার সঙ্কট কখনো পাঞ্জাবী ভাষাকে সমস্যায় ফেলেনি।

পাঞ্জাবী গল্পের বিকাশকে দু'জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা সাহিত্যিকের আলোচনা থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। শ্রী জসবন্ত সিংহ ভিরদীর মতে, "পাঞ্জাবী গল্পের এই প্রগতি কয়েকশো বছরের বীক্ষার ফসল নয়, কেবলমাত্র পঞ্চাশ বছরের প্রচেষ্টাতেই পাঞ্জাবী গল্প বিশ্বমানে পৌছে গেছে।" পাঞ্জাবী গল্পের আদিপুরুষদের খোঁজ করতে গিয়ে শ্রীগুরুবচন সিংহ ভুল্লরের কাছে জানতে পারি, পাঁচজন গল্পকারকে আমবা আধুনিক পাঞ্জাবী গল্পের স্থাপক বলে মেনে নিতে পারি। এরা হলেন ভাই মোহন সিংহ বেইদ, লালসিংহ কমলা অকালী, চরণসিংহ শহীদ, নানকসিংহ এবং গুরুমুখসিংহ মুসাফির। এরা সবাই 'সিংহ সভা আন্দোলন' দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এদের গল্পে ছিল সামাজিক ও চারিত্রিক শোধনবাদ এবং নৈতিক মূল্যের আস্থাবাদী প্রচার।

আধুনিক পাঞ্জাবী গল্পের আদিপুরুষদের প্রসঙ্গে জসবন্ত সিংহ ভিরদী ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর মতে, "পাঞ্জাবী গল্প সাহিত্য 'আদি জনম সাখী'কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই 'জনম সাখী' কয়েকশো বছর আগে লেখা, এর সঙ্গে আধুনিক গল্প সাহিত্যের কোন সম্পর্ক রয়েছে বলে আমি মনে করি না। আধুনিক পাঞ্জাবী গল্পের জন্ম ১৯৩৫ নাগাদ হয়েছে। চার গল্পকার সন্ত সিংহ সেখোঁ, সুজান সিংহ, মোহন সিংহ এবং কর্তার সিংহ দুগ্গল। এরা প্রত্যেকেই যথার্থবাদী লেখক। সন্তসিংহ সেখোঁ শুরুতে ইংরেজীতে লিখতেন, পরে তিনিই প্রথম পাঞ্জাবী পাঠককে আধুনিক ছোটগল্প উপহার দেন। গল্পটির নাম 'ভত্তা'।

প্রখ্যাত আলোচক প্রয়াত হীরাসিংহ দর্দ 'এপাঞ্জাবী সঘঁরা' (১৯৪০) গল্প সংগ্রহের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার পড়া প্রথম পাঞ্জাবী ছোটগল্প লালসিংহ কমলা অকালী রচিত ধার্মিক গল্প 'কমলা অকালী' সম্ভবত ১৯২১ সালে 'অকালী' সমাচারপত্রে ছাপা হয়েছিল।"

এই গল্পটির কোন অস্তিত্ব কোন গবেষকই খুঁজে বের করতে পারেননি আর কেউ কোন খানে এর কথাও উল্লেখ করেননি। এমনকি হীরাসিং দর্দ নিজেও তাঁর সম্পাদিত গল্পসংগ্রহে ঐ গল্পটি ছাপেননি।

উপরে শ্রী গুরবচন সিংহ ভুল্লরের আলোচনায় যে সিংহ সভার কথা বলা হয়েছে সেই সাংস্কৃতিক -রাজনৈতিক আন্দোলনকালে প্রচুর গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছিল। এখানে আমি এযাবৎ পড়াশুনার পর একথা বলার সাহস করি যে এই শিখ জাগরণের ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এমনকি লোক সংস্কৃতি চর্চাও কেবল শিখদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলতঃ এহেন সজীব একটি ভাষা জাতিবাদী টুকরায় ভাগ করে দেখা হয় এবং কেবল শিখদেরকেই পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রাধান্য দিয়ে পাঞ্জাবী হিন্দু এবং পাঞ্জাবী মুসলমানদের থেকে আলাদা করার সঙ্কীর্ণ প্রয়াস করা হয়। এমনকি দিল্লীবাসী ইংরেজী লেখক খুশবন্ত সিংহও এই সঙ্কীর্ণতার শরিক। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে আমি পড়ি, "সিংহ সভার আন্দোলনের কৃতিত্ব লেখকদের শিখ ধর্মের বিকাশে নিজেদের বৌদ্ধিক যোগদান। যিনি এই উদ্দেশ্যে সবচাইতে বেশী কাজ করেছেন তিনি হলেন ভাই বীর সিংহ। এতদিন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা স্থূল এবং অনৈতিক শিখরাজ্যের নিন্দা করতেন আর লিখতেন যে ইংরেজরা তার খোলনলচে পাল্টে অনেক সুসভ্য রাজত্ব কায়েম করেছে। সংস্কৃত পন্ডিতরা (সম্ভবতঃ আর্যসমাজীদের কথা বলছেন) শিখধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতেন যে 'গ্রন্থসাহিব' হলো 'বেদ' সমূহের নিতান্ত দরিদ্র অনুকরণ; তাঁরা শিখধর্মের বাহ্য রূপ ও সঙ্কেত সমূহকে (পঞ্চ 'ক' ইত্যাদি) 'জংলী' আখ্যা দিতেন। (সেই সময়ে লেখা) ভাই বীরসিংহের 'সুন্দরী', বিজয় সিংহ, সৎবন্ত কৌর এবং বাবা নৌধসিংহের উপন্যাসের বিষয় শিখদের বীরত্ব এবং বাহাদুরী নিরূপন.......।" রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সম্পর্কে খুশবন্ত সিংহের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলি আমি আগেই জানতাম। এবং তাঁর লেখা সফ্‌ট পর্ণো সাহিত্য সম্পর্কেও অবগত রয়েছি বলে এই মন্তব্য পড়ে আমি খুব একটা অবাক হইনি।

এখানে বলে রাখা উচিত পাঞ্জাবী শিখদের ভাষা হলেও কেবলি শিখদের ভাষা নয়। পাঞ্জাবী ভাষাকে তাই পাঞ্জাবী হিন্দু, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং পাঞ্জাবী শিখদের ভাষা বলে আলাদা কোঠায় ভাগ করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ওরা পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতিই করেছেন। পাকিস্তানের পাঞ্জাবী লেখকরা গুরুমুখী লিপিতে সাহিত্য রচনা না করে আরবী লিপিতে করেন, ফলতঃ এতে আরবী ফারসী শব্দাবলীর সরাসরি অনুপ্রবেশ ও প্রভূত পরিমাণে অপভ্রংশ সৃষ্টির সুযোগ থেকে যায়। তবুও বলতে পারি পাঞ্জাবী ভাষা আর পাঞ্জাবীয়ত-কে ১৯৪৭ এর দেশবিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত করলেও বিভাজিত করতে পারেনি। পাঞ্জাবী ভাষাও কেবল শিখদের ভাষা হয়ে থেকে যায়নি।

গুরবচন সিংহ ভুল্লর প্রথম পর্যায়ের লেখকদের নাম করতে গিয়ে চরণ সিংহের নাম করেছেন। কোন কোন আলোচক চরণ সিংহের গল্পের মৌলিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়া মোহনসিংহ বেইদ ও বলবন্তসিংহ চৎরথের মতন তৎকালীন বাকী লেখকদের গল্পে ধর্মীয় নৈতিক

মূল্যবোধই প্রাধাণ্য পেয়েছে। কোনরকম শৈলী বা শিল্পকৃতির (এঁরা) ধার ধারেননি।

১৯২০ থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যবর্তী সময়কে পাঞ্জাবী কথা সাহিত্যের সম্ভাবনার যুগ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। গুরুবক্স সিংহ, গ্যানী হীরাসিংহ দর্দ, জোশুয়া ফজলদীন, গুরুমুখসিংহ মুসাফির, চরণসিংহ শহীদ ও নানক সিংহ পাঞ্জাবী গল্প রচনার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। কিন্তু এরা বীক্ষা ও মননে পূর্বজদের থেকে অনেক আধুনিক হলেও কেউই গল্প রচনার ক্ষেত্রে কথকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি।

তাই জসবন্ত সিংহ ভিরদীর বক্তব্যকে আমাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তার মতে প্রথম সফল আধুনিক গল্পকার সন্তসিংহ সেখোঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ 'সমাচার' ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় সোহন সিংহ জোশ লেখেন—সন্তসিংহ সেখোঁ আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্যেই প্রথম পাঞ্জাবী পত্রিকা 'প্রভাত'-এ লিখতে শুরু করেন এবং 'প্রভাত'-ই প্রোফেসর সেখোঁর প্রথম দুটি গল্প 'ভত্তা' এবং 'কীটাঁ অন্দর কীট' ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভিরদীর মতে এই 'ভত্তা' গল্পের মাধ্যমেই আধুনিক পাঞ্জাবী ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু।

এ সময়ই পাঞ্জাবী ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রভাত, লিখারী এবং পঞ্চ দরিয়ার সম্পাদকরা শুরু থেকেই যথার্থবাদী কথা সাহিত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই সময়েই বাংলায় কল্লোল যুগের লেখকরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। হিন্দীতে প্রেমচন্দ্রের যথার্থবাদী ধারা সমগ্র গদ্য-সাহিত্যকেই প্লাবিত করে দিয়েছে। হিন্দীতেও 'কফন'-এর মতন গল্প লেখা হয়ে গেছে। তখনই সন্তসিংহ সেখোঁ 'ভত্তা' আর সুজান সিংহ 'ভুলেখা'র মতন গুরুত্বপূর্ণ যথার্থবাদী গল্প লিখলেন। অন্য কোন ভাষার গদ্য-সাহিত্য পাঞ্জাবী ছোটগল্পকে তেমন প্রভাবিত করেনি।

ঐ সময়ে পাঞ্জাবী গল্পের অগ্রগতিতে বিজয়কেতন উড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন শ্রীকর্তার সিংহ দুগ্গল। দুগ্গলের গল্পগুলিতে পাঞ্জাবের মাটি ও মানুষের সঘন সত্য নতুনভাবে ফুটে ওঠে। তিনি এখনো বেঁচে আছেন, রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হয়েও মাঝেমধ্যে গল্প লিখে যাচ্ছেন। সে জন্যেই আমার পছন্দের পাঞ্জাবী গল্প সংকলনে তাঁর গল্প 'চাঁদনী রাত দী এক দুখান্ত'কে 'অভিসার' নামে ছাপা হলো।

সেই সময়েই প্রোফেসার মোহন সিংহ, অমৃতা প্রীতম ও দেবেন্দ্র সত্যার্থীর মতন শক্তিশালী লেখকরা পাঞ্জাবী কথা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। এরা পাঞ্জাবী মন ও মানব জীবনের সত্যকে পেঁয়াজের খোসার মতন ছাড়ান আর নিজস্ব বীক্ষা ও মননে পাঞ্জাবী গল্পকে স্বতন্ত্র করে তোলেন। তারপর আসে ভারত বিভাগের সেই কালখন্ড যা বিশেষ করে পাঞ্জাবী ও বাঙালী মানসকে বাংলা ও পাঞ্জাবের জনজীবনকে রক্তাক্ত করে দেয়। সেজন্যেই দেশবিভাগের প্রভাব এই দুই ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে যতটা ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে, উর্দু, হিন্দী বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে তার সিকিভাগও সম্ভব হয়নি। বাংলা ও পাঞ্জাবের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ঘর সংসার তখন রক্তগঙ্গায় প্লাবিত হয়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, নরহত্যা, গণধর্ষণ ও লুণ্ঠন বাংলা ও পাঞ্জাবের জনজীবনকে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু এটাই ঐতিহাসিক সত্য যে অন্য যেকোন ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক বেশী এই দুই ভাষার কবি, কথাসাহিত্যক ও নাট্যকাররা ঘৃণা ও মৃত্যুর শ্মশানভূমিতে সৌহার্দ্য, সদ্ভাব ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। বাংলার মতন পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যেও লাগাতার নরহত্যা, ঘৃণা এবং বৈষম্যকে নস্যাৎ করে ব্যাপক মানবিক মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিস্থাপিত করেছে। না হলে বিভাজনের মতন ঘটনায় বিশ্বের কোন কোন ভাষা ও সাহিত্যের মতন এদেশেও ভাষাই নরহত্যা ও প্রতিশোধের আগুনকে আরো ছড়িয়ে দিতে পারতো। আর এই দুই প্রান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মনীষীদের দর্শন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধের পরম্পরাকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। সেই ক্রান্তিলগ্নে পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যিক কর্তারসিংহ দুগ্গল, অমৃতা প্রীতম, সন্তসিংহ সেখোঁ, সুজান

সিংহ, মোহন সিংহ ও দেবেন্দ্র সত্যার্থীরা এই মহান মানবিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলস্বরূপ স্বাধীনোত্তর ভারতীয় পাঞ্জাবী সাহিত্যে এক মানবতাবাদী, যথার্থবাদী ঢেউ ওঠে। কুলবন্তসিংহ বির্ক, সন্তোখসিংহ ধীর, নবতেজ সিংহ, মোহিন্দর সিংহ সরনা, দলীপ কৌর টিওয়ানার মতন লেখকরা তাদের মানবতাবাদী বীক্ষাকে গল্পের মাধ্যমে পাঞ্জাবী মানসকে এক সমৃদ্ধ মননে লালিত করেন। এই লেখকরাও বিভাজনের বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলের পোঠোহারী ভাষাকে পাঞ্জাবী ভাষায় আত্মস্থ করার কাজে সফল হয়েছিলেন (এ জন্যে পাকিস্তানবাসী পাঞ্জাবী আলোচকরাও দুগ্গলের প্রশংসা করেন); স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একই ধরনের কাজ করেন কুলবন্তসিংহ বির্ক। লাহোর পাকিস্তানে চলে গেলেও লাহোরী পাঞ্জাবীর প্রবাদ প্রবচনগুলি যাতে হারিয়ে না যায় পাঠকরা ভুলে না যায়, কালের স্রোতে হারিয়ে না যায় কুলবন্ত সিংহ বির্ক ও অন্য কয়েকজন লেখক নিয়মিত কলমচালনায় সেই চেষ্টায় সফল হন। এরা পাঞ্জাবী ভাষাকে ব্যাপক মানবিকবোধে সমৃদ্ধ রেখে পাঞ্জাবী মানসকে সীমিত হতে দেননি। উপরন্তু এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে—রাজনীতির ষড়যন্ত্রে দেশবিভাগ ও দাঙ্গার অন্ধকার সাময়িকভাবে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিলেও শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধের কাছে তা নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য। একইভাবে ওপার পাঞ্জাবের লেখকরাও রক্তের নদী পার করে মানবিক সমস্যা নিয়ে অনবরত লিখতে থাকেন।

পাঞ্জাবী গল্পের এই সোনালী সফরে যথার্থবাদী রচনাশৈলী ছিল লেখকদের মূল অস্ত্র। এরপরেই পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার কাজে এগিয়ে আসেন জসবন্ত সিংহ ভিরদী, রামসরূপ আণখী, অজিত কৌর, গুলজার সিংহ সন্ধু, গুরদিয়াল সিংহ, প্রেমপ্রকাশের মতন শক্তিশালী লেখকেরা। এরা যথার্থবাদকে ভেঙ্গে (নস্যাৎ করেননি) জড়তার মধ্য থেকে নতুন মানব সত্য উদঘাটিত করেন। প্র ্যেক ভাষার সাহিত্যেই যখন এমন মোড় আসে, আর জড়তা ভাঙ্গার কাজে একদল স্রষ্টা এগিয়ে আসেন। গবেষক ও সমালোচকরা এই নতুন ধারাকে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে স্থাপিত করে লিখতে শুরু করেন। এবকম বিভাজনেব মাধ্যমে সাহিত্য বিশ্লেষণ সমালোচকদের কাছে সুবিধাজনক। তাই এরা দুগ্গল, অমৃতা প্রীতম থেকে শুরু করে দলীপ কৌর টিওয়ানা অব্দি লেখকদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখক আর ভিরদী, আণখী, সন্ধু, গুরদিয়াল সিংহ, প্রেম প্রকাশদের তৃতীয় পর্যায়ের লেখক বলেন। পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যে নতুন ধাবা যথার্থতার জড়তাকে ভেঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যথাসময়ে নতুন যথার্থের উদঘাটন করে। আসলে প্রত্যেক ভাষাতেই একটা সময়ে একদল লেখক কোন বিশেষ ভাবধারা নিয়ে লিখতে লিখতে একঘেয়ে হয়ে পড়েন। এই একঘেয়েমিই সৃষ্টি করে এক অদ্ভুত দমবন্ধ জড়তা। ঐ ভাষার সাহিত্যেব মূলধারার পাঠকদের সাহিত্য বিমুখ করে তোলে। ভিতরে ভিতরে খলবল করতে থাকা সত্য অভিব্যক্তিগুলি নতুন মাত্রায় প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের এই লেখকরা পাঞ্জাবী গল্পে এই অভিব্যক্তি ও মননকে নতুন মাত্রা প্রদান করে যথার্থবাদী গল্প পবম্পরার খোলনলচে পাল্টে শিল্পেব সত্যকে মহিমামন্ডিত করেন। এদের হাতে পাঞ্জাবী গল্প আবার নিজস্ব লোক সংস্কৃতি ও লোক পরম্পরার সঙ্গে একাত্মতা আবিষ্কার করে। এরা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আর স্বপ্নকে শিল্পান্বিত করেন। নিয়তিবাদী ধর্মীয় সাহিত্যের চোরাবালি থেকে পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যকে উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখকরা শুরু করেছিলেন, জাতিবাদী শিখবাদী প্রবণতার বিপরীতে মানবিক মূল্যবোধের এই জয়ধ্বজা তৃতীয় পর্যায়ের লেখকরাও সযত্নে বহন করেন এবং তাকে লোক সংস্কৃতি ও লোক পরম্পরার গভীরে প্রোথিত করে পাঞ্জাবী গল্পকে শুধু অন্য ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের সমকক্ষ করে তোলেন না, বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির পাশাপাশি নিয়ে দাঁড় করান।

বছর দশেকের মধ্যেই এই পর্যায়ের লেখকদের সাহিত্য সাধনাকে আরো জোরদার করে তোলেন একদল নব যুবক। তখন পাঞ্জাবেও পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের নকশাল আন্দোলনের ঢেউ

আছড়ে পড়ছে। মোহন ভান্ডারী, রঘুবীর ঠন্ড, গুরবচন সিংহ ভুল্লর, গুরুদেব সিংহ রূপানা, সুখবন্ত কৌর মান, বরিয়ম সিংহ সন্ধু, কেবল সুদ, রাজিন্দর কৌর, হরভজন বটালভী, তরসেম নীলগিরী, গুরমেল মডাহড়, দেব ভরদ্বাজ, কাশ্মীর সিংহ পন্নু, কুলদীপ সিংহ বেদী, দরশান মিতবা, লে. কর্ণেল জসবীর ভুল্লর, কে এল গর্গ, জোগিন্দর সিংহ নিরালাদের গল্পে এই পরিবর্তিত সময়ের সন্দর্ভ উঠে আসে এবং যথার্থবাদী রচনাধারায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থা ও তার প্রভাব এবং পরবর্তী সময়ের অকালী রাজনীতির প্রভাব পাঞ্জাবী জনমানসে যে জটিলতা সৃষ্টি করে, নতুন লেখকরা সেই সন্দর্ভকে শিল্পান্বিত করেন।

কোন কোন ভারতীয় ভাষায় মহিলা লেখকদের আলাদাভাবে দেখা হয় এবং মহিলাদের মূল সাহিত্য ধারা থেকে আলাদা করে স্থান দেওয়া হয়। পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। পাঞ্জাবী লোকগাঁথা ও লোকসংস্কৃতিতে মহিলারা পুরুষদের পাশাপাশি সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত । পাঞ্জাবের লোক সংস্কৃতিতে পীর ফকিরদের প্রভাবও সর্বজনবিদিত। সুফী সংস্কৃতি ও সঙ্গীত পাঞ্জাবী লোক সাহিত্যের মতন সমানভাবে জনমানসে এই মানবিক ভাবনা, দুঃখ-সুখ, বিরহ আর মিলনের আকুতিতে এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত পরিবারেও বংশপরম্পরায় স্ত্রীদেরকে পুরুষদের থেকে আলাদা করে দেখা হয় না।

পাঞ্জাবী কথা সাহিত্য অন্য যেকোন ভারতীয় কথাসাহিত্য থেকে একদিক দিয়ে আলাদা। শতকরা নব্বুই ভাগ বা তারও বেশী পাঞ্জাবী গল্পে যে পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই পাঞ্জাবী লোকচরিত্রের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই পাঞ্জাবী পৌরুষ, দেশবিভাগ ও দাঙ্গাকে অতিক্রম করে ফিনিক্স পাখীর মতো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সম্পৃক্ত হয়। এই পৌরুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এপার পাঞ্জাব ওপার পাঞ্জাবের কথাসাহিত্যে সমভাবে বিশিষ্ট।

রাজনীতির ঘৃণ্য চক্রান্তে আটের দশকে এই পৌরুষই প্রথম দারুণভাবে অপমানিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়, পাঞ্জাবী পরিচয়ে ধাক্কা লাগে, গুরদুয়ারাগুলিকে 'স্বাধীন খালিস্তান' নামক এক বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণার আখরা বানিয়ে তথাকথিত শিখ পুনর্জাগরণের আতঙ্কবাদী আগুন এপার পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবী অধ্যুষিত দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাব আবার রক্তাক্ত হয় অপারেশান ব্লু স্টারের সময়, তার আগে ওপারে, একই কারণে ইন্দিরা হত্যা এবং দিল্লী তথা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ব্যাপক শিখ নিধন যজ্ঞে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারান। পৌরুষ দৃপ্ত পাঞ্জাবী জনমানস এক হাহাকার দীর্ণ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। একদিকে আতঙ্কবাদীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অপরদিকে আতঙ্কবাদ নিধনের নামে চরম পুলিশী অত্যাচারের ঐ অন্ধকার সময়ে আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে আসেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত পাঞ্জাবী কবি কথাসাহিত্যিক শিল্পী নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আতঙ্কবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করতে গিয়ে প্রাণ হারান অনেক নাট্যকর্মী, কয়েকজন তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিক। দুগ্গল-গুরদয়াল সিংহ অণখী-ভিরদী-প্রেমপ্রকাশ থেকে শুরু করে এযাবৎ উল্লিখিত প্রায় সমস্ত কথাসাহিত্যিকরাই তাদের লেখনীতে এই যুগপৎ নিধনযজ্ঞ ও মানবতার চরম অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের মনমোহন কৌর, তজিন্দর কৌর গুজরাল, অমর গিরী, অবতার সিংহ বিলিংগ, তলবিন্দর সিংহ, মাখন মান, বুটা সিংহ চৌহান, জোগে ভঙ্গলরাও তাদের কথাসাহিত্যে নীলকন্ঠের মতন এই বিষকে ধারণ করে এবং অগ্রজদের আলোকবর্তিকার সুযোগ্য ধারক ও বাহক হিসেবে মানবতার জয়গান গাইতে থাকেন। এদের সফল প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবী জনমানসে আতঙ্কবাদ বিরোধী ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং পাঞ্জাবী পৌরুষের পুনর্জাগরণে আতঙ্কবাদ ক্রমে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সংবাদপত্র ও সরকারী প্রচারযন্ত্র সমূহে ঢক্কানিনাদে দেশের মানুষ ভাবে সরকার ও পুলিশ কঠোর হাতে আতঙ্কবাদকে দমন করেছে। কিন্তু পাঞ্জাবী কবি, নাট্যকর্মী ও কথাসাহিত্যিকদের আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষা ছাড়া আতঙ্কবাদকে সমূলে উৎখাত করা, ধর্মীয় জাগরণের ঊর্ধ্বে মানবতাকে স্থাপন করা কোনমতেই সম্ভব হতো না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন, ধনতান্ত্রিক ভোগবাদের বিস্তার, তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র ধনতন্ত্রের সুবিধার্থে পণ্য সংস্কৃতির বিকাশ পাঞ্জাবকে এক আকাঙ্ক্ষার সংকটে দীর্ণ করে। আকাঙ্ক্ষার রাজনীতির পরিসরে প্রধান দুই দৃষ্টিভঙ্গী হল বিষয় নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী। প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহের সমগ্রতার সূত্রে যে নতুন অবয়ব তৈরী হয় তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার রাজনীতিকে স্থাপন করে নয়ের দশকে লিখতে আসা সুখজিৎ জিন্দর, দেশরাজ কালী, আজমের সিন্ধু, ভগবন্ত রসুলপুরী, অজয় শর্মারা সমস্যাটির সমসাময়িকতা ও ঐতিহাসিকতাকে এক সঙ্গে অনুধাবন করতে চান। আটের দশকের লেখকরাও এই সমস্যার যন্ত্রণাকে ধারণ করেন। পাঞ্জাবের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিখ মৌলবাদী এবং ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মৌলবাদের সঙ্গে আঁতাত কখনই প্রত্যাশামূলক অভিক্ষেপ হতে পারে না। কেননা তা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দূরত্ব তৈরী করে । পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যিকরা তাই বিষয়-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন স্তর, বর্গ, জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে প্রতিনিয়ত কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঞ্জাবী জনমানসে পৌরুষের পুনর্জাগরণে বিশ্ব পণ্যায়নের প্রতিবন্ধকতাকে হটিয়ে এক গভীর মানবিক সম্ভাবনা ও স্বপ্নের সম্পর্ককে পুনঃস্থাপিত করতে এরা কতটা সফল হবেন তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু পাঞ্জাবী কথা সাহিত্যিকদের এই প্রত্যাশামূলক অভিক্ষেপ আমাকে এই দুর্মর সময়ে বারবার উজ্জীবিত করে। গল্পগুলি লেখকদের বয়স অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ কাজে আমাকে রামসরূপ আণখী, জসবন্ত সিংহ ভিরদী, বরিয়ম সিংহ সন্ধু, দেব ভরদ্বাজ, গুরমেল মডাহড় এবং কেসরা রাম প্রভৃত সাহায্য করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। মুখাবয়ব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অগ্রজ দেবব্রত দেব বারবার আমার স্বপ্ন ও সাধনাকে ধারণ করেছেন বলে নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার প্রজ্ঞা, দীক্ষা ও মননকে কোন শব্দ দিয়ে সীমিত করতে চাই না।

আশা করি এই গল্পগুলি বাঙালী পাঠকের সামনে পাঞ্জাবকে নতুনভাবে মেলে ধরবে।

শ্যামল ভট্টাচার্য
ফেব্রুয়ারী ২০০২, আগরতলা

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। এই প্রকাশ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত এই গ্রন্থের অনুবাদক, সংগ্রাহক এবং সম্পাদক ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার ঔপন্যাসিক শ্যামল ভট্টাচার্যকে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব গল্প-পত্রিকা 'মুখাবয়ব'-কে, যাঁরা এমন একটি সংকলন প্রকাশ করতে আমাদের মূল সহায়তাটুকু করেছেন। এখানে উল্লেখ করি, গত ২০০০ সালের অক্টোবরে পাঞ্জাবের সাংগ্রুর শহরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখাবয়বের 'বিশেষ পাঞ্জাবী গল্প' সংখ্যা হিসেবে যে সংখ্যাটি বেরিয়েছিল—বর্তমান সংকলন তারই গ্রন্থ সংস্করণ মাত্র। যদিও এই গ্রন্থে কেসরা রামের গল্পটি যুক্ত হয়ে নতুন মাত্রা এনেছে। যে গল্পটি ওই সংখ্যায় ছিল না।

ভারতীয় সাহিত্যের আরও অনেকানেক ভাষায় রচিত রত্নসম্ভারের অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছে আমাদের অনেককালের। সেই ইচ্ছের প্রথম প্রয়াস এই সংকলন। আমরা পাঞ্জাবের সাহিত্যকারদের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা এই সংকলন প্রকাশে বহুতর সহায়তা করেছেন এযাবৎ। পাঠকদের মন ভরলে আমরা সার্থক হব।

শুভ্রব্রত দেব
ফেব্রুয়ারী ২০০২, আগরতলা।

গ. ল্প. ক্র. ম

যশবন্ত সিং কঁবল হারিয়ে যাওয়া পাগড়ি ১৭
কর্তার সিংহ্ দুগ্গল অভিসার ২৪
অমৃতা প্রীতম দুই নারী ২৯
সন্তোখ সিংহ্ ধীর মঙ্গো ৩৪
গুরদিয়াল সিংহ মনে করো ৩৯
প্রেম প্রকাশ বাবা ৪৪
রামসরূপ আণখী হাড্ডিগুলি ৫২
অজিত কৌর ওকে মেরো না ৫৫
জসবন্ত সিংহ্ ভিরদী পাগলের শিং ৬২
গুলজার সিংহ সন্ধু সম্পর্ক ৬৮
মোহন ভাণ্ডারী ঘোটনা ৭৩
গুরুবচন সিংহ্ ভুল্লর জ্বলন্ত চোখ ৭৮
দলীপ কৌর টিওয়ানা দেওয়াল ৮৭
রাজিন্দর কৌর নিজস্ব শহর ৯০
হরভজন বটালভী সন্তান ৯৪
বরিয়ম সিংহ সন্ধু ভাগের মা ৯৭
গুরুমেল মডাহড় পূরবিয়ে ১০৩
দেব ভরদ্বাজ দ্রোণাচার্য হাজির হো! ১০৬
কাশ্মীর সিংহ পন্নু শো পিস ১১১
জস্‌বীর ভুল্লর মরণ মাটি ১১৭
কৃষণলাল গর্গ হাতের ময়লা ১২৩
জোগিন্দর সিংহ্ নিরালা উটপাখী ১২৮
তেজিন্দর গুজরাল ক্ষিদে ১৩৪
কুলদীপ সিংহ্ বেদী সুব্রহ্মণিয়মও বলে উঠলো ১৩৫
গীতা ডোগরা মিট্‌ঠু ১৪০
অমর গিরি ঘা ১৪৩
জিন্দার আত্মজ ১৪৮
অবতার সিংহ্ বিলিংগ উড়ে যাওয়া অশ্বত্থ ১৫৫
মনমোহন কৌর মাকড়সা ১৬২
প্রেম গোরখী রামপুরাফুলের টিকিট ১৬৭
তলবিন্দর সিংহ্ অন্তঃশীলা ১৭২
মাখন মান ঘুঁটে ১৭৯
বুটা সিংহ চৌহান মেয়ের বিয়ে ১৮৫
জোগে ভঙ্গল হারানো হাসি ১৯০
বলবীর পরওয়ানা ভুলে যাওয়া ১৯৪
ডাঃ অজয় শর্মা ছাব্বিশ ইঞ্চির কালো সাইকেল ১৯৬
বীণা ভার্মা লেপ ১৯৮
বিন্দর বাসরা ডানপাশ ২০৮
কেসরা রাম অসুস্থ মানুষ ২১১
রাজীব শেঠ সুরভির সন্ধানে ২১৫
ভগবন্ত রসুলপুরী কীট ২৮১
আজমের সিদ্ধু ডাইনোসর ২২১
দেশরাজ কালী টিকটিকি ২২৬

সমকালীন পাঞ্জাবী গল্প

যশবন্ত সিং কঁবল

হারিয়ে যাওয়া পাগড়ি

আধাভেজা শরীর, উস্কখুস্ক চুল, খালি মাথায় ঝুটিবাঁধা আর কানের উপর ঝুলে থাকা চুলগুলি কানের দুপাশে লেপ্টে গেছে। ও মস্ত থেকে বোতাম খোলা বুশশার্ট বাতাসে উড়িয়ে হাটছে। পায়জামাটা হাঁটুঅব্দি কাদায় মাখামাখি, দু-এক জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। কাটাঝোপের মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে হাত ও কনুই-এর নানা জায়গায় কাঁটাখোচা ও রক্তাক্ত। উঁচু-নীচু পথে ও এমন টলোমলো পায়ে হাঁটছে যেন এই একটু আগেই আদম ওকে অমরলোক থেকে বের করে এনেছে।

সমুদ্রের ঢেউয়ে ডুবে ডুবে ভেসে ওঠা নৌকোর মতন উঁচু নীচু রাস্তায় জীপটাকে এক ফার্লং দূর থেকেই কখনো পুরো দেখা যায় আর কখনো আধা। ও বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়। জীপ আরও একদম মুখোমুখি হলে দারোগা ঘাবড়ে নিজের রিভলবারে হাত রেখে ড্রাইভার সিপাহীকে বলে, দাঁড়াও সীতারাম।

সামনে এগিয়ে আসতে থাকা শিখ যুবকের হাতে কোন অস্ত্র নেই দেখে ও বলে, 'সন্তে, গুলী চালিও না! শালাকে দেখে মনে হয় ভূতের দেশ থেকে আসছে! হয়তো কোন ক্লু পাব!"

দারোগা বুক ফুলিয়ে জীপ থেকে নামে। রাশভারী চালে এগিয়ে যায়। বাকী তিন সিপাহী পেছন পেছন জীপ থেকে নেমে বন্দুক তাক করে এগিয়ে আসে। দারোগা গর্জন করে ওঠে, "হাত উপরে তোল!"

ও হাত উপরে উঠিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকায় যেন কতদিনের পরিচিত। দারোগা একজন সিপাহীকে আদেশ দেয়, "সীতারাম এর তালাশী নাও!"

খালিমাথা যুবকটি বলে, "কোন লাভ নেই, আমি মূর্তির মতন নিঃস্ব!"

"কোত্থেকে আসছিস?"

"ওখান থেকে, ও-ই পার থেকে!" ও নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে।

"তুই সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্তচর? কী খবর নিয়ে যাচ্ছিস বল!" দারোগার সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। সীতারাম বলে, সাহেব, এ তো মদ খেয়ে চুর! গন্ধ বেরুচ্ছে।

— সাহেব, ওরা খাইয়ে দিলো, ওখানে, চোলাই মদের ভাটি আছে কিনা!

দারোগা এগিয়ে ওর হাতটাকে ভালভাবে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, "কোথাকার ভাটী?"

ও সহজ জবাব দেয়, মন্ডেই, আপনারা ধরবেন না জানি, গত পরশুই ওরা থানায় মাসোহারা

জমা করেছে!

দারোগা মাসোহারার কথা শুনে থতমত খেয়ে যায়। তারপর ওর মনে পড়ে, আমি তো এখানে রিপ্লেসমেন্টে এসেছি! ও গভীর দৃষ্টিতে যুবকটিকে দেখতে থাকে আপাদমস্তক। শালা, ভদ্রলোকের মতন গুছিয়ে কথা বলছে!" ও তবু রোয়াব দেখানোর জন্যে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, "তোর নাম কী?"

"জী, নাঙ্গা সিংহ!"

"নাঙ্গা না জঙ্গা?"

"না নাঙ্গা!" ও বুক চিতিয়ে জবাব দেয়।

"শালা, এটা একটা নাম হলো? কোন গ্রামে বাড়ি তোর?" ও ছেলেটার হাত ধরে জোরে ঝাঁকায়। কিন্তু ছেলেটা সটান দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, "জী, এখন তো মনে করুন পুরো পাঞ্জাবই আমার গ্রাম!"

দারোগা ভাবে, শালা উল্টোপাল্টা বলছে! আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে এর নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। যেমন জোর গলায় কথা বলছে, হয়তো ও নিজেই উগ্রবাদী, এমনকি ওর নামে পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা হয়ে থাকতে পারে। থানার ফাইল দেখলে বোঝা যাবে। ওকে নরমভাবে বলে দেখা যাক, হুঁশিয়ারীতেই বেশী সফলতা আসে, ও নাঙ্গা সিংহের কাঁধ থপথপায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, "তুই মন্ডে কী নিতে গেছিলি?

"আমার ছোটভাইকে খুঁজতে গেছিলাম।"

"কেন?"

"ব্লু স্টারের সময় আমার পাগড়ি হারিয়ে গেছিল, সেটা একসঙ্গে খুঁজবো বলে।"

"আচ্ছা, তুই ব্লু স্টারের সময় ভেতরে ছিলিস?" আশ্চর্য দারোগার সারা শরীরে একটা খুশীর ঢেউ খেলে যায়। ওর মনে হয়, ব্যাস, কাঁধে তৃতীয় স্টারটি লাগলো বলে!

"জী ছিলাম তো ভেতরেই, তিন তারিখ সরকারী লাউডস্পিয়ারে ঘোষণা হলো যে ভেতরে আটকে থাকা সবাই তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এসো, একটু পরেই গুলী চালানো হবে। আমরা বাইরে বেরুতেই কারফিউ জারী হয়ে যায়। সন্ত্রস্ত দৌড়ঝাপে আমার পাগড়িটা নিচে পড়ে যায়। আমি লোকের ভীত সন্ত্রস্ত ধাক্কায় অনেক দূর চলে আসি!"

ওর কানের পাশে উড়ে উড়ে কানে সুড়সুড়ি দেওয়া চুলগুলিকে নাঙ্গা সিংহ ঝুটির নীচে গুঁজে সামলাতে চায়। কিন্তু সেগুলি আবার বেরিয়ে উড়তে থাকে। "তোর ভাই-এর নাম কি?"

"প্রগট সিংহ!"

"আরে হারামির বাচ্চা! তুই কেন আমার হাতে মরতে এলি?" দারোগার পেটে মোচড় দেয়। একে ছাড়লে সমস্ত পুলিশ ফোর্স আমাকে বোকা কিম্বা দেশদ্রোহী বলবে, গ্রেপ্তার করলে নতুন সমস্যা গলায় ঝুলবে, নিজের কিম্বা পরিবারের কারো জীবন সংকটও হতে পারে। একথা এস পি অব্দি পৌঁছে গেলে....!!! .... অবশ্য এর পেট থেকে কিছু বের করতে পারলে জেলা পুলিশে সম্মানিতও হতে পারি!"

"শালাকে জীপে ওঠা! চল ওরে নাঙ্গে ভঙ্গে, পাগড়ি খুঁজবি আমার সঙ্গে!" যত রোয়াব নিয়েই বলুক না কেন, ওর গলা কাঁপে। বুক ঢিপঢিপ করে।

"মদের ভাটিতে যাবেন না স্যার?" মদের নাম শুনেই সন্তে সিপাহীর জিভ দিয়ে লালা ঝরছিলো!

দারোগা জীপে চড়ার ইশারা করে বলে, তুই — ও হাড্ডি পাবি, কবুতরের বদলে মুর্গা পাবি!

দুজন সিপাহী নাঙ্গা সিংহকে নিয়ে জীপের পেছনের সীটে বসে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় এখানে

ওখানে জল জমেছে, জীপ হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে কাদা জল ছিটাতে ছিটাতে মাটির রাস্তা থেকে পাকা সড়কে ওঠে। কিন্তু পাকা সড়কের অবস্থা মাটির রাস্তা থেকেও খারাপ। রাস্তা তৈরীর পর থেকে আর সারানো হয়নি। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে, এর থেকে মাটির রাস্তাই ভাল ছিল। দারোগার মাথায় ঘোড়া ছোটে। ওকে মারধোর করে তাহলে রক্ষে নেই। ওর চোখে প্রগট সিংহের যমদূতের মতন চেহারা ভেসে ওঠে। ঐ শালা হর্মদ হাবিলদারকে চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে নিয়েছিল। হর্মদ নাকি ওদের বাড়ি তালাশি নেওয়ার সময় ওদের মাকে দুচারটে গালি দিয়েছিল! আমাকে জীপ থেকে নামিয়ে নিতে কতক্ষণ! জানালার শিক গলে যেমন অনায়াসে হাওয়া বেরিয়ে যেতে পারে তেমনি শালা সিকিউরিটি ওয়ালাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছে, এই শালারা জীবন হাতের তেলোতে নিয়ে চলাফেরা করে, আমাদেরকে বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার করতে দেবে না!

নাঙ্গা সিংহ চুপচাপ জীপে বসে ভাবে, ওরা আমার কী করবে? আমি তো কোন অন্যায় করিনি! অবশ্য বলা যায় না! সরকার পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কাউকে গ্রেপ্তার করা, মারধোর করা; একেবারে জঙ্গলের রাজত্ব ! কেউ কারো শোনে না। কেউ কুকর্ম করে আর অন্যেরা ফল ভোগে। ব্রিটিশ রাজত্বেও নাকি এমন অরাজকতা ছিল না। তাহলে এই স্বাধীনতা কিসের? বয়স্করা বলে, প্রজাকে শূলে চড়িয়ে জালিমরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে। এখন বয়স্কদের গুলী মারো, নিজের ফাঁসী বাঁচাও। কেমন করে? মনে হয়, আমার অহেতুক ফাঁসীও এখন পাঞ্জাব সমস্যার সঙ্গে জুড়ে গেছে। যদি তাই হয়, পুরুষের মতন তার মোকাবিলা করবো। পাঞ্জাবের মায়েদের বলবো, শকুনির জন্ম দেওয়া বন্ধ করো, কেবল যোদ্ধা চাই-জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত শঙ্কাহীন; যারা গাধার পিটে চড়ে মিছিলে বেরুবে না।

হঠাৎ জীপ ব্রেক কষে। সীটে বসা সিপাহীর হাঁটুতে ওর মাথা ঠোকর খায়। দুজনেই ব্যথা পায়। জীপ কুড়ি মিনিটের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেছে। দারোগা আদেশ দেয়, "ওকে গরাদে ঢোকাও!"

"জী, আমার অপরাধ? মদ খাওয়া তো আর অপরাধ নয়, সরকারই জায়গায় জায়গায় মদের দোকান আর বার খুলে রেখেছে।" ও একবার দম নিয়ে বলে,

" একটু পরেই আপনার আধা পুলিশফোর্স মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকবে!" দারোগা পুলিশদের কিছু ইশারা করে ওকে বলে, "চল নাঙ্গা সিংহ, তুই ভেতরে আরাম কর, আমি তোর পাগড়ি জোগাড় করছি।"

ও গরাদের পেছনে যেতে যেতে বলে, "আপনার মুখে ফুলচন্দন, পাগড়ি ছিনিয়ে নেওয়া যাদের স্বভাবই, তারাই নাকি পাগড়ির বন্দোবস্ত করবে!"

দারোগা নিরাশ হয়ে থানার উঠোনে শিশুগাছের ছায়ায় পাতা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে। শালা নিজেকে প্রগটের ভাই বলে জাহির করে আমাকে জীবন সংকটে ফেলে দিয়েছিস্। এখন খেলে চাবুক আর না খেলে কলঙ্কের মতন ব্যাপার। বড় সাহেবকে জানাতেই হবে। চেপে রাখলে কুত্তার বাচ্চা সিপাহীগুলির মধ্যে কেউ না কেউ হাড়ি ফাটিয়ে দেবে। ও মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেকেই বলে, "সুখবন্ত সিংহ আজ ফেসেছো বাছাধন, নাঙ্গাকে তুমি কোথায় লুকাবে, ধাইদের কাছে কখনো গর্ভের খবর চাপা থাকে না। পুলিশের চাকুরী আর পোষা কুকুরের জীবন একইরকম; অপরাধের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ছুটতে থাকা, ঘেউ ঘেউ গালিগালাজ করে মুখ নোংরা করা আর লোকের পেটে লাথি মেরে অভিশাপ কুড়ানো। আগে নাকি পুলিশের চাকুরী খুব ঠাটের ছিল, সেই দিন আর নেই। তিন-চার বছর ধরে আরো খারাপ সময় এসেছে। কীজানি আদৌ আবার কোনদিন সুদিন আসবে কিনা! এই রাজদ্রোহ কতদিন চলবে? ও গোঁফে তা দিতে দিতে উঠে দাঁড়ায়।

"মুন্সী!" এক হাবিলদারকে দেখতে পেয়ে ও ডাকে, "অপারেটরকে বলো, বড় সাহেবকে

জানাবে যে মন্ড থেকে এক ছোকরাকে ধরে এনেছি, সে নিজেকে প্রগট সিংহের দাদা বলছে, পরবর্তী আদেশ কি?

মুন্সী মাথা নেড়ে চলে যায়। পাঁচ মিনিট পর ও ফিরে এসে বলে, "জনাব, সাহেব আসছেন, আপনাকে থাকতে বলেছেন!"

"আরো বিপদ!" সুখবন্ত মনে মনে বলে, অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, পুলিশের কর্তব্য তো আমাকে করে যেতেই হবে! ও উঠে পায়চারি করতে থাকে। আকাশ থেকে একটা দীর্ঘ শিস্ শুনতে পেয়ে উপরে তাকিয়ে দেখে একটি শকুন চক্কর কাটছে, হয়তো কোথাও কোন শব দেখতে পেয়েছে। কী জানি পাঞ্জাব আবার কবে শান্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাব কোন শালা জাতীয় নেতাও দিতে পারবে না। যে যত বড় বেইমান, সাংবাদিকরা ওদের তত বড় নেতা বানিয়ে ছাড়ে। আমাদের স্যান্ডউইচ অবস্থা; ত্রাহি ত্রাহি করে অনেক কষ্টে দিন কাটে, তারপর প্রতিদিন রাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার এসে দরজায় করাঘাত করে।

এক সিপাহী ওর জন্যে চা নিয়ে এলে ও এককাপ গরাদের ওপাশে নাঙ্গা সিংহের জন্যেও পাঠায়। চা খাওয়ার পর ও নিজেও গরাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নাঙ্গা সিংহ ওকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। সুখবন্তের মাথা ভারী। ও দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "নাঙ্গা সিং, সত্যি করে বলতো বাবা, প্রগট এখন কোথায়? "জনাব আপনাকে তো বলেছি, আমাদের কপাল খারাপ, আমি তো ওকেই খুঁজছিলাম।"

"তা কেমন করে হয়? তোর ভাই আর তুই জানিস না?"

"হাতে পয়সা এলেই আমি আপনার চায়ের দাম চুকিয়ে দেব!"

"ইয়ার, ছোটলোকের মতন কথা বলিস না!"

"না সাহেব, ছোটলোকের ঘরে আমার জন্ম হয নি, আপনাব চায়েব ওজন বেজায় ভারী ঠেকছে বলেই বলেছি।"

দারোগা বেতের লাল রুলটা হাঁটুর নিচে সপাটে মেরে বলে, "চিন্তা করে দেখ, কী করে কথা বের করতে হয় আমাদের জানা আছে, প্রয়োজনে তোর জাঙ্গিয়া ফুটো হয়ে যাবে। নাঙ্গা সিংহ ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, "জানি সাহেব, এছাড়া আপনারা আর কী করবেন, পরোঠা খাওয়াবেন?"

সুখবন্ত ওর কথা লুফে নিয়ে বলে, তুই খাওয়ার মত কাজ কর, তাহলে এখুনি চলে আসবে!

জনাব আপনার পরোঠাকে শত কোটি প্রণাম, আমার জন্যে গুরুর লঙ্গরেব রুটি-সব্জিই যথেষ্ট।

সুখবন্ত গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে নাঙ্গা সিংহের কাঁধ থপথপিয়ে বলে, "তুই আমাকে ছোটখাট কোন কাজ বলেই দেখ, আমি তোকে কেমন সাহায্য করি!"

নাঙ্গা সিংহ মুচকি হেসে বলে, "পাঞ্জাবের জাটেরা (জাট - কৃষক সম্প্রদায়) এখনো ভালমতন দরাদরি শেখে নি! আমি তো কোন অপবাধ করি নি! প্রথমে পাগড়ি খুলেছে এবার না হয় মাথাটাও কাটবে!"

ও এবার দারোগার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ভাবে, আমি তো আর কোন আইন অমান্য করিনি! তবু ওরা যদি নির্দোষ ব্যক্তিকে মারে তাহলে আমিও পূর্বজদের মতন শহীদ হবো!

নাঙ্গা সিংহের দৃঢ় জবাবে দারোগা অপ্রস্তুত হাসে। ওর অন্তরে সত্য একপ্রকায় আর ও ছটফট করে। প্রোমোশানের চিন্তা আর মানবতার অপমানের মাঝে ঝুলন্ত সুখবন্ত স্বামী বিবেকানন্দের ঢঙে দুহাত বুকের কাছে নিয়ে পায়চারি করতে থাকে।

ততক্ষণে উঠোনে ঝাড়ু লাগানো হয়। কয়েক বালতি জলের ছিটা লাগানো হয়। ভেতরে টেবিলে গাঁদা ফুল আর পাতা দিয়ে তোড়া তৈরী করে রাখা হয়। দেখছে, দেখতে যার জন্যে এত প্রস্তুতি তিনি একটা কালো গাড়িতে এসে পৌছোন।

বড় সাহেবের চোখে সোনালী ফ্রেম-এর কালো চশমা। তিনি ঢুকতে সারিবদ্ধ সমস্ত পুলিশকর্মী গোড়ালি ঠুকে স্যালুট ঠোকে। সবাই যেকোন রকম ফরমায়েশ পালনে তৎপর। বড় সাহেব খালি টুপী খুলে জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় কয়েদী?"

সুখবন্ত অ্যাটেনশান অবস্থাতেই বলে, "স্যার, গরাদের ভেতর!"

"ওকে পেশ করো।"

দারোগা ইতস্ততঃ ভীত আওয়াজে বলে, " জনাব, আগে চা-টা খাবেন না?"

"চা আমি ওর সঙ্গেই খাবো।"

দারোগা মনে মনে বলে, " খেয়ে দ্যাখ, ও তো তোর বাপ!"

হাবিলদার মুন্সী চা, পকোড়া আর মিষ্টির ট্রে টেবিলের উপর রেখে বাইরে বেরিয়ে যায়। নাঙ্গা সিংহকে হাতকড়ি না লাগিয়েই আনা হয়। ও মাথা ঝাকিয়ে হাতজোড় করে বলে, "সৎ শ্রী অকাল জী!"

অফিসার ওর অভিবাদনের কোন জবাব না দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করে,

"ওয়েল নওজওয়ান, তোমার পাগড়ি কোথায়?" রিভলবারের কেস ও এসেই খুলে ফেলেছে। "স্যার পাগড়িই তো খুঁজছিলাম, আপনার সিপাহীরা তখনই জবরদস্তি জীপে তুলে এনেছে!"

"কি? তুমি কি প্রগট সিংহের ভাই নও?"

"আমি ওর দাদা, ওকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম!"

"কোথায়?"

"জী মন্ডে, সেখানে পুলিশ ছাপা মারলেও কাউকে ধরতে পারেনি!" নিজেদের বদনামী থেকে বাঁচাতে কয়েকজন চোলাই মদের কারবারীকে ধরে এনেছে!" অফিসার অবাক হয়ে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি করে জানলে?"

"এ আবার এমন কি ? মন্ড আর বেট গ্রামের এসব কথা তো খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছে!"

"ও, এ ব্যাপার!" অফিসার উপর নীচে মাথা নাড়ায়। ও অপরাধীর মন ও মস্তিষ্কে তাড়াতাড়ি প্রভাব জমাতে চায়, "আচ্ছা, চেয়ারে বসো!"

"যদি আমি বসে পড়ি, আপনি জানতে চাইবেন, "প্রগট কোথায়? জানিনা ও বেঁচে আছে কি নেই? নাজানি কোথায় ধাক্কা খেয়ে ফিরছে, অবশ্য জানতে পারলেও আমি তোমাদেরকে কেন জানাবো?"

"তাহলে কী করবে?"

"দুই ভাই মিলে হারিয়ে যাওয়া পাগড়ি খুঁজে এনে মাথায় বাঁধবো!"

"পাগড়ি খোঁজার বাহানায় ডাকাতি করবে, খুন করবে?"

" না সাহেব, আমরা পাকা গুরুব শিখ, (শিখ- শিষ্য) এসবকে পাপ বলে মনে করি!"

"হুম, বুঝলাম, সব ঠিক হয়ে যাবে! তুমি আমার সঙ্গে বসে চা খাও!" অফিসার চায়ের কাপ নাঙ্গা সিংহের দিকে এগিয়ে দেয়। কাপ ভরা থাকায় সামান্য চা উছলে প্লেটে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলোলেলেনের গাঢ় সবুজ টেবিলে ঢাকনায় ছিটকে পড়েছে তার দাগ ভালমতন খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না। নাঙ্গা সিংহ ইতস্ততঃ করে বসে পড়ে। চা খায়। পাকোড়াও খায়। ক্ষুধার্ত ছিল, একটু বেশীই খেয়ে নেয়। ওর খাওয়া দেখে বড় সাহেব অনুমান লাগায়। একে বেশী যাতনা দিলে এ কিছুই উগলাবে না! কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা পঞ্চাশ হাজারীকে ধরতে পারবো। চা খাওয়া শেষ হলে একজন সিপাহী এসে টেবিল পরিষ্কার করে যায়।

বড় সাহেব মুচকি হেসে বলেন, "দেখ ভাই নওজওয়ান, এখন তুমি আমাদের নুন খেয়েছ,

গুরুর পাকা শিখ যদি হও একদম মিথ্যে কথা বলবে না!"

"জী, গুরুর পাকা শিখ তো বটেই, কিন্তু নুন খেয়েছি আমার পাঞ্জাবের! আপনিও খেয়েছেন, তাই পাঞ্জাবের সঙ্গে বেইমানী করবেন না!"

নাঙ্গার কথা শুনে বড় সাহেবের রাগ ওঠে। তিনি বলেন, "তার মানে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না! তোমার নাম কি?"

"জনাব, নাঙ্গা সিংহ ভঙ্গা!"

সাহেব হেসে বলেন, "লেখাপড়া জান মনে হচ্ছে!"

"জী, বি এড করেছি!"

"চাকুরী নাও নি কেন? আওয়ারা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে বুঝি?"

"না স্যার, মাস্টারী করতে গেছিলাম, সেখানে বত্রিশ হাজার সেলামী চায়!"

যুবক চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলে, "প্রগট তখন ক্লাশ টেন-এ পড়তো। আমাদের মোট পাঁচ একর জমি ছিল, আমার পড়ার খরচ বহন করতে দুই একর বন্ধক রাখতে হয়েছে, দুই একর বিক্রী করে বোনের বিয়ে দিতে হয়েছে। বাকী এক একর বাবার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধ শান্তি করতে আর ধার দেনা চুকাতে বিক্রী করতে হয়েছে। আমরা দুই ভাই নাঙ্গা সিংহ মলঙ্গা সিংহ পুরোপুরি নাঙ্গা হয়ে পড়েছি। বত্রিশ হাজার কোত্থেকে দেব?"

পুলিশের বড় সাহেব ভাবে, ওর সামনে বসে থাকা নবযুবকের শরীরে রক্ত মাংসের বদলে বারুদভরা আস্ত বোমা রয়েছে, সেটা যেকোন সময় ফাটতে পারে। সত্যি সত্যি পাঞ্জাবের আর্থিক অবস্থা এত অন্তঃসারশূন্য! এমনি আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাঞ্জাবের অবণতি হতে থাকলে কোন বিপত্তির সময় উত্তর ভারত কেমন করে রুখে দাঁড়াবে? ও বর্তমান আন্তর্জাতিক ডামাডোলের কথাও ভাবে।

"ওয়েল নওজওয়ান! তুমি জান প্রগট দুটো হত্যা করেছে, তিনটি ডাকাতি, আর একটি স্কুটার জবরদস্তি ছিনতাই করেছে!" বড়সাহেব এবার নতুন হাতিয়ার নিয়ে ওকে আক্রমণ করে, "ওকে আমাদের হাতে তুলে দাও, খুনের আরোপ সরিয়ে দেব আর বারো বোর পিস্তল রাখার দায়ে চালান করবো, তোমার প্রিয় ভাইটি গুলী থেকে বেঁচে যাবে, নাহলে পুলিশের গুলী ওকে একদিন অন্ধকার থেকেও খুঁজে নেবে! দেখে নিও....!" বাকী কথা ও ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ ছাড়ে।

"জনাব, ও কেবল কুলবিন্দর বদমাশকে মেরে বীরের কাজ করেছে। এছাড়া কোন খুন বা ডাকাতি করেনি। পুলিশের ইনফর্মার হওয়ায় কুলবিন্দর নিজেকে কেউকেটা ভাবতো আর গ্রামের বউ বেটিদের কু নজরে দেখতো। সেদিনও এক গরীব মজুরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল বলে প্রগট রেগে গিয়ে ওকে মেরে বিপাশা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে! এছাড়া ওর সম্পর্কে যা বললেন সব মিথ্যে। ও কারো স্কুটার ছিনিয়ে নিয়ে যায়নি, হাবিলদার আমার মাকে গালি দিয়েছিল বলে ওকে একটু শাস্তি দিয়েছে, ও মাফ চাইলে স্কুটারও ফেরৎ দিয়েছে, সারা গ্রাম-এর সাক্ষী দেবে!"

"তোমার কথাই হয়তো ঠিক, কিন্তু ফেরার থাকলে ওর উপর একের পর এক কেস চড়তে থাকবে; আমি ওর জীবনদানের কথা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে হাত মেলাও।"

"সাহেব, দুর্বলকে কথা দিয়ে কে কথা রাখে? আমরা অনেক ধোঁকা খেয়েছি। আমার তো মনে হয় আমার ভাইকে পুলিশ মেরে ফেলেছে, আপনি স্বীকার না করলে কী হবে? পুলিশ বাহানা বানাচ্ছে।" ও এপাশ ওপাশে মাথা নেড়ে বলে, "আমাদের সঙ্গে ধোঁকা হয়েছে। ও পুলিশ হেপাজত থেকে কোথায় উধাও হলো?"

"পুলিশকে চকমা দিয়ে পালিয়েছে, সেজন্যেই তো ওর উপরে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে!"

"না সাহেব না, শুনেছি পুলিশের লোকেরা ওকে আর ওর সাথীদের হাত-পা বেঁধে জীপে

বসিয়ে মাঝরাতে কোথাও নিয়ে গেছে!"

বড় সাহেব চোখ কুঁচকে জিঞ্জেস করে "কোথায়?"

ভগবান জানে। শুনেছি পাশের গ্রামের চোলাই মদের দোকানের লোকেরা ওদের উপর রেইড হয়েছে ভেবে ফায়ারিং শুরু করে। পুলিশের লোকেরা ভাবে আতঙ্কবাদী, আর জীপ ওখানেই ছেড়ে পালায়। জীপে বাঁধা লোকেরা ওখানেই থেকে যায়। তখন নাকি মদের দোকানের লোকেরা গিয়ে ওদের হাত খুলে দেয়। শুনেছি, ওদের মধ্যে আমার ভাই এর মতন দেখতে কেউ ছিল। কিন্তু এসব কথা নানা জনে নানারকমভাবে বলেছে, কতটা সত্যি কতটা আমাদের দুর্ভাগ্য তা কে জানে! বলতে বলতে ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ওর চোখে জল চলে আসে। কিন্তু ও পুলিশ অফিসারের সামনে কেঁদে কোনরকম দুর্বলতা দেখাতে চায় না। নাঙ্গা সিংহের সততা পুলিশ অফিসারের প্রত্যয়কে ফালা ফালা করে ফেলে, ওর কোন কথাই অসত্য বলে মনে হয় না। ওর সততা বড় সাহেবকে ক্রমশ: ঘেরাও করে ফেলছে। তবু তিনি গা ঝাড়া দিয়ে বলেন, "এসব গল্প তোমাকে কে বলেছে?"

"সাহেব, ঐ গ্রামের মানুষের হাহাকার! আপনি ইউনিফর্ম খুলে সাদা পোশাকে ঐ গ্রামের যে কাউকে গিয়ে জিঞ্জেস করুন! সত্য কখনো চাপা থাকে না।

পুলিশ অফিসার ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ে। একবার নাঙ্গা সিংহের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এর সাহস ও সততা দেশের গর্বের কারণ হতে পারতো। এরাই দুর্দিনে বারবার দেশের লজ্জা রক্ষা করেছে, আজ এরা কেমন করে রাহুগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

"সুখবন্ত সিংহ!" তিনি দারোগাকে ডেকে বলেন, "একে নিয়ে যাও, লক-আপে ঢুকিয়ে তারপর আমার কাছে এসো!" ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে ও সারা ঘরে পায়চারি করতে শুরু করে। ছাদের কড়ি বরগায় ঘুন ধরেছে। ভিটের ইটে হাঁটু সমান নোনা ধরেছে। ও দুবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ততক্ষণে সুখবন্ত সিংহ ফিরে আসে।

"বসো!" দারোগা বসলে, ফিসফিস করে বলেন, "শোনো নাঙ্গাকে আজ রাতেই!" সুখবন্ত সিংহ লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলে, "সাহেব, এর তো কোন দোষ নেই!" বড় সাহেব একবার চোখ পাকিয়ে বলে, "আমার আদেশ, আজই হুকুম তামিল করো!" একথা বলেই ও চোখে কালো চশমা পরে নেয়!"

সুখবন্ত সিংহের মাথা থেকে পা অব্দি কেঁপে ওঠে, "স্যার, আমি বেআইনী কাজ করবো না, গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি!"

পুলিশ চীফ জোর দিয়ে বলেন, "হুকুম তামিল করবে?"

"না জনাব আইনের বাইরে বেরিয়ে কোন কিছু করাকে আমি পাপ বলে মনে করি।"

বড় সাহেব রাগে গজগজ করতে করতে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে বলেন, "কাল সকালেই আমার অফিসে লাইন হাজির হবে।" সুখবন্ত সিংহ আইন-কানুন ও কর্তব্যের অনুভবে বেষ্টিত একটি স্তম্ভের মতন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্বিৎ পেয়ে উঠানে এসে দেখে বড়সাহেব যথারীতি কালো গাড়িতে বসে পড়েছেন। ওভাবে, এখুনি বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করা শুরু করতে হবে। গরাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও একবার থামে।

"সিংহভাই!" ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, " কে জানে আর কখনো তোর পাগড়ি খুঁজে পাবি কিনা!"

নাঙ্গা সিংহ চোয়াল শক্ত করে বলে, "জনাব, পাগড়ি না পেলে মাথাটা রেখেই বা কী করবো?

সুখবন্ত কৌর থানা থেকে কোয়ার্টারের পথে পা বাড়িয়েও আবার কী ভেবে ফিরে এসে নাঙ্গা সিংহের নামে দফা ১০৭ আর ১৫১ অনুযায়ী গ্রেপ্তারের ডাইরি করে যায়।

রচনাকাল : ১৯৮৮

কর্তার সিংহ দুগ্গল

অভিসার

মালিন আর মিন্নী একসঙ্গে কোথাও গেলে সবাই ভাবতো দুই বোন। মিন্নী ওর মা থেকে সামান্য লম্বা। প্রতিবেশীনীরা বলে, আরে মালিন, তোর মেয়ে দারুণ রূপসী হয়েছে, যতই দেখি আঁশ মেটে না। খাঁটি মুক্তোর মতন। মালিন মেয়েকে দেখে আর ভাবে, হুবহু আমি। এই ক'বছর আগেই তো ঠিক ওর মতন ছিলাম। এখনও খুব একটা পাল্টাই নি। আজও কেউ আমার জন্যে পাহাড় কেটে ঝর্ণা বের করার জন্যে অধীর। আজও— আজও কেউ সাত সমুদ্র সাঁতরে পৌঁছুনোর জন্যে ছটফট করে।

আজ কে ওর সমস্ত সত্তা ছেয়ে আছে? মুক্তোর সওদাগর! বারবার চোখ জলে ভিজে উঠছে কেন? এখন মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এখন এসব শোভা পায় না। এতদিন সামলে চলে আজ ও কেন ভাবনার ঢেউয়ে বারবার ভেসে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। না, না, এমন হলে চলবে না। সামনের সপ্তাহে মিন্নীর বিয়ে।

"পাস মেরী পরম প্যারী, একপল না বিসারী..." হৃদয়ে আছো প্রিয়তমা, ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতে পারি না। গতকালই ওর চিঠি এসেছে। বারবার ও আসে, আর প্রত্যেকবারই শুকনো মুখে ফিরে যায়। চোখ বন্ধ করে মালিন দরজা বন্ধ করে। কিন্তু ও কোনদিন ভোলে না। মালিনের কথা ভেবে ভেবে অস্থির মানুষটি সারাজীবন প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে। এখন ছায়া প্রলম্বিত। এমনি ছটফট করতে করতেই কি একদিন পাখী উড়ে যাবে?

আজ রাতে ও অবশ্যই আসবে, প্রতি শারদ পূর্ণিমা রাতে ও এই দরজার কড়া নাড়ে। কিন্তু কোনদিন ওর জন্যে দরজা খোলেনি। কেবল একবার অজান্তেই খোলা থাকায় শারদ পূর্ণিমা রাতে আমড়া গাছের নীচে নাচতে নাচতে মালিনের ওড়না উড়ে গিয়ে ওর হাতে জড়িয়ে যায়। খালি মাথায় মালিন লজ্জায় জড়োসড়ো; তখনই ও ওড়নাটা এনে ওর কাঁধে জড়িয়ে দিয়ে যায়। ওর স্পর্শে মালিনের মাথা থেকে পা অব্দি সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এখনও সে কথা ভাবলে ওর গায়ে কাঁটা দেয়।

সামনের গলি দিয়ে মাথা মুখ ওড়না দিয়ে ঢেকে মিন্নী মাথা নিচু করে হেঁটে আসছে। কী লম্বা আর ফর্সা। যেন হাত লাগলেই ময়লা হয়ে যাবে। কেউ কোনদিন ওকে জোরে কথা বলতে শোনেনি। ও এখন মন্দির থেকে ফিরছে। মালিন চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলে, ঈশ্বর ওর প্রার্থনা

পূর্ণ করুন। তারপর মুচকি হাসে, যেন কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে। ভাবে, ওর অভিলাষ কী হতে পারে?

মা, বাবা আজ এলো না? মিন্নী এসে জিঞ্জেস করে।

না, আজ আসবে না, আগামীকালও যদি চলে আসে তো খুব ভাল। এখনো কতকিছু কেনার বাকী। বিয়েশাদীতে কোন কিছু বেঁচে গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু কম হলে মুস্কিল। মিন্নী নিজের মুক্কেইশী ওড়নাটা মায়ের কাঁধে জড়িয়ে ওর দোপাট্টা নিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে, পাছে ওর রেশমী ওড়নাটা নোংরা না হয়ে যায়। এই মুক্কেইশী নকশাগুলি ও নিজের হাতে রেশমী ওড়নার গায়ে বুনেছে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। একাকী উঠোনে বসে মালিন কল্পনায় ডানা মেলে। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা যাতীতে আটা পেশার ঘর্ঘর শব্দ শুনে ও ভাবে, নিজের জীবনটাও একটা যাতীরই মতন সারাজীবন সংসারের আটা পিষে পিষে হাফিয়ে উঠেছে।। কখনো ওর পা ডগমগায়নি।

তারপর চাঁদ ওঠে। আমড়া গাছের ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরিঝিরি জ্যোৎস্না ওকে স্নান করিয়ে দেয়। কল্পনার ডানা ঝটপট করে। ও কোথায় উড়ে যেতে চায়। নিজেকে নেশাগ্রস্ত লাগে। চাঁদের আলো ধীরে ধীরে ওকে সম্মোহিত করে তোলে।

আর চারদিন পর এই উঠোনে মহিলারা বিবাহগীত গাইতে বসবে। গানের সুরে মেহেন্দী তৈরী হবে। তারপর কনে সাজানো, মাথা থেকে পা অব্দি নানা গয়নায় ঢেকে জড়ির জমকালো নকশাদার লাল সালোযার কামিজে মিন্নীকে কেমন লাগবে? তারপর কেউ ঘোড়ায় চড়ে আসবে আর ওকে পাল্কীতে বসিয়ে নিয়ে যাবে পাশের গ্রাম অটারীতে। আর তারপর বাসরঘরে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে সারারাতে ওর মেহেন্দীর সমস্ত রঙ শুষে নেবে।

এই তো সেদিন ওর নিজের হাতে মেহেন্দী আঁকা হয়েছিল। কিন্তু মিন্নীর বাবা একবারও ওর হাত দুটি উঠিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ায় নি, চোখে চুমু খায়নি। রোজ ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষটি কাজ থেকে ফিরে রুটি খেত আর শুয়ে পড়তো। মালিন পাশে শুয়ে ছটফট করতো, জানালা দিয়ে আকাশের তারা গুণতে গুণতে অনেক কষ্টে ঘুমুত। তার একটু পরেই জেগে উঠে ভদ্রলোক ওকে জাগিয়ে পুত্রপ্রাপ্তির লালসায় কসরৎ করতেন। ঘুমকাতুরে মালিনের কাছে ভদ্রলোকের প্রেম ছিল কসরতেরই নামান্তর। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটা করে কন্যাসন্তান আসতো। অনাখাঙ্কিত লিকপিকে সব কন্যারা যেমন করে আসতো তেমনি মাকে কাঁদিয়ে অপুষ্টি বা অন্য কোন কারণে কেউ দু'মিনিট তো কেউ দু'দিন পরই মরে যেত। কেবল মিন্নীই ব্যতিক্রম। বড় বড় কালো চোখ দুটি একেবারে মালিনের মতন। ফর্সা সুন্দর গাল আর থুতুনিতে মালিনের মতন তিল; আরো সুন্দর তিল। বড় হওয়ার পর মালিনেরই মতন কোমরছাপানো চুলের বন্যা; ওর তৃষ্ণার্ত যৌবন যেন মেয়ের শরীরে পুনর্জন্ম নিয়েছে। ওর প্রতিটি অঙ্গে, চলনে-বলনে যেন এক বিমূর্ত তৃষ্ণা মাঝেমধ্যেই মালিনের চোখে মূর্ত হয়ে ওঠে। তৃষ্ণায় ওর ঠোঁট সবসময় শুকিয়ে থাকে।

পূর্ণিমারাতে মালিন কিছু খেয়ে উঠতে পারে না। মিন্নী রান্নাঘর গুছিয়ে সদর দরজায় খিল এঁটে ভেতরের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছে। রাত এখন কত? চাঁদ যেন উঠোনেই নেমে এসেছে। শীতল হাওয়া বইছে। এখনো শীত পড়েনি। এই নিটোল গোল চাঁদের নিচে একাকী উঠোনে ওভাবে, 'এরকম কেন বসে আছি, কার অপেক্ষায়? মিন্নীর বাবা আজই শহরে না গেলে হতো না?

প্রত্যেক পূর্ণিমা রাতে ও নিজেকে এমনি বেঁধে বেঁধে রাখে। এখন আরেকবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এলে মিন্নীর ওড়নাটা দিয়ে কান মাথা পেঁচিয়ে নেয়। জ্যোৎস্নায় ঐ ওড়নার জড়ি দিয়ে বোনা তারারা পরতে পরতে ওর মাথা ও গায়ে জড়িয়ে থাকায় মনে হচ্ছে আকাশটাই বুঝি ওর গায়ে নেমে এসেছে। তারারা খেলা করছে। আমড়া গাছের ডালে কোন রাতজাগা পাখি— হুক, হুক হুক শব্দে ডাকছে। এ এখন থেকে থেকে ডাকতে থাকবে সাবারাত। প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে এমনি

ডাকে। সে রাতে যার আসার কথা সে আসুক কিম্বা না আসুক পাখীটা এমনি থেকে থেকে ডাকতে থাকে।

আজ একা থাকায় হয়তো আরো বেশী উচাটন লাগছে। একা কোথায়? ভেতরে মিন্নী শুয়ে আছে। চারদিন পর ওর বিয়ে। তারপর মালিন আরো একা হয়ে পড়বে। এত বড় বাড়ি ও উঠোনে একা। উঠোন ওকে গিলতে আসবে। মিন্নী অটারীর চৌধুরীর পুত্রবধূ হয়ে নিজের ঘর-সংসার সামলাবে। মিন্নীর বাবা ব্যবসাবাণিজ্য, সওদা আর সুদ নিয়ে বরাবরের মতন ছুটতে থাকবে এক অন্তহীন দৌড়। প্রত্যেকদিন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে রুটি খেয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েই নাক ডাকতে থাকবে। মালিন অনেকবার বলেছে, — এত পরিশ্রম কেন? এত টাকা জমিয়ে আমাদের কী হবে? কে খাবে এত পয়সা? কিন্তু ভদ্রলোক টাকা উপার্জনের নেশায় সবসময় বুঁদ হয়ে থাকে। অন্য কোন কথা ওর কানে ঢোকে না।

মালিন ঘরে ঢুকে দেখে মিন্নী ঘুমিয়ে কাঁদা। যেন মালিনেরই উদ্ভিন্ন যৌবন নিদ্রায় অসার। লাল চুড়িগুলি হাত থেকে খুলে মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনভাবে রেখেছে যে পাশ ফিরলেই চুড়িগুলি ভেঙ্গে চুরমার হবে। এমনকি মুখটাও রক্তাক্ত হয়ে যেতে পারে। মালিন ভাবে, চুড়িগুলি তাকে উঠিয়ে রাখি। কিন্তু অজান্তেই ও নিজের হাতে পরে নেয়। ডানহাতে ছটা আর বাঁহাতে ছটা। গতকাল সকালেই মিন্নী চুড়িওয়ালাকে ডেকে বসিয়ে এই চকচকে চুড়িগুলি পরেছে।

ও উঠোনে পা রাখতেই সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ে। ধীরে ধীরে থেমে থেমে মৃদু কড়া নাড়ার শব্দে মালিন নিশ্চিত হয় যে ওই-ই এসেছে। যেমনটি চিঠিতে লিখেছে শারদ পূর্ণিমা রাতে কড়া নাড়বো, ইচ্ছে হলে খুলে দিও, নাহলে বরাবরের মতন খুলো না, আমি ফিরে যাবো।

ঠক্! ঠক্!! ঠক্!!! অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত মধুর কড়া নাড়ার শব্দ। পূর্ণিমার চোর এসে গেছে।

তখনই কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ উড়ে এসে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলে। মালিনের বুক কাঁপতে শুরু করে। চারপাশে অন্ধকার ছেয়ে যায়। ও এক অমোঘ আকষর্ণে দরজার দিকে এগিয়ে চলে। পা টলোমলো, হাত ঠাণ্ডা, কপালে ঘাম। কাঁপা হাতে আস্তে খিল খুলে সে নিজেকে এক আজীবন প্রতীক্ষারত বুকে সঁপে দেয়। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট, দাঁতে দাঁত, কুড়ি বছর ধরে, আটকে থাকা একটা বাঁধ যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। যেন কোন ফুলের পাপড়ি ঝড়ের বাতাসে উড়ে চলে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন বটগাছের নিচে, সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কখন বটগাছ সংলগ্ন ক্ষেতে গিয়ে বসে, সেখানে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকে তা ওর খেয়াল নেই। শেষ রাতে দূরে বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া লরীর আওয়াজে জেগে ওঠে ও ধীরে ওর বাহু ছাড়িয়ে জামাকাপড় সামলে, মাথা-মুখ ওড়না দিয়ে ঢেকে হনহনিয়ে বাড়ি পৌঁছে যায়।

চুড়িগুলি সাবধানে হাত থেকে খুলে তেমনি মিন্নীর মাথার কাছে রেখে দেয়। ওর রেশমী ওড়না ওর বিছানায় রেখে নিজের দোপাট্টা নিয়ে গিয়ে পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ে। শোয়ার একটু পরেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। যেন আজীবন রাতজাগা মানুষটি আজ অনেকদিন পর নিঃসাড়ে ঘুমোয় মহাতৃপ্তিতে।

যখন ঘুম ভাঙ্গে, চারপাশে রোদ ঝলমল করছে। মিন্নী মজা করে বলে, তুমি আজ কেমন মিষ্টি কিশোরীর মতন ঘুমুচ্ছিলে।

ও ঝাড়ুপোছা সেরে সকালের খাবারটাও তৈরী করে নিয়েছে। স্নান-টান করে মন্দিরে যাবে বলে সাঁজি ভরে ফুল তুলেছে। ও বেরিয়ে গেলে মালিন অলস শরীরে অসংখ্য স্বপ্নের কুচি চোখের পলকে মেখে উঠোনে গিয়ে বসে। মৃদুমন্দ পুবের হাওয়া বইছে। আমড়া গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরিঝিরি মিষ্টি রোদ দেওয়ালের নিচের অংশটাকে কারুকার্যময় করে রেখেছে। একবাটি দুধে

ভাসমান চামেলির কলির মতন টলটলে পরিবেশে ঘুম ঘুম আমেজ মাখানো।

এই যে মালিন, তোমার সোহাগী বেটি কোথায়? পাশের বাড়ির লাজোর মুখে যেন কেউ থাপ্পড় মেরেছে এমন চেহারা করে মালিনের সুন্দর সময়ের আমেজে ছন্দপতন ঘটায়। ও হাত কচলাতে কচলাতে বলে, বিয়ের মাত্র চারদিন বাকী আর ও এখন উথলে পড়ছে!

ওর কথা শুনে মালিনের দমবন্ধ হওয়ার মতন অবস্থা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলে, কেন আমার মেয়ে কী করলো, ওতো নেহাৎই গরুর মতন—

তোমার গরু কাল সারারাত মুখে কালি মাখাচ্ছিল।

মালিনের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ থেমে যায়। মাথা ঘোরায়। শরীর কেমন করে। লাজো বলতে থাকে, গতকাল চাঁদ ওঠার একটু পরেই তোমাকে ঘুমে রেখে ও এক গুন্ডার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। সারারাত তোমার সদরদরজা খোলা থাকে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ও দরজার সামনেই কাউকে জড়িয়ে ধরে সিনেমার মতো......... আমি বেরুতে গিয়েও আর বেরুই না, দরজাটা হাল্কা ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে বটগাছের নিচে চলে যায়। তারপর আর দেখতে পাইনি। সারারাত উৎকণ্ঠায় আমার ঘুম হয় না। তোমার মেয়ে তো আমারও মেয়ে। এরকম কাউকে আমি বাপমায়ের মুখে কালি মাখাতে দেখিনি। আমাদের তো মুখ দেখানোর উপায় রইলো না। বলতে বলতে লাজোর চোখ ছলছল করে। ও ওড়নার খুট দিয়ে চোখ মোছে আর হাত কচলায়। মালিন পাথর হয়ে পড়ে। লাজো চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।

তখুনি পেছনের দেওয়াল টপকে গ্রামের চৌকিদার জুমা এসে উঠোনে নামে, বৌদি!

কী? মালিন নিজেকে সামলায়।

বলার মতো কথা নয় বৌদি, কালরাতে ভীষণ অন্যায় হয়েছে। চৌকিদারী করে চুল পেকে গেছে কিন্তু এমন অনর্থ কখনো দেখিনি। পূর্ণিমা রাত, কিন্তু তখন মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে। তখনই তোমার মেয়েকে কারো সঙ্গে বটগাছের তলায় মুখে কালি মাখাতে দেখলাম। দুবার তো প্রায় দশহাত দূর দিয়ে গেছি। ওরা এত মগ্ন ছিল যে টেরই পায়নি। তারপর গিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। আমি সারারাত তোমার দরজার দিকে নজর রাখি। চারদিনও বিয়ের বাকী নেই। বিয়েবাড়ি গয়নাগাটিতে ভরা থাকে। ভোর হওযার একটু আগে এখান থেকে নড়েছি। কোন্ ফাঁকে বজ্জাত ঘরে ফিরেছে দেখিনি। বলতে বলতে চৌকিদারের চোখে জল চলে আসে। আমি তো কোলে কাঁখে নিয়েছি। নিজের মেয়ে হলে কাল গলা টিপে মেরে ফেলতাম। এখন দেওয়াল টপকে ঢুকেছি। ভাবলাম, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছ, তাহলে কী জবাব দেব?

মালিনের গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় না, শব্দহীন, অস্তিত্ব নিয়ে ও ছলছল চোখে জুমার যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে। ও যেভাবে এসেছিল সেভাবেই দেওয়াল টপকে বেরিয়ে যায়।

তখুনি সামনের গলি দিয়ে গর্জন করতে করতে মাথা সমান লাঠি হাতে ধনী চাষী রৎনা এসে উঠোনে ঢোকে, — তোমার মেয়ে কোথায়?

ম-ন্-দি-রে! মালিন অনেক কষ্টে বলে।

বজ্জাত কোথাকার, ছিনালটা আর জায়গা পেলে না, আমাব ক্ষেত অপবিত্র করে এখন মন্দিরে গেছে!

ওর চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়ার মানুষ জড়ো হয়ে পড়ে। ও চোখ বড় বড় করে বলে, শেষ রাতে কুয়োর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন দেখি কি, মুক্তকেশী ওড়না গায়ে ও আমার ক্ষেত থেকে বেরিয়েছে। ভাবলাম, মেয়েটা হযতো মাঠে বসতে গেছিল, কিন্তু একটু পরেই দেখি ওর ইয়ার অন্যদিকে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে।

—কী যা তা বলছো কাকা? বজ্রপাতের মতন চিৎকারে মিন্নী ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, মিথ্যে বলার জায়গা পাও না? ওকে কোনদিন কেউ এতে জোরে কথা বলতে শোনেনি।

বজ্জাত মেয়ে, আমি মিথ্যে বলছি। কুলক্ষণী, আমি যা তা বলছি? ক্ষেতের মধ্যে এটা কার লাল চুড়ি ভেঙ্গে পড়ে আছে? রৎনা চাদরের খুঁটে বাঁধা চুড়ির টুকরোগুলি মিন্নীর হাতে দেয়। মিন্নী সঙ্গে সঙ্গে ওর দু'হাতের চুড়িগুলি গোনে, এগারোটা। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে পড়ে।

পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। ওদের অনেকেই মিন্নীকে চুড়িওয়ালার কাছ থেকে পুরো বারোটা চুড়ি পরতে দেখেছে। ও নিজেই লাল রঙের চুড়িগুলি বেছে নিয়েছে।

উঠোন লোকে লোকারণ্য। ততক্ষণে মিন্নীর হবু শ্বশুর-শাশুড়ী ভীড় ঠেলে এসে ঢোকে। ওরা আশীর্বাদের কাঁসার বাসনগুলি, সমস্ত কাপড়-চোপড় আর টাকার বান্ডিল মালিনের সামনে এনে ফেলে। হতভম্ব লোকেরা একে অন্যের মুখ দেখে. মহিলারা বারবার কানে হাত দেয়। কিশোরীরা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে আঙুলের রক্ত বের করে ফেলে।

তখনই প্রতিবেশীর কুয়ো থেকে ঝপাস করে ভারী কিছু জলে পড়ার শব্দ আসে। সবাই চমকে উঠে কুয়োর দিকে ছোটে। মালিনের গরুর মতন সুশীল কন্যাটিকে দেখা যাচ্ছে না। আজকের আগে কেউ কোনদিন মেয়েটির উঁচু আওয়াজ শোনেনি। মুক্তোর মালার মতন ঝকঝকে ওর হাসি। সকাল-সন্ধ্যা ও মন্দিরে পুজো দিত।

মালিন ঐ উঠোনে কাঠের তক্তার মতো অসাড় পড়ে থাকে। সমস্ত উঠোন বনবন করে ঘুরতে থাকে তার চারপাশে। পাড়া-প্রতিবেশীরা কুয়োর চারপাশে ভীড় করে কোনমতে মেয়েটাকে তুলে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৮

অমৃতা প্রীতম

দুই নারী

এখন ওকে আর কেউ নীলা বলে ডাকে না, সবাই বলে শাহের কঞ্জরী। লাহোরের হীরা মান্ডীর এক কোঠাবাড়িতে বড় হয়ে ওঠা ওর যৌবন প্রথম এক সর্দার রাজপুরুষের কাছে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। আর তখন থেকেই ওর রূপের চর্চা সমস্ত শহরকে ঝলসে দিয়েছিল। তারপর একদিন ও হীরা মান্ডীর শস্তা ঘর ছেড়ে শহরের সবচাইতে বড় হোটেল 'ফ্লেইটী'তে এসে উঠেছে।

ততদিনে ওর জীবনে আসে ধনী শাহ। রাতারাতি সমস্ত শহর যেন ওর নাম ভুলে যায়। সবাই ওকে শাহের কঞ্জরী বলে ডাকে।

কী দারুণ ওর গানের গলা। মির্জা-সাহিবাঁ লোকগাঁথার 'সদ্' ওর মতন সঠিক গায়কীতে কোন গানেওয়ালী পেশ করতে পারে না। সেজন্যে কেউ ওর নাম ভুললেও এহেন আওয়াজ কী আর ভোলা যায়! যার যার ঘরে চোঙাওয়ালা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল তারা নীলার গানের রেকর্ড অবশ্যই রাখতো। যে কোন বাড়িতে রেকর্ডের ফরমাইশের সময়, সবাই শাহের কঞ্জরীর গান শুনতে চাইতো।

এসব কথা গোপন থাকে না। শাহের বাড়ির লোকজনও জানে। শুধু জানেই না, ওদের জন্যে একথা পুরনো হয়ে গেছে। শাহের বড় ছেলে এখন বিবাহযোগ্য, ও যখন কোলে ছিল তখন শাহনী বিষ খেয়ে মরার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু শাহ ওর গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে বলেছিল, শেঠানীয়ে, ও তোর ঘরের বরকত, সৌভাগ্য! আমার জহুরীর চোখ, তুই শুনিস নি নীলা এমন জিনিস যে সোনাকে মাটি আর মাটিকে সোনা বানিয়ে ছাড়ে। যার সয় তাঁর এমন বরাত খোলে, যা ছোঁয় তাই সোনা হয় আর যার সয় না তাঁর সব সোনা ছাই হয়ে যায়। এই নীলাও আমি কপাল জোরে পেয়েছি, সেদিন থেকে যা ছুঁই তাই-ই সোনা হয়ে যায়......।

বুকে বেঁধা তীরকে সহন করে নিয়ে শাহনী বলে, — একদিন ও-ই এই ঘর বরবাদ করে দেবে, উজাড় করে দেবে, সব ছাই বানিয়ে ছাড়বে!

না শাহনী, আমি তো উল্টে ভয় পাই, এসব কঞ্জরীদের ভরসা কি, কাল অন্য কেউ আরো ঘন সবুজ ক্ষেত দেখালে সেদিকের হয়ে যাবে, তখন সব সোনা আবার মাটি না হয়ে যায়!

শাহনী আর কী বলবে! সময় ওকে চুপ করিয়ে দেয়। অনেক বছর ও চুপচাপ থাকে। আর আশ্চর্য হয়ে দেখে শাহ যত টাকা নীলার পেছনে খরচ করে সত্যি সত্যি তার চাইতে কয়েকগুণ না

জানি কোথা থেকে ধেয়ে আসে। আগে শহরের ছোট এক বাজারে ওদের ছোট্ট একটি দোকান ছিল। এখন শহরে সবচাইতে প্রশস্ত রাজপথের পাশে সবচাইতে বড় বাজারের সবচাইতে বড় দোকানটিই ওদের।

নিজেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছাড়াও আশপাশের অনেকটা এলাকার মানুষ শাহের ভাড়াটে মাত্র। সেদিন শাহের দেওয়া মুক্তোর মালা তহখানায় মোহরের সিন্দুকে ঢুকিয়ে তালা লাগাতে লাগাতে শাহনী বলে, ওকে হোটেলে রাখো কি ওর জন্যে তাজমহল বানিয়ে দাও, বাইরের আপদ বাইরেই রাখবে। কোনদিন ঘরে আনবে না। আমি ওর ছায়াও মাড়াতে চাই না।

আর সত্যি সত্যি শাহনী এযাবৎ ওর মুখও দেখেনি। ওর গানের রেকর্ডও কোনদিন ঘরে ঢুকতে দেয়নি। আর বাড়ির কাউকে ওর নামও উচ্চারণ করতে দেয়নি। এমনিতে ওর ছেলেরা নানা দোকানে ওর গান শুনেছে, লোককে বলতে শুনেছে, শাহের কঞ্জরী।

আজ বড়ছেলের বিয়ে। বাড়িতে চারমাস ধরে কয়েকজন দর্জী বসে নানা আকারের জামাকাপড়, দামীদামী সালোয়ার স্যুট সেলাই করেছে। কেউ শুধু কামীজে, পাড়ে আর দুপাট্টায় জড়ি দিয়ে চাঁদতারা বুনেছে কয়েক হাজার। শাহনীর দরাজ হাত। টাকার থলী আনে, খোলে, লোককে দেয়, আবার থলী ভরার জন্যে তহখানায় গিয়ে ঢুকে পড়ে।

শাহের চারবন্ধু দোস্তীর খাতিরে ছেলের বিয়েতে কঞ্জরীকে গাওয়াতে চায়। ওরা অবশ্য মুখ সামলে বেশ কায়দা করে বলে, এমনিতে তো শাহজী, গানে-নাচনেওয়ালীর কোন অভাব নেই, যাকে খুশী ডাকো, কিন্তু এখানে 'মলকয়ে তরন্নুম' গানের রাণী অবশ্যই আসা উচিত, নিদেনপক্ষে মির্জা-সাহিবাঁর একটা 'সদ' আমরা শুনতে চাই।

ফ্লেইটী যেমন তেমন হোটেল নয়। এখানে বেশীরভাগ ইংরেজরাই এসে থাকে। একা থাকার কামরা আছে বটে, কিন্তু বড় বড় তিন কামরার সেটই বেশী। এরকমই একটা সেটে নীলা থাকে। শাহ ভাবে, ইয়ারদোস্তদের খুশী করার জন্যে নীলার বৈঠকেই একরাতের মহফিল রাখবে।

কিন্তু বন্ধুরা রাজী হয় না। ওরা বলে, না শাহজী, ওখানে কেবল আপনারই অধিকার। এত বছর আমরা কোন আব্দার করিনি, নামও উচ্চারণ করিনি। আমরা কেবল ভাইপোর বিয়েতে আনন্দ করতে চাই। ওকে খানদানী বাদশার মতন নিজের প্রাসাদে ডাকো, আমাদের বৌদির প্রাসাদে.......।

ওদের প্রস্তাব শাহের ভাল লাগে। ও নিজেও ওদেরকে নীলার দরজা দেখাতে চায় না (যদিও কানাঘুষো শুনেছে যে ওর অনুপস্থিতিতে দু'একজন আমীরজাদা নীলার কাছে যায়)। আর মনে মনে ভাবে, নীলা একবার ওর বাড়িতে এসে জাকজমকটাতো দেখে যাক। কিন্তু শাহনীর ভয়ে ও বন্ধুদের কথায় সায় দিতে পারে না।

বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম দুইজন তখন বুদ্ধি খেলিয়ে শাহনীর কাছে গিয়ে বলে, বৌদি, আপনি ছেলের বিয়েতে গানবাজনা করাবেন না? আমরা আনন্দ করবো না? শাহ বলছিল ফ্লেইটীতে একরাতের মহফিল বসাবে। কিন্তু এতে হাজার হাজার টাকা উড়ে যাবে। ঘরটাতো আপনার। এতদিন কি ও কঞ্জরীকে কম খাইয়েছে? আপনি একটু ভাবুন। ওকে গানবাজনার জন্যে একদিন আপনার প্রাসাদেই ডাকলে কেমন হয়! ছেলের বিয়ের আনন্দও হবে আবার অনেক টাকাও বাঁচবে। শাহনী রেগেমেগে বলে, আমি ঐ বেশ্যার ছায়াও মারাতে চাই না!

অন্য বন্ধুটি বলে, এখানে বৌদি তোমার রাজত্ব, ও হুকুমে বাঁধা বাদীর মতন আসবে, গাইবে, যেমন বাঈজি কিম্বা হিজড়েরা আসে, তেমনি ফিরে যাবে।

একথা শাহনীর পছন্দ হয়। এমনিতে শুতে বসতে মাঝমধ্যেই ওর মনেও নীলাকে দেখার ইচ্ছা জাগে। মনে মনে ওর রূপ কল্পনা করে। ওর প্রতি কখনো ভয় কখনো দয়া কখনো ঘেন্না জাগে। শহরের পথে টাঙ্গায় বসে কোন কঞ্জরীকে যেতে দেখলেই ভাবনারা তাকে অস্থির করে তোলে।

কে জানে এই মেয়েটাই কি না। এখন ওকে দেখার সুযোগ আসায় ও মনে মনে ভাবে, ও আমার আর কী ক্ষতি করবে? যা করার তা অনেক আগেই করে নিয়েছে। একবার চন্দরীকে এনে দেখেই নিই।

শাহনী রাজী হয়ে যায়। তবে এক শর্তে, এখানে মদ চলবে না, মাংসও ঢুকবে না। অভিজাত বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী গানবাজনা চলবে। আপনারাও সপরিবারে আসবেন। ও এসে গান গেয়ে সোজা ফিরে যাবে। আমি ওর ঝুলিতে চারটে বাতাসা ঢেলে দেবো, যা বন্নে- সেহরে গানে-ওয়ালীদেরকেও দেবো।

এক বন্ধু মহা উৎসাহে বলে, এটাই তো আমরাও বলি বউদি!

অন্যজন বলে, তোমার বুদ্ধিতেই তো সংসার সাজানো গোছানো, নাহলে কে জানে কী হয়ে যেত!

নীলাকে আনার জন্যে শাহনী নিজের পাল্কী পাঠায়। ঘরে অতিথি গমগম। বৈঠকে সাদা চাদর বিছিয়ে মাঝখানে একটা ঢোলক রাখা। মহিলারা মিলনের গান বন্নে ও সেহ্‌রে শুরু করে দিয়েছে।

পাল্কী সদরে থামতেই উৎসুক মহিলারা দৌড়ে জানালায় চলে যায়, অনেকে গিয়ে সিঁড়ির কাছে ভীড় করে। শাহনী ওখানে গিয়ে ওদেরকে ধমকে বলে, আরে তোরা পবিত্র সেহরে গাওয়া ছেড়ে চলে এসেছিস, অকল্যাণ হবে যে! কিন্তু নিজের আওয়াজ নিজেই শুনতে পায় না। ওর বুক কাঁপে।

নীলা সিঁড়ি চড়ে দরজা অব্দি চলে আসে। শাহনী নিজের গোলাপী শাড়ির আঁচল সামলায়, যেন এই পবিত্র আশীর্বাদী রঙকে ভর করে বুকের বল বাড়িয়ে নিতে চায়। সামনেই নীলার পরনে সবুজ রঙের বাঁকড়ীওয়ালা গরারা। বাঁকড়ীতে চওড়া সোনালী জড়ির কাজ। উপরের লাল কামিজ ঢেকে মাথা থেকে পা অব্দি ঝুলছে বিশাল ঝিলমিলে এক চুনরি। মুহূর্তের জন্যে শাহনীর মনে হয় সমস্ত দরজায় সবুজ ছেয়ে গেছে।

তারপর সবুজ কাঁচের চুড়ির ছনছন শব্দে শাহনী দেখে একটি ফর্সা সুডৌল হাত একটু নুয়ে পড়া কপাল ছুঁয়ে ওকে আদাব করে। রিনরিনে আওয়াজে বলে, বহুৎ বহুৎ মুবারিক শাহনী! বহুৎ বহুৎ মুবারিক!

খুব নরম এবং পুতুলের মতন মেয়েটি যেন স্পর্শেই শিউরে উঠবে। শাহনী পাশ-বালিশে হেলান দিয়ে বসে নীলাকে হাত বাড়িয়ে বসার ইশারা করার সময় লক্ষ্য করে মেয়েটির সুন্দর বাহু জোড়ার পাশে নিজের মাংসল হাত বড়ই বেডোল।

এক কোণে শাহ ও তাঁর বন্ধুরা বসে আছে। পাশে বসে আরো কয়েকজন অতিথি আত্মীয় পুরুষ। নীলা একবার ঐ কোণার দিকে তাকিয়েও সেলাম পেশ করে, তারপর পাশ-বালিশে ভর দিয়ে মহারাণীর মতন বসে পড়ে। বসাব সময় ওর কাঁচের চুড়িগুলি আবার ছনছনিয়ে ওঠে। শাহনী আবার ওর হাতগুলি দেখে, সবুজ কাঁচের চুড়ি দেখে, তারপর স্বাভাবিকভাবেই নিজের হাতের ভারী মোটা সোনার চুড়গুলিকে দেখতে থাকে। কী যেন ভাবতে থাকে। নাকি কিছুই ভেবে ওঠার অবকাশ পায় না।

সমস্ত কামরা কোন জাদুমন্ত্রে যেন মোহাবিষ্ট। প্রত্যেকের চোখ স্থির, শাহনীর চোখজোড়াও। কিন্তু নিজের চোখজোড়া ছাড়া অন্য সবার চোখের উপর ওর রাগ ওঠে। ও আর একবার বলতে চাইছিলো, আরে তোমরা পবিত্র সেহরে শুরু করো, মাঝপথে ছেড়ে দিলে অকল্যাণ হবে যে! কিন্তু ওর আওয়াজ বেরোয় না। হয়তো অন্যরাও এমনি বোবা হয়ে গেছে, সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। সমস্ত কামরায় এক আজব স্তব্ধতা। ও মাঝখানে রাখা ঢোলকের দিকে তাকায়, ওর ইচ্ছে করে

এক্ষুণি ঐ ঢোলকটাকে টেনে নিয়ে জোরে বাজাতে শুরু করে।

যার জন্যে এই স্তব্ধতা অবশেষে সেই-ই প্রথম বলে ওঠে, আমি তো সবার আগে ঘোড়ী গাইবো, ছেলের মাঙ্গলিক শগুণ করবো, কী বলো শাহ্নী? ও শাহ্নীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ঘোড়ী গাইতে শুরু করে, নিক্কী নিক্কী বূঁদী নিকিয়া মীহ বে বরে, তেরী মা বে সুহাগন তেরা শগন করে..... গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, তোর মা তোর মঙ্গল কামনা করে.......!

শাহ্নীর মনে হঠাৎ ভীষণ স্বস্তি ছেয়ে যায়। গানের মধ্যের মা এখানে ও নিজে, আর ওর পুরুষ স্রেফ ওরই পুরুষ — তবেই তো মা সুহাগন......! ও হাসি হাসি মুখে এগিয়ে বসে। তখনও নীলা মিষ্টি আওয়াজে ছেলের শগুনের গান গেয়ে যায়।

ঘোড়ী শেষ হলে কামরায় গুঞ্জন ওঠে। তারপর আবার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মেয়েমহল থেকে ফরমাইশ আসে — ঢোলকী রোড়েওয়ালা গীত! পুরুষরা মির্জা-সাহিবাঁর 'সদ' শুনতে চায়। গায়িকা পুরুষদের ফরমাইশ আমল না করে ঢোলটাকে টেনে নিয়ে হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়ে নেয়। তারপর ও একের পর এক মেয়েদের ফরমাইশ মতন গান গাইতে থাকে। শাহ্নীর বেশ ভাল লাগে।

পাশে বসা মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতো না। ওরা ফিসফিসিয়ে একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, শাহের কঞ্জরী। কেউ তো প্রায় শাহ্নীর কানের কাছেই কথাটি বলে ফেলে। এতে শাহ্নীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। ততক্ষণে ঢোলকের আওয়াজ বেড়ে গেছে, সঙ্গে গায়িকার গলাও সপ্তমে ...... সুহে বে চীরে বালিয়া ম্যায় কহনী হাঁ......... আর শাহ্নীর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি প্রায় থেমে পড়ে। এই সুখী ঘোড়সওয়ার হবে আমার ছেলে.......!

ফরমাইশের অন্ত নেই। একটা শেষ হতেই আরেকটা শুরু হয়ে যায়। এখন মাঝেমধ্যে গায়িকা পুরুষদের ফরমাইশ মতনও গাইছে। মাঝেমধ্যেই ও বলে, অন্য কেউ দু'একটা গাও। আমাকে দম নিতে দাও। কিন্তু কে শোনে ওর কথা। কার হিম্মৎ আছে ওর গানের পাশে গান গায়। ওর মাদক আওয়াজের গমক প্রত্যেক শ্রোতার অস্তিত্বে ছেয়ে যায়। বলতে হয় বলেই হয়তো ও এরকম বলে। তারপরই বিরামহীন একটার পর একটা গাইতে থাকে।

আর তারপর যখন মির্জা-সাহিবাঁ লোকগাঁথার সুর তোলে,— উঠ নী সাহিবাঁ সুত্তীএ। উঠ কে দে দীদার....... শুয়ে থাকা সাহিবাঁ জেগে ওঠ, উঠে তোর চেহারা দেখা......। তখন বাতাসের হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। কামরায় বসা পুরুষরা মূর্তি হয়ে পড়ে। শাহ্নীর বুক আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। ও শাহের দিকে তাকায়। শাহও ওদের পাশে মূর্তি হয়ে বসা। তবে শাহ্নীর মনে হয়, ও পাথর হয়ে পড়েছে।

শাহ্নীর গা গুলায়। ওর মনে হয় নীলা আজকের এই মুহূর্তগুলি ছিনিয়ে নিয়ে গেলে ও নিজেও এক মাটির প্রতিমা হয়ে থেকে যাবে। ওকে কিছু করতে হবে, কিছু করতেই হবে। ও মাটির প্রতিমা হয়ে যেতে চায় না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মহফিল প্রায় শেষের দিকে। শাহ্নী আগে বলেছিল ও গানের পরে নীলা ও সমস্ত বন্নে ও সেহরে গানেওয়ালীদের রীতি অনুযায়ী কেবল বাতাসা দেবে। কিন্তু এখন কামরায় চা ও অনেক রকম মিষ্টি চলে আসে। তারপর শাহ্নী মুঠি থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাপা একশো টাকার নোট বের করে ছেলের মাথার উপর ঘুরিয়ে নীলার হাতে ধরিয়ে দেয়। ও বলে— থাক্ থাক্ শাহ্নী! এমনিতেও তো তোমারই খাই। বলে ও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ওর হাসিও ওর রূপের মতন ঝিলমিলিয়ে ওঠে।

শাহ্নীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। এই ভরা সভায় শাহের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ জুড়ে কঞ্জরী কি

ওর অপমান করতে চায়? ওর ভীষণ রাগ হয়। কান ঝা ঝা করে। তবু নিজেকে সামলায়। আজ কোনমতেই হারলে চলবে না। ও বেশ জোরে হেসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নীলার হাতে নোটটা গুঁজে দিয়ে বলে, শাহের থেকে তো রোজই নিস্, কিন্তু আমার হাত থেকে আর কবে পাবি? চল্ আজ নিয়ে নে!

তখন শাহের কঞ্জরী, একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে, শাহ্নীর ঐ এককথায় কেমন ঝিমিয়ে পড়ে !

এভাবেই ঐ কামরায় শাহ্নীর পবিত্র শাড়ি, শগুনের গোলাপী রঙ ছেয়ে যায়।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৬

সন্তোখ সিংহ ধীর

মঙ্গো

হুক্‌মে মাস্টের গরু দুধ দেওয়া কমিয়ে দিলে ও আরেকটা গরু কিনে আনে। নতুন গরুটা দু-একদিনের মধ্যে বিয়োবে। একবেলা ঘরে দুধ না থাকলে চাষী পরিবারে খুবই অসুবিধা হয়। আগের গরুটার জন্ম এই বাড়িতেই। মঙ্গলবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর নাম রাখা হয়েছিল মঙ্গো। নতুন গরুটা সোমবারে আসায় ওর নাম পড়ে সোমা।

সোমাকে এনে গোয়ালের খুঁটিতে বাঁধতেই বাড়ির সবাই এসে ওখানে জড়ো হয়। বাচ্চারা খুশীতে লাফাতে থাকে। হুক্‌মে ওর পিঠ হাতিয়ে থুতুনী নেড়ে আদর করে দেয়। হুক্‌মের বউ চিন্তো বরণ করার জন্যে চাড়ির মধ্যে গুড়, চানা আর রূপোর টাকা নিয়ে এসে ওর মুখের সামনে রেখে মাথা নেড়ে দেয়, পিঠ থপথপায়। সোমা শান্তভাবে চাড়ি শোঁকে, তারপর ভীতু চোখে ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চিন্তো ওর ঝুলে পড়া পেটে হাত নাড়ে, পুরুষ্টু ওলানে আঙুল ফেরায়, ওলানে লেগে থাকা একটা এঁটুলিকে টেনে তুলতে গিয়ে একটা লোমও ওর হাতে উঠে আসে। সোমা চমকে ওঠে। চিন্তো ঠোঁট দিয়ে 'পুচ্চ-পুচ্চ' আওয়াজ করে সোমাকে খাওয়াতে চায়। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ও একবার চাড়িতে মুখ দিয়ে খানিকটা খেয়ে নেয় তারপর আবার শান্তভাবে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

হুক্‌মে বলে, একে লাই-এর গাছ খেতে দাও চিন্তকৌরে, ওর বোধ হয় বায়ু-বিকার হয়েছে। চিন্তো বলে, আসলে তা না, আগের মালিকের জন্যে মনখারাপ করছে, ওরও তো আমাদের মতন মন আছে। ও চাড়ি উঠিয়ে গরুটাকে জল দেখায়। ভুসির লেই করে খেতে দিতে বলে, কেউ কি আর সাধে গাভীন গরু বিক্রি করে?

হুক্‌মে বলে, একটুও চানা খেল না যে?

গরু দেখতে আসা প্রতিবেশিনী বলে, নতুন নতুন তো, নতুন পশু একটু কমই খায়। মনে হয় এটা সুরাজাতের, এদের খোরাক ছাগলের মতন আর দুধ দেয় ভরপুর। যাই খাওয়াবে দেখো যাতে পুষ্টিকর হয়।

চিন্তো বলে, তুমি ভাগ্যবতী, তোমার মতন কী আর খাওয়ানোর ক্ষমতা আছে আমার? প্রতিবেশিনী ওর মজায় সায় দিয়ে বলে, ঠিক আছে বোন, আমার থেকেই ধার নিও, দুধও কিছুটা আমি খাব। বলতে বলতে ও চলে যায়। হুক্‌মের হাতে লাই এর ডগা। ও রেগেমেগে বউকে বলে,

আর রঙ্গ করতে হবে না, ও যে পথ দিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি সেই পথের মাটি এনে গরুটার গায়ে ছুঁইয়ে চুলোয় ফেল চিন্তকৌরে, এদের নজর এত খারাপ যে পাথর ফাটিয়ে ফেলতে পারে।

মঙ্গো পাশে দাঁড়িয়ে এসব কিছু দেখছিলো। এতক্ষণ হয়ে গেলো কেউ ওর দিকে ঘুরেও তাকায় নি। সবাই নতুন অতিথি নিয়ে ব্যস্ত। হিংসে হয়। ওর এখানে জন্ম, এখানেই বড় হয়েছে, তিন তিনবার গাভীন হয়েছে, এত বছর ধরে দুধ খাওয়াচ্ছে; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঘরের লক্ষ্মী! আর যে এসেছে, না জানি কবার গাভীন হয়েছে, সুস্থ বাছুর বিয়োবে কি না কে জানে! তারপর কতটা দুধ দেবে তাই বা কে দেখেছে? হয়তো কোন বিদেশী গরুর পয়দা, না জানি কার কার হাতে চারা খেয়েছে। তবু ওকেই তোমরা বেশী আদর করছো। ওর মনে ক্ষোভ জন্মায়। এখন দুধ কমে গেছে বলে এমন করছো? ন'মাস ধরে তো লাগাতর দুধ খাইয়েছি। আবার বিয়োলে আবার দুধ হবে। এবার তাড়াতাড়ি দুধ শুকানোর জন্যেও কি তোমরা দায়ী নও? এক এক বিন্দু তো নিংড়ে নাও। আমার বকনাটা ছটফট করতো। ওর জন্য সামান্য দুধও তোমরা রাখতে না। প্রতিদিন মাঝরাতের পর ও থেকে থেকে হাম্বাতো। ওকে কখনো সন্তানের মতন ভাবো নি। আমাকে কাঁদিয়ে তোমরা আনন্দে থাকতে। বাছুরের জন্যে কি ওলানের দুটো বান ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? শুকনো ঘাস আর খড় চিবিয়ে চিবিয়ে আমার ওলান ভরাতাম। তবু কখনো রাগি নি কিম্বা লাথি মারি নি। আজ আমার এই কদর? ভাল হওয়ার এই পরিণাম?

নতুন অতিথি আসতে না আসতেই এত সমাদর, যেন আশীর্বাদী সমারোহ, দুমুঠো চানা আমার সামনে ধরলে কি চারপাশ অন্ধকার হয়ে যেত? আমি কি পেটুক যে সমস্ত চানা খেয়ে নিতাম। এইটুকু আদরে নবাগতার সামনে আমার ইজ্জৎ থাকতো। লাই-এব দুটো ডগা আর এমন কি আহামরি জিনিস? দাড়িওয়ালা মানুষ হয়েও এই অন্যায় করতে ওর লজ্জা করলো না? মালিকই তো পশুর মা-বাপ। মা-বাপের কাছে সবাই সমান হওয়া উচিত।

আর ঐ মুটকি, দেমাকী, না জানি ওর কিসের এত অহঙ্কার? সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়াতে দেয় না। থেকে থেকেই গ্লাস নিয়ে দোয়াতে চলে আসে। সারাদিন চুলায় বাটি বসা থাকে, থেকে থেকেই চায়ের জল ফুটতে থাকে, কার দৌলতে? দিন চারেক পয়সা দিয়ে দুধ কিনতে হলো বলেই সারা পরিবারের মাথা খারাপ। কে ওদেরকে জল না মিশিয়ে খাটি দুধ দেবে? এখন দ্বিগুণ দামে অর্ধেক জল মেশানো দুধ খাও! ঐ মুটকী তখন বুদ্ধি করে দোয়ানোর সময় সামনে আমার বাছুরটাকে বেঁধে পিঠ থপথপিয়ে আদর করে বলে, মঙ্গো, চায়ের জন্যে একটু দুধ দে বোন। মিষ্টি ছুরি। এখন এসো, ঢেলে দেব দুধ, আরো যখন তখন আমাকে গিব গিব করে মারো!

হায়রে, আমার পায়রার মতন কচি বকনাটা জন্মেছিল। সারা শরীরে সাদা সাদা সুন্দর ছাপ, কপালে সূর্যের মতন ফুল। একে দেখে ভগবতী মালকিন আমার মুখ বাঁকিয়ে বলে, একটা এঁড়ে বাছুরও দিতে পারলি না! জাটনী নিজের স্বার্থে কথা বলে। এঁড়ে হলে হালে জুড়তে পারতো। আমার দুধ খেতো আর ওর রক্ত চুষতো। আরে সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। বকনাটার ছয়মাস বয়স হওয়ার আগেই এর বোনের কাছে বেঁচে দিলো। নিজের পঁচিশ বছর বয়সী ধিঙ্গি মেয়েটি সারাদিন কাজ করে বলে ওকে বিয়ে দেওয়ার নাম করে না। সারাদিন মা আর মেয়ে সতীনের মতন ঝগড়া করে। একেই কি বলে সন্তানের আদর?

পরের বছর আমার এঁড়ে হলো। হাঁসের মতন সাদা ছেলে আমার উঠোনময় উড়ে বেড়াত। এদের সংসারে অভাব মেটানোর দায় পড়লো ওর উপরেই। দশমাস হওয়ার আগেই ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে এল। ও বারবার পা পিছলে পিছলে বাড়ি ফিরতে চাইছিল, সে দৃশ্য এখনও ভুলতে পারি না। গলায় রশি বেঁধে টেনে হিচড়ে নেওয়ার সময় ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো। আমি দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছিলাম। ওর আর্তনাদ আজও আমার কানে বাজে।

মুটকির নিজের ছেলে না জানিয়ে ফৌজে ভর্তি হয়ে চলে গেলে সারা পরিবার কেঁদে কেটে লোকজন জড়ো করেছিল। আমি কাকে কেঁদে শোনাই? এখন এই বাছুরটার দিকে মুটকির জিহ্বা লম্বা হচ্ছে। আমার বুক ফেটে যায়। এই পাপিষ্ঠা আমার উপর কম অত্যাচার করেনি। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে তাহলে ওরা যা যা করেছে ওদের সঙ্গেও ঠিক তা হবে। আমিও পারতে ওদের দিকে তাকাই না। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। শুনেছি কাল নাকি আমার নাকে নথ পরাবে। দড়ি নিয়ে আসুক তো, দেখাব মজা।

পরদিন সকালেই চিন্তো গ্লাস নিয়ে দুধ দোয়াতে আসে। বাছুরটাকে ছেড়ে ওলানে জল লাগিয়ে বানে টান দেওয়ার আগেই মঙ্গো একলাফে সরে দাঁড়ায়। চিন্তো ওকে গালি দেয়। পাশে দাঁড়ানো বাছুরটা এসে ওলানে মুখ দেয়। মঙ্গো দাঁড়িয়ে থাকে। চিন্তো বাছুরটার কান ধরে টেনে নিয়ে খুঁটিতে বেঁধে দেয়। আবার ওলানে জলের ছিটা দিয়ে বানে হাত লাগাতে গেলেই মঙ্গো ওর মুখ বরাবব লাথি মারে। চিন্তো লাফিয়ে উঠে কোনমতে মুখ বাঁচিয়ে বলে— আরে! তোকে চোরে নিয়ে যাক্!

বাছুরটা মুখ লাগিয়েছিল বলে এখন বানে দুধ চলে আসে। ওর লম্বাটে ওলান ফর্সা এবং পুরুষ্টু। চিন্তো চেঁচিয়ে বলে, মীরোর বাবা শুনছো, থাম থেকে রশিটা খুলে আনো তো, না জানি মঙ্গোর মাথায় কোন্ চন্ডাল চেপেছে!

হুক্মে থামে বাঁধা নতুন রশিটা খুলে এনে মঙ্গোর পা বেরিয়ে বেঁধে দিলে চিন্তো বলে, এখন লাফা তো দেখি সতীন! রশিটা মঙ্গোর পায়ে গেড়ে বসেছে। জোর লাগিয়েও ও নড়তে পারে না। লেজ অব্দি নাড়াতে পারে না। মঙ্গো এবার কান খাড়া করে শিং বাগালে চিন্তো ওর থুতনিতে লাঠি দিয়ে মারে চারিদিক থেকে কাবু হয়ে মঙ্গো আর কী করে। চিন্তো যথারীতি দুধ দোয়ানো শুরু করেছে। মঙ্গো একটু ভেবে দাঁড়ানো অবস্থায়ই দুধ উপবে চড়িয়ে নেয়। চিন্তো খালি ওলানে টানাটানি করে বিফল হয়।

শেষ পর্যন্ত ওর জেদ মাথা নোয়ায় নি বলে মঙ্গো খুশী হয়। চিন্তো একই কারণে রাগে গজ গজ করতে থাকে। হুক্মে গোয়ালে গুগ্গলের ধোয়া দেয়। গুরদুয়ারার ভাইজী থেকে আশীর্বাদী তাবিজ নিয়ে আসে।

মঙ্গোর মনে এমনিতে সর্বসময় শত্রুতা থাকে না। সোমার আগমনে ওর অভিমান ও প্রতিবাদ প্রকাশ করে রাতভর চোখ বন্ধ করে জাবর কাটতে কাটতে আয়েসে ঘুমায়। ভোরবেলা হুক্মে একসেরী লোটা নিয়ে দুধ দোয়াতে এলে সেটা গলা অব্দি ভরে যায়। ও বলে, এই শালী মঙ্গলবারে জন্ম হয়েছে বলে একটু তেতো স্বভাবের, না হলে চিন্তকৌর মঙ্গোর মনটা খারাপ নয়। একথা শুনে মঙ্গো একটু প্রসন্ন হয়। এরপর কদিন চিন্তো দড়ি না বেঁধেই একটু একটু করে দুধ দোয়াতে পারে। এদিকে সোমা বিয়োবে বলে চিন্তো দেশী ঘি আর আজোয়াইন কিনে এনেছে। পুরো পরিবারের নজর এখন ওর দিকেই।

প্রসবের পর সোমার আদর যত্ন দেখে মঙ্গো আবার ক্ষেপে যায়। সোমার ক্ষেত্রে ওরা যতো আদিখ্যেতা করছে মঙ্গো বিয়োনোর সময় তার সিকিভাগও করেনি। আজ চিন্তো দুধ নিতে এসে পিঠে হাত বোলাতেই শিং বাগিয়ে তেড়ে যায়। চিন্তো বেগরবাই বুঝে হুক্মেকে ডাকে। ও লাঠি নিয়ে এসে মঙ্গোর শিং চেপে ধরে। মঙ্গো শিং ছাড়ানোর জন্যে জোর লাগালে চিন্তো হুক্মের বগল থেকে লাঠিটা নিয়ে মঙ্গোর পিঠে দমাদম মারে। মঙ্গো ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে। তখুনি চিন্তো ওর পায়ে দড়ি বেঁধে দেয়। ও লাফালাফি করায় দড়ির প্যাচ যেন আরো গেড়ে বসে। ও রেগেমেগে ভাবে, আমাকে দুর্বল পেয়েছে? ওর মাথায় দুষ্টুমি খেলে।

ওদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে চুপচাপ গোবেচারী দাঁড়িয়ে থাকে। বাছুরটা সামনে থাকায়

ওর ওলান দুধে ভরে তুলতে বেশী সময় লাগে না। চিন্তোও অনায়াসে চ্যাং চোং গাবুৎ গাবুৎ করে দুধ দুইয়ে পাত্রটা ভরে ফেলে। চিন্তো খুশী হয়ে বলে, — এরকম চুপচাপ থাকলে তোকে কেউ একটাও গালি দেবে না।

হুক্‌মেও ওর শিং ছেড়ে দিয়ে অসাবধানে দাঁড়িয়ে ভাবে, যাক গরুটা আবার দুধ দিচ্ছে।

এবার চিন্তো ওর দড়ি আলগা করতেই ও সামনের দুপায়ে ভর দিয়ে পেছনের দুপায়ে লাফিয়ে উঠে চিন্তোর থুতুনিতে লাথি মারে। দুধের পাত্রটাও নিচে গড়িয়ে পড়ে। চিন্তো ছিটকে পড়ে থুতুনি ও কপাল ধরে 'হায়, হায়' করতে থাকে। মঙ্গো খুঁটি উপড়ানোর জন্যে জোর লাগায়। হুক্‌মা এসব দেখে দাঁত কিড়মিড় করে লাঠিটা তুলে নিয়ে ওকে মারতে মারতে তুলোধুনা করে ফেলে। মারতে মারতে একসময় হাপিয়ে উঠলে তবেই ওকে মারা বন্ধ করে। মঙ্গো চুপচাপ দাঁড়িয়ে মার খেতে খেতে ভাবে একজন রশিতে বাঁধা থাকলে আর অন্যজন খোলা অবস্থায় লাঠি হাতে থাকলে এরকম বীরত্ব যে কেউ দেখাতে পারে।

বিয়োনোর দুদিন পর থেকেই সোমার দুধ মানুষের খাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে। সোমার ওলানে দুধও অনেক। বাড়ির লোক তাই এখন মঙ্গোকে আর ছোঁয় না। এই গোঁয়ারটাকে ছুঁয়ে কে আহত হবে, আর পশুর সঙ্গে পশুর মতন ব্যবহাব করবে! ওর প্রতি কারো কোন আগ্রহ নেই দেখে মঙ্গোও নিজের নীতি পাল্টায়। সোমার প্রতি হিংসে থেকেই ওর মন বিষিয়ে ছিল। দুবেলা ভাঙ্গা শস্যের জাল দেওয়া লেই, ভেজানো খইল, লাই-এব ডগা, আরো কত কী ছিল সোমার খাদ্য। মঙ্গোর কপালে জুটতো শুকনো খড় আর ভুসি। সতীন কোথাকার! ও আসার পর থেকেই বাড়ির লোকেরা এই অবিচার শুরু করেছে।

একদিন চিন্তো সোমার সামনে খাবার রেখে সবে বাইরে গেছে তখুনি সুযোগ পেয়ে মঙ্গো হাঁটু গেড়ে বসে ওর সামনে থেকে চাঁড়িটা টেনে নেয। পুরো খাবারটাই নিচে পড়ে যায়। চিন্তো এসে তা দেখে লাঠি নিয়ে মঙ্গোর থুতনিতে মারে পাঁচ-সাত ঘা— আরে তুই আমার কোন জন্মের শত্রু, সতীন কোথাকার, পোয়াতি গরুটার পেটেও দু মুঠো ঢুকতে দিস না।

মঙ্গোর রাগ আরো বেড়ে যায়। সুযোগ পেলেই ও মুখ বাড়িয়ে সোমার খাবার কিম্বা জল খেয়ে নেয়। বাকীটা নিচে ফেলে দেয়। সোমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব সহ্য করে। কিছু বাঁচলে খায়, কিন্তু ওফ্ শব্দটিও করে না। ওর এই নীরবতায় মঙ্গোর রাগ দ্বিগুণ বাড়ে। একবার সোমার ছোট্ট বাছুরটা লাফিয়ে মঙ্গোর কাছে আসতেইও বাচ্চাটাকে শিঙে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। সোমা আর্তস্বরে হা-ম্‌-বা ডেকে ওঠে। চিন্তো চিৎকার করে বলে, আরে তোকে তো কসাই এর কাছে বেঁচবো, মীরোর বাবা শুনছো, কোদালটা নিয়ে এসো তো, এই অলক্ষ্মীটা চারদিনের বাচ্চাটাকে মেরেছে!

হুক্‌মে এসে আবার ওকে বেদম লাঠিপেটা করে। মঙ্গো চুপচাপ যন্ত্রণা সহ্য করে আর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবে। পরদিন রাখাল ওদেরকে ঘাস খাওয়াতে মাঠে নিয়ে গেলে ও সুযোগ পেতেই শিং বাগিয়ে বারবার সোমাকে ঘায়েল করে। রাখাল ওকে লাঠি দিয়ে পেটায়। যত পেটায় তত রাগ বাড়ে আর তত বেশী রোষে তেড়ে গিয়ে দুই দুবাব সোমাকে ও মাটিতে ফেলে দিয়ে গুতোতে থাকে।

অনেক কষ্টে ওদেরকে সামলে রাখাল বাড়ি ফিরে চিন্তোকে সব বলে। ও দুষ্ট গরুকে ঠাণ্ডা করার নানা উপায় বলে। পরদিন ভোরে ওর কথামতন হুক্‌মে আর চিন্তো এসে ওর সামনের পায়ের সঙ্গে দড়িব একপ্রান্ত বেঁধে অন্যপ্রান্ত ওর শিং-এ এমনভাবে বেঁধে দেয় যাতে ও ঘাড় উঁচু না করতে পারে।

সারাদিন ও অনেক কষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। মাঠে গিয়ে এক জায়গায় গোঁজ হয়ে থাকে। নিতান্তই ক্ষিদে পেলে খানিকটা ঘাস খায় আর সোমার অস্তিত্ব কল্পনা করেই ফুঁসতে থাকে।

সন্ধ্যায় গোয়ালে ফিরে ওর বাঁধন খোলার পর থেকেই তক্কে তক্কে থাকে। রাগে দাঁত পিষতে থাকে। আজ তোর এক রাত কি আমার এক রাত, হয় তুই থাকবি না হয় আমি। সোমা মঙ্গোর চোখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ভয় পায়। ওর সারা শরীরে মঙ্গোর শিঙের গুঁতোর ব্যথাগুলি টনটন করে। এখন ইলেকট্রিক বাল্বের আলোয় মঙ্গোর রক্তবর্ণ চোখ যমরাজের মতন ভয়ঙ্কর। সোমা ভেঙ্গে পড়ে। কত আর সহ্য করা যায়। সমস্ত জীবনের বেদনা ওর চোখে ভরে আসে। ঐ রক্তাক্ত চোখের সামনের বেঁচে থাকা কী ভয়ঙ্কর। চারপাশে কেউ নেই শুধু মৃত্যুদূত মঙ্গো বড় বড় চোখে তাকিয়ে ফুঁসছে। ইস, কেবল একটিবারের জন্যেও যদি ও চোখ বন্ধ করতে পারতো, এই ভয়ানক বাস্তব থেকে লুকিয়ে থাকতে পারতো শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। ওর সমস্ত দুঃখ ও ভয়ে ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে। পা কাঁপতে থাকে থরথর করে। নিজের ওজনই ভীষণ ভারী লাগছে। ওর দুচোখ দিয়ে দুঃখের নদী বন্যা বইয়ে দেয়। আজ অনেক দিন পর মঙ্গো খুশী হয়। সোমাকে এভাবে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে দেখে ওর দয়া হয়। আহা বেচারীর কী দোষ! নিষ্ঠুর মালিকই তো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই অসাম্যের স্রষ্টা। ভাবতে ভাবতে ও চোখ বন্ধ করে জাবর কাটে। একটু পরেই চিন্তো এসে আলো বন্ধ করে যায়। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ 'ধড়াম' শব্দে সবার ঘুম ভাঙ্গে। হুক্মা লাফিয়ে উঠে গোয়ালে এসে আলো জ্বালায়। তারপর চিৎকার করে বলে, চিন্তকৌর, তাড়াতাড়ি দেখে যা! আমাদের সোমার কী হয়েছে?

চিন্তো ছুটে এসে সোমার গলা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে। হুক্মা সোমার কানে জোরে জোরে ফু মারতে থাকে। চিন্তো কাঁদতে কাঁদতে বলে, কানে ফুঁ দিয়ে আর কী হবে, গলার দড়িটা খুলে দাও! সোমা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে গো.......।

ওরা স্বামী স্ত্রী বাকী রাতটা সোমাকে নানাভাবে শুশ্রূষা করে। মঙ্গো ভাবে, আহ্লাদ পাওয়ার জন্যে সোমা ঢঙ করছে। কতরকম অভিনয় ও জানে। রাতে কেঁদে কেটে মঙ্গোর মার থেকে বেঁচেছে। এখন মাঝরাত থেকে মালিক ও মালকিনের সেবা নিচ্ছে। তুই কি ভেবেছিস, এখন ওরা তোকে পুজো করবে? সে গুড়ে বালি! মানুষ ভীষণ স্বার্থপর। এখন মরার মতন পা ছড়িয়ে শুয়ে আছিস কেন? তুই মরলে কি পৃথিবী খালি হয়ে যাবে? জানিনা বাবা, এসব চালাকির মানে কি? আমি তো এরকম কখনো করতে পারবো না।

সকালবেলা মঙ্গো যখন এরকম ভাবছে পাঁচ-সাতজন লোক এসে গোয়ালে ঢুকে সোমার পাগুলি বেঁধে ভেতরে ডান্ডা ঢুকিয়ে ওকে চেড়ে তোলে। একী! সোমা সত্যি মরে গেছে! মঙ্গো পাথর হয়ে পড়ে। সারা শরীরে শীতল শিহরণ বয়ে যায়। একী হয়ে গেল। এমনটি তো ও কখনো ভাবেনি। দুটো বাসন পাশাপাশি থাকলে মাঝেমধ্যে ঠোকর লাগেই। কিন্তু এটা কী হয়ে গেল?

গোয়ালের দরজা দিয়ে সোমার মৃতদেহ বের করার সময় ওর ঝুলে পড়া মুখটা চৌকাঠে ঠোকর খেতেই মঙ্গো ভেঙ্গে পড়ে। ও এত জোরে হাম্বায় যে গোয়ালের ছাদে ফাটল ধরে। সোমার খুঁটি একা পড়ে থাকে। ওর বাচ্চাটা কোথায়? সেদিন বিকেলে মঙ্গো আগেভাগেই গরুর পাল থেকে বেরিয়ে সোজা গোয়ালে চলে আসে। সারাদিন ও একটা ঘাসও খেতে পারেনি। গোয়ালে ঢুকেই ও ভীষণ জোরে হাম্বায় আর নিজের জন্যে রাখা খাবার ছেড়ে সোমার খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সোমার ঝিমিয়ে-পড়া বাছুরটার গা চাটতে চাটতে ও ফোঁসফোঁস করে কেঁদে ফেলে, বাবা আমার, ক্ষমা কর, সোনা আমার। আমি কত ভুল করেছি বাবা।

মঙ্গোর কান্না সারারাত থামে না। সোমার বাছুরের জন্যে ওর ওলানে দুধ ভরে আসে।

রচনাকাল : ১৯৭০

গুরদিয়াল সিংহ

মনে করো

কাপুর সাহেবের বড়ছেলে কিছুদিন থেকে ফিরে গেল, কিন্তু তিনি গেলেন না। বলতে থাকেন, আমরা এখানেই ঠিক আছি। এখানে সবাই নিজের লোক — আপনজন।

ছেলে তবু জেদ ছাড়েনি, সামনের মাসে আবার আসবে বলে ফিরে গেছে। সেই সন্ধ্যায় ক্লিনিকে বসে ছেলের ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে, তার দিয়ে বাঁধা পা ওয়ালা ষাট বছর বয়সী টিনের চেয়ারে বসে জঙ্গী ডাক্তার বলেন— কাপুর সাহেব! মনে করো এখানে তোমার যেমন তেমন কিছু হয়ে গেলে........!

— যেমন তেমন হবে আমার শত্রুর কিম্বা তোমার, যে কমবখৎ জলের ইনজেকশান দিয়ে গরীবদের জীবন নিয়ে খেলা করে। আমি বলছি তোমাকে.....!

— ব্রেক-ব্রেক, কাপুর সাহেব, ব্রেক! গোয়েল মাস্টার ওর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করান। কাপুর সাহেব হেসে ফেলেন। কিন্তু ব্রেক লাগান না। গতি একটু কমিয়ে এনে বলেন, এটা ঠিক আমার বয়স পয়ষট্টি, কিন্তু মশাই আমি এখনই মরতে চাই না। জীবন তো সবে শুরু হয়েছে। বেঁচে থাকা কাকে বলে এতদিন তো টেরই পাইনি। অবসর নেওয়ার পর সাত বছর হয়ে গেছে, তবু প্রায়ই স্বপ্নের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠি— ও রামরক্ষে, একটুও হুঁশ নেই তোর, ট্রেন আউটারে দাঁড়িয়ে আছে আর তুই এখন চাবি খুঁজছিস? ভপ্পের মা মাঝেমধ্যেই আওয়াজ শুনে জেগে ওঠে আর বিড়বিড় করতে থাকে, এই গাড়ির স্বপ্ন, এই পাওয়ার টোকেন-ফোন-সিগন্যাল-ফাটক; এইসব কবে যে পেছন ছাড়বে! আসল কথা কি, এত বছর কোথাও থেমে কিছুক্ষণের জন্যে শ্বাসও নিতে পারিনি। মেল কিম্বা এক্সপ্রেসের মতন ক্রমাগত ছুটে গেছি। আজ এতদিন পর একটু বুকভরে মুক্ত বাতাস নিচ্ছি।

— আর এখন ছেলেরা দম ফেলতে দিতে চায় না। জৈন কানুনগো যেন আবার ওকে ব্রেক লাগাতে চায়। বন্ধুরা পেছনে বলাবলি করেন, কাপুর সাহেবের ভ্যাকুয়ম সবসময় খোলা থাকে আর থামতে থামতেই পুরো প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যায়। ওরা কাপুর সাহেবের সঙ্গে রেল-বিষয়ক শব্দাবলী ব্যবহার করে কথাবার্তা বলে মজা পান। হাসিঠাট্টা করেন। কোন কোন শব্দ কাপুর সাহেবকে রাগানোর জন্যে বলেন। কাপুর সাহেব রেগেমেগে নিজস্ব লাহোরী উচ্চারণে গালি দিতে শুরু করলে ওরা খুব মজা পান। কিন্তু আজ ওরা এহেন শব্দাবলী ছাড়াই উত্তেজিত হচ্ছেন।

— কাপুর সাহেব! জঙ্গী ডাক্তার একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, মনে করো, তোমার ছোটছেলে যদি হায়দ্রাবাদ থেকে এসে বলে, তোমাদেরকে না নিয়ে ফিরবো না, তাহলে কী করবে?

— এই ছড়ি দিয়ে তোর আর ছেলের মাথা ভাঙ্গবো। কাপুর সাহেব রেগেমেগে বলেন, সারা জীবন পাঞ্জাবে কাটালাম, এখন শেষ বয়সে বিদেশ বিভূয়ে ঘুরে মরবো কেন? না জনাব, আমি মরলেও হায়দ্রাবাদ যাবো না। পৃথিবীর কোথাও কী পাঞ্জাবের মতন জায়গা খুঁজে পাবে? ভপ্পের মাকে নিয়ে উত্তরে বেনারস, এলাহাবাদ, দক্ষিণে ত্রিবান্দ্রম আর পশ্চিমে দ্বারকাপুরী ঘুরে এসেছি, পাঞ্জাবের মতন খাওয়া-দাওয়া আর আন্তরিক ব্যবহার কোথাও দেখিনি ভাই।

— না, মনে করো ছোট ছেলে....।

— গোল্লায় যাক ছোট ছেলে!... আর এখন কী বলবো। কাপুর সাহেব হো হো করে হেসে বলেন, তোমার বউ-এর নাম নিয়েও কিছু বলতে পারি না কেননা ভাসুর হই..... তার উপর ও বাতের রুগী।

কাপুরকে হাসতে দেখে বাকীরাও হেসে ফেলেন। কেবল বউকে বাতের রুগী বলে মন্তব্য করায় জঙ্গী ডাক্তার হাসেন না। গোয়েল মাস্টার বলেন, ডাক্তারের স্টীম বের করে দিলে তো?

সেই রাতে ভপ্পের মা চিন্তিতভাবে বলে, নরেশ এতবার বলছে তবু আপনি জেদ ধরে আছেন, কাল যদি ছেলেরা চুপ মেরে যায় তাহলে শেষের দিনগুলি একাকী পড়ে থাকবেন? আমার জীবনেব কী ভরসা, কে জানে ছয়মাসও বাঁচি কি না?

— তুমি চুপ করবে? মরে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছ? একশোবার বলেছি আমার সামনে অলক্ষুণে কথা বলে রক্তচাপ বাড়িয়ে দিও না।

ধমক খেয়ে ভপ্পের মা মুখ-মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু কাপুর সাহেব নিজে ঘুমাতে পাবেন না। ওর মনে কি ভয় ঢুকেছে? ভাড়াবাড়ির ছোট ঘরে পুরনো ছাদের কড়িবরগাব দিকে তাকিয়ে ছটফট করেন। বউ এর নাকের ডাক শুনতে থাকেন। বিরক্ত হন না। বরঞ্চ কখনো নাকের ডাক থেমে গেলেই তিনি চমকে ওঠেন। দুই-দুইবার উঠে বসেন। তৃতীয়বারে এতই অস্বস্তি হয় যে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তখন ভপ্পের মায়েরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন,

— আপনি এরকম কোথায় ঘুরছেন?

— এমনি-ই........ বাথরুম গেছিলাম।

— কষ্ট হচ্ছে? মৌরি দিয়ে চা বানিয়ে দেব কি?

— না, না....... তেমন কিছু না, তুমি শুয়ে পড়ো গে!

দিন পনের ভীষণরকম টানাপোড়েনে ভুগে অবশেষে বড়ছেলেকে চিঠি দিয়ে কাপুর সাহেব সিদ্ধান্ত বদলের কথা জানালে সবাই অবাক হয়ে যায়। জঙ্গী ডাক্তার বলেন, কাপুর সাহেব, মনে করো, ওখানে গিয়ে—

— আমি মরে যাব? তোমরা যতই মৃত্যুকামনা করো না কেন, এত তাড়াতাড়ি মরছি না। আর..... মনে করো যদি মরেই যাই, তোমরা ভাবছো পঞ্চাশ-একশো টাকা খরচ করে শোক করতে এতদূর যেতে হবে? কিন্তু ভাল মানুষ, তোমরা গেলেও যখন আমার ফিরে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই, দোহাই তোমাদের, কষ্ট করে তোমরা আব যেও না, ঠিক আছে?

ডিসেম্বরের ছুটি পড়তেই বড়ছেলে এসে লরীভাড়া করে সব জিনিসপত্র চড়িয়ে নেয়। ভপ্পের মা এক এক করে নিম্মোব বউদি, সত্তুর মা এবং মনজীতীর বউকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন: ওরা সবাই হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু কাপুর সাহেবের চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা যায়

না। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য, রাশভারী মানুষ হওয়ায় ওর মনের ভাব খুব একটা বোঝা যায় না। রাগ, খুশী, দুঃখ অথবা ভালবাসা কখনো ওর আওয়াজ শুনে আর কখনো চোখ দেখে বোঝা যায়। নাহলে ওর মনোভাব বোঝা মুশকিল।

জগ্গী ডাক্তারের সঙ্গে সমস্ত বন্ধুরা আসবাবপত্র ঠিকমত গুছিয়ে তুলছিলো। তারপর ত্রিপাল দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেলে কাপুর সাহেব এক এক করে সবাইকে জড়িয়ে ধরে একটা কথাই বারবার বলেন, অজান্তে যদি কোন অন্যায় করে থাকি নিজগুণে ক্ষমা করো।

ট্রাকের সামনের সীটে স্ত্রীর পাশে বসার পর জগ্গী ডাক্তার ওঁর কাছে এসে বলেন, মনে করো কখনো যদি এদিকে আসো,তাহলে অবশ্যই দেখা করে যেও।

গোয়েল মাস্টার বলেন, একথা আবার বলতে হবে? আমাদের বন্ধুত্ব যদি খাঁটি হয় তাহলে দেখা না করে কেমন করে থাকবে?

গোয়েলের কথা শুনে কাপুর সাহেব চার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসেন। তারপর দু'হাতে ধরা ছাতাটা কপালে ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেন। কিছুই বলে উঠতে পারেন না। ...... তারপর লরীটা চলতে শুরু করলে স্ত্রীকে লুকিয়ে চোখের জল মুছে নেন।

কাপুর সাহেব এখানকার পুরনো বাসিন্দা নন। দেশবিভাগের সময় লাহোরে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। কিছুদিন পর ফিরোজপুরে চাকরিতে ঢোকেন। সারাজীবন নানা রেল স্টেশনের কোয়ার্টারে কাটিয়ে অবসর নেওয়াব তিন চার বছর আগে এখানে, এই গঙ্গসর জেইতো স্টেশানে বদলি হয়ে আসেন। কোথাও কোন শহরেই বাড়ি বানানো বা কেনার কথা কোনদিনই ভাবেননি। অবসর নেওয়ার পরও এখানেই ভাড়া থাকতেন। দুই মেয়ে এখানকার কলেজে পড়তো। এখানে থেকেই বড় দু'জনের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদেরকে ভাল শিক্ষা দিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে চণ্ডীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। ছোট ছেলে হায়দ্রাবাদে ইঞ্জিনীয়াব। দু'জনেই বেশ মিষ্টি স্বভাবের। ওদের সাহায্যেই মাত্র দু'বছরের মধ্যে ছোট দুই মেয়েকেও ভাল ঘরে পাত্রস্থ করেছেন। তারপরও কাপুর সাহেব আর ওর স্ত্রী এখানেই থেকে গেছিলেন।

রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর স্থানীয় এক লোহার ফ্যাক্টরীতে কাজ নিয়েছেন। ওঁর মতে, না হলে তো ঘরে বসে থেকে জং ধরে যাবে। তাছাড়া কাজ করলে বাড়তি কিছু টাকাও হাতে আসবে। কাজ পেলে কারো চুপ বসে থাকা উচিত না।

এজন্যে এখনো তিনি নিজস্ব এক রুটীন বানিয়ে রেখেছেন। সকালে সবার আগে থলে নিয়ে সব্জি বাজারে পৌঁছে যান। সেখানে বলবন্তে, খজানে, মেবে আর ভাইজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে তারপর সব্জি কিনে ফেরেন। তিনি যখন স্টেশানে ছিলেন এরা কেউ সব্জির বস্তা ছাড়াতে, কেউবা ফলের পেটি ছাড়াতে আসতো। ফেরার সময় ওরা জবরদস্তি কিছু সব্জি কিম্বা ফল বাড়িতেও পৌঁছে দিত। এখন কাপুর সাহেবের চাকবি নেই তাই ওরা নতুন অধিকারীর বাড়িতে সব্জি ও ফল পৌঁছায়। কাপুব সাহেব এতে কিছু মনে কবেন না।

ফ্যাক্টরীতে দশটা-পাঁচটা ম্যানেজারী সেরে বিকেলবেলায় জগ্গী ডাক্তারের ক্লিনিকের সামনে রাখা খালি বেঞ্চে এসে বসতেন। পনের বিশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত বন্ধুরা এসে জড়ো হতেন। সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকে কোন রুগী আসতো না। যে ডাক্তারের কাছে তিনি ত্রিশ বছরের আগে কম্পাউণ্ডার ছিলেন তাঁরই রুগীদের কেউ কেউ এবং তাদের ছেলেপিলেরা আসে। এছাড়া পাশ কবা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী ইনজেকশান নিতে কিম্বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধাতে আসে। সকালের দিকে ভালো ভীড় হয়, কিন্তু দুপুরেব পর থেকে খুব কম লোক আসে। বিকেল থেকে কেউ আসে না। সেজন্যেই পুরনো বন্ধুরা সময় কাটাতে আসে। কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর থেকে কেবল এই চার

বন্ধুই থেকে যায়, গোয়লে মাস্টার, জৈন কানুনগো, মহাবীর ত্যাগী মাস্টার আর কাপুর সাহেব। নিজে ওদের পুরনো টিনের চেয়ারে বসে থাকেন। তারপর হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে কয়েকটা ঘন্টা যে কীভাবে কেটে যায়!

এদের বন্ধুত্বের মূল কারণ দুটো। প্রথমটা রিটায়ারমেন্ট আর দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা। ওরা বসে 'ফিকর তৌসবী'র পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে থাকেন আর উর্দুর নতুন কোন কাতবোর ভুলত্রুটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। পুরো বাজারে এখন ওদের মতো হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞ 'উর্দুদাঁ' রয়েছেন। এ কী কম কথা।

কিন্তু কখনো কখনো জৈন কানুনগো মৃত্যু প্রসঙ্গে কোন কথা শুরু করলে সব্বাই কেমন ঝিমিয়ে পড়তেন। সেরকম সময়ে কেবল কাপুর সাহেবই ওকে ব্রেক লাগাতে পারতো, ছাড়ো তো বন্ধু, এসব কথা আমার একদমই ভাল লাগে না। সে তো একদিন মরতেই হবে, কারো বাবার ক্ষমতা নেই তা আটকায়, তাহলে এনিয়ে মাথা ঘামিয়ে, মন খারাপ করে কী লাভ? এখন অন্য বিষয় নিয়ে গল্প করো,কে কোথায় ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছো বলো।

আজ একমাসও হয়নি কাপুর সাহেব চণ্ডীগড় গেছেন, ওর অভাব আড্ডায় প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয়। ত্যাগী মাস্টার প্রায়ই বলেন, আরে কাপুর সাহেব যেন আড্ডার প্রাণটাই সঙ্গে নিয়ে গেছেন। জৈন কানুনগো বলেন, ঠিক বলেছ ভাই। অন্যরাও মাথা নাড়ে। তারপর কাপুর সাহেবই সেই সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন।

একদিন তো ওরা সবাই এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে যে চণ্ডিগড় গিয়ে কাপুর সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবে। কিন্তু কেউই সেই চিন্তা বাস্তবে রূপ দিয়ে উঠতে পারে না। কোন কাজ ছাড়া এতদূর যাওয়া অযৌক্তিক মনে হয়।

জন্নী ডাক্তার বলেন, অবাক কাণ্ড, মনে করো আমাদের মধ্যে কেউ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পি, জি, আই, চণ্ডীগড়ে ভর্তি হলাম, তখন তো সময় পাবে! অসুস্থ হওয়া কি কোন বিশেষ কাজ? তবু তখন সব কাজ ছেড়ে যাবো। আর এক বন্ধুকে দেখতে যেতে পারি না? আমরা যখন থাকবো না তখন আমাদের কাজ কে করবে?

সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু মাসের পর মাস পেরিয়ে যায় কারোই যাওযা হয়ে ওঠে না। বন্ধুর স্মৃতিচারণ করা, ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পরিকল্পনা বেশ আনন্দদায়ক। কিন্তু সব কাজ ছেড়ে এতদূর দেখা করতে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আজকাল কেউ কি এরকম যায়?

হঠাৎ একদিন গোয়েল মাস্টারের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাজে চণ্ডিগড় যেতে হলে তিনি বাড়ি খুঁজে কাপুর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসেন। সেদিন ওদের আড্ডায় যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়। সবাই গোয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে শোনে, কেমন করে কাপুর সাহেব ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, কাপুর গিন্নি কত খুশী হন এসব বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন— কাপুর সাহেব ওখানে গিয়ে ভাল নেই!

সবাই একসঙ্গে বলে, কেন?

জন্নী ডাক্তার মনে মনে ভাবেন, যাক্, কাপুর সাহেব তাহলে হয়তো আবার এখানে ফিরবেন, আবার আমাদের মহফিল জমে উঠবে।

গোয়েল বলেন— কেন আবার? একটু থেমে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, ছেলে বউ দু'জনেই অধ্যাপক, ওদের দুটো বাচ্চাই স্কুলে যায়। কাপুর সাহেবরা বুড়োবুড়ি সারাটা দিন একা। কাপুর সাহেব কখনো বাইরে বেরোন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন, কোথায় যাব? এখানে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি, রিটায়ার্ড লোকেরা এখানে ঘরেই ঢুকে থাকে অথবা পার্কে ঘুরতে যায়। আমার পার্কে যাওয়ার অভ্যাস নেই। সারাজীবন তো ট্রেনের হুইশল শুনে, রাত জেগে কাটিয়েছি, পার্কের

শখ কোত্থেকে গজাবে?

আমি বলি, আর কোথাও যেতে ইচ্ছে না করলে, মন্দির-গুরুদুয়ারা তো ঘুরে আসতে পারো।

তিনি বলেন, ভপ্লের মা তো মন্দির টন্দিরে যায়, কিন্তু আমি যাই না, ঈশ্বর যেখানে পণ্য সেখানে যেতে মন চায় না। অবশ্য দেশের সরকারও ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ধর্মকেই পণ্য করেছে। শাসকদলই হোক কিম্বা বেশীরভাগ বিরোধী দল ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে বারবার ব্যবহার করছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষও অন্ধের মতন বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

জগ্গী ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কাপুর সাহেব এসব বলছিল? এরকম দার্শনিকের মতন কথাবার্তা তো ওকে কখনো বলতে শুনিনি।

কাপুর সাহেব বলেন, আগে কোনদিন বইটই পড়ার সুযোগ হয়নি। এখানে ছেলের আর বউমার বইপত্র নিয়মিত পড়ি। সবকথা বুঝতে পারি না, তবে যতটুকু বুঝি সন্দেহ হয় এই সভ্যতা সঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা? মানুষ মানুষকে মারে, রাক্ষসের মতন চিবিয়ে খায়। কেন যে কেবল লড়তে থাকে।....... কারো ঈশ্বর, কারো আল্লা, কারো বা রব্ নিয়ে লড়াই— হা ঈশ্বর.... আমি ধর্মীয় পুরুষদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে যাই।

গোয়েলের কাছে কাপুর সাহেবের গল্প শুনে সবাই থ। গোয়েল বলেন, আমি ওকে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলা করতে আর গল্প শুনতে বলি, ওদের প্রতি মোহ থাকলে এত খারাপ লাগবে না। কাপুর সাহেব বলেন, "মোহ কী রাখবো ভাই, ওদের কাছে সময় নেই। স্কুল থেকে ফিরেই হোম-ওয়ার্ক, তারপর কমিকস আর তারপর টি ভি। আমাদের 'এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল সাত কন্যা' ধরনের গল্প ওরা বুঝতেই পারে না। ওদের ভাষাই অন্যরকম, না পাঞ্জাবী না হিন্দী, না ইংরেজী, এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলে ওরা, আমরা তো অর্ধেকই বুঝতে পারি না।" বাস, ওর এতটুকু কথা শুনেই বুঝলাম যে কাপুর সাহেব সুখে নেই।

সময় তো আর থেমে থাকে না। সময় চলতে থাকে, সপ্তাহ....... মাস... বছর পেরিয়ে যায়। আর কেউ চণ্ডিগড় যায়নি, কেউ সেখানকার কোন খবরও আনেনি। আড্ডায় কাপুর সাহেব প্রসঙ্গে কথাবার্তা তেমন আর হয় না। মাঝেমধ্যে ওর কথা উঠলে সবাই সামান্য চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কি জানি কেমন আছেন তিনি। কী করছেন? কী ভাবছেন?

একদিন জৈন কানুনগো বলেন, কী জানি তিনি বেঁচে— ? বলতে বলতে থেমে যান। এ কথায় সবাই চুপ মেরে যান। একটু পরে জগ্গী ডাক্তার অস্ফুট স্বরে বলেন, মনে করো যদি বেঁচেও থাকেন, না জানি কেমন বাঁচা? আর মনে করো যদি স্বর্গবাস হয়ে থাকে তাহলেই বা আমরা কী করতে পারবো?

গোয়েল মাস্টারের রাগ হয়। তিনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন, মনে করো তুমি যদি এখানে চেয়ারে বসে বসেই পটল তোলো তাহলেই কি আমরা তোমার ঠ্যাঙ ভাঙ্গতে পাববো, না লেজের নাগাল পাবো? বলো?

সবাই হেসে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওদের চেহারা পাল্টে যায়। ওরা উদাস হয়ে পড়ে।

আর সেদিনের পর সমস্ত বন্ধুরা একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে জগ্গী ডাক্তার কথায় কথায় 'মনে করো' বলা ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কখনো মুখ ফসকে বেরিয়েও পড়ে তাহলে তিনি বলতে বলতে থেমে যান।

রচনাকাল : ১৯৮৩

প্রেম প্রকাশ

বাবা

গ্রামের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর ও সাজানো গোছানো বাড়িটাকে সবাই কমরেড দেবীর বাড়ি বলে জানে। কমরেড বলদেব সিংহ দেবী আমার বাবা। ছাব্বিশ বছর হলো তিনি গত হয়েছেন।

আমাদের সিমেন্ট বাঁধানো উঠানে অমলতাসের ঝিরিঝিরি ছায়ায় শুয়ে শুয়ে দেখি থোকা থোকা ফুলেরা কেমন পাতাগুলিকেও ঢেকে রেখেছে। এই গাছে বৈশাখেই ফুল ফোটে। এ সময় মাঠে গম পাকে আর আমার শুধু বাবার কথা মনে পড়ে। এরকম সময়েই তিনি আমাদের উপর রাগ করে ওঁর বন্ধু দীনানাথ কাকুর বাড়ি চলে যান আর আমৃত্যু ফেরেননি। ওর মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী না আমার পত্নী? হয়তো দু'জনেরই দোষ। বাবাও কী ধোয়া তুলসী পাতা? আসলে দুঃসময় বা প্রকৃতিই তিনজনকে এরকম এক অনাকাঙ্খিত পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

শুরুতে আমার মনে এক দুঃখ জাগে, জাটের* ছেলে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বড় হয়েছি, যখন সুদিনের মুখ দেখলাম, সুখ আমার ভাগ্যে সইলো না। যেদিন আমার স্ত্রী সত্যি ঘটনাটা জানায় সেই থেকে এই দুঃখটা আমার মনে কেন্নোর মতন গুটিয়ে বসে পড়ে। বউ ছেলেমেয়ের ভালবাসা, নাতি-নাতনীর আদর কিম্বা নানা ব্যাঙ্কের পাসবই এত বছরেও সেই কেন্নোকে টেনে বার করতে পারেনি।

বউমা দুবার চায়ের জন্যে বলে গেছে। নাতিটা দু-একবার টুকি-ঝা করে গেছে। অন্য কোন অসুবিধা নেই। তবু এরকম দিনে আমার মন খারাপ থাকে। ভেতরে কিছু গলে পড়তে থাকে, পচতে থাকে। বাবার মৃত্যুর কথা ভাবলেই একটা গ্লানি চেপে ধরে। তাকে অন্যের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। শুধু গ্রাম কেন, পুরো এলাকায় তাঁর বদনাম হয়ে গেছিল। বদনাম অবশ্য পুরো পরিবারেরই হয়েছিল। ছিঃ ছিঃ ছেলের বউয়ের দিকে শ্বশুর হাত বাড়িয়েছিল— ছিঃ!

তবুও গীতাপাঠ করিয়েছিলাম। আত্মার শান্তির জন্যে নয়। তিনি তো আত্মা-পরমাত্মা বিশ্বাসই করতেন না। ব্যস, লোকলজ্জা থেকে বাঁচার জন্যে পুরোহিত ডাকতে হয়েছিল।

এই অমলতাস বাবার লাগানো। তখন সবাই বাবার পেছনে লাগে। বাবা যখন ক্ষেতে তৈরী কুয়োর আশেপাশে ইউক্যালিপটাস, পোপলর আর ঢাকের গাছ লাগান তখনও লোকেরা টিটকিরি মারতো। টিউবওয়েলের ঘরটাকে ফুল গাছ দিয়ে ঘিরে ফেলায় সবাই বলতো লোকটার মাথা

খারাপ হয়ে গেছে। কুয়োর পথে দাঁড়িয়ে ফসলের চারপাশে সারিবদ্ধ ফুলের সমারোহ দেখিয়ে বাবা বলতেন পেটভরে খাওয়ার মতন সামর্থ থাকলে মানুষের উচিত জৈবিক চাহিদার উর্ধ্বে উঠে সৌন্দর্য্যের পুজো করা। তখন ওর কথা বুঝতে পারতাম না। প্রায় প্রত্যেক পূর্ণিমারাতে টিউবওয়েল ঘরের ছাদে বসে তিনি বিলিতি মদ খেতেন। আমি খাবার নিয়ে যেতাম। অনেক সময় এত বেশী ভাববিভোর থাকতেন যে ডাকলেও সাড়া পেতাম না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে বাবাকে গা ছুঁয়ে বলে আসতে হতো।

আমি এখনো এত বুড়ো হইনি। তবু কোন কাজ করি না। আজকাল সব কাজই বিহার থেকে মজদুরি করতে আসা ভইয়ারা করে। আমার ছেলে জয়পাল দেখাশোনা করে। আমি শুধু ঘুরে বেড়াই, কুয়ো, কৃষিদপ্তর, ব্যাঙ্ক আর বাজার। বাড়ির প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। অনেক অনেক বছর ধরেই এই বাড়িকে বাড়ি বলেই মনে হয় না।

ঠাকুমা বেঁচে থাকতে এই বাড়িতে একটা প্রাণ ছিল। মা ও বাবা কমরেড বলদেব সিংহ দেবী বেঁচে ছিলেন। হজুরা জেঠু এক-হালের চাষ করতেন। চারপাশে বড় বড় মাটির ঘর। মাঝখানে বিশাল উঠানে ফসলের ডাই হয়ে যেত। বর্ষায় উঠোনে বড় বড় গর্ত হয়ে যেত আর চারপাশ কাদায় কাদাময়। তিনটি মোষের বসার জায়গা থাকতো না। প্রায়ই কেবল ডাল দিয়ে রুটি খেতে হতো। সকালে লস্সী খেতে চাইলে সেই নম্বরদারের* বাড়ি থেকে গিয়ে আনতে হতো।

তখন আমি পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ঠাকুমা ঘরের চাকীতেই গম পিষতেন। মা গমক্ষেত থেকে সবুজ চারা নিয়ে আসতেন। সারাদিন জেঠু লৌহ মানবের মতন কাজ করতেন। শুধু বাবা কোন কাজ করতেন না। তিনি এই গ্রামের প্রথম মেট্রিক পাশ। তিনি বইপুঁথি আর পত্রপত্রিকা পড়ে কমরেড হয়ে গেছেন। তাড়াতাড়িই চশমা পরে নিয়েছেন। গ্রামের লোকেদের খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'-এর স্লোগান সহকারে পঞ্চায়েত, সরপঞ্চ, তহসীলদার আর পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতেন, এই করতে গিয়ে কখনো পুলিশের মার খেয়ে বাড়ি ফিরতেন, কখনো জেলে চলে যেতেন আবার ফিরে এসে ঝোলা কাঁধে মিটিঙ করতে যেতেন।

মা কাঁদতেন। ঘরে তিনি যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন, মাকে স্বপ্ন দেখাতেন, আমার মনে হতো অতি সত্বর গরীবদের সমস্ত দুঃখ দুর হয়ে যাবে। সবাই ভরপেট খেতে পাবে, চাষ করার জমি পাবে আর থাকার জন্য ঘর বানাতে পারবে। তখন নারীপুরুষ একসঙ্গে মিলে এত নাচগান করবে যেমন বাবাদের ড্রামা স্কোয়াডের কমরেডরা আমাদের বাড়িতে এসে নেচে গেয়ে মহড়া দেয়। ওদের দেখে ঠাকুমা আর জেঠু খুব রেগে যেতেন। বলতেন, সমস্ত আলসেরা একজোট হয়েছে, অন্য সবাই যদি এদের মতন হযে পড়ে তাহলে সমাজের ভালই কল্যাণ হবে........ কারো পেটে দানা জুটবে না। বাবা বলতেন, আমরা আগে ধনবানদের শোষণ ও অত্যাচাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই ব্যবস্থাকে পাল্টাবো। দেশে সমাজতন্ত্র এলে কঠিন পরিশ্রম করবো। নিজেদের পরিশ্রমের ফসল নিজেরাই ভোগ করবো।

যখন ওরা ঝোলা কাঁধে আসতেন বাড়ির সবাই বিরক্ত হতো, তটস্থ থাকতো...... একান্তে বিড়বিড় করতো। কিন্তু ওরা সবাই এত সুন্দর কথা বলতো ও এত মিষ্টি বিনয়ী ব্যবহার করতো যে কেউ কড়া সুরে কিছু বলার সুযোগই পেত না। বাবা ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতেন, নাচতেন। বাবা গাইতে গাইতে চোখ বন্ধ করে তন্ময় হয়ে পড়তেন। ওর দরদী আওয়াজ আমার দারুণ লাগতো, বিশেষ করে যখন গাইতেন, রুহ কো খা জাযেগা/ হুসন কা বীরানাপন...... স্মাকে গিলে নেবে সৌন্দর্যের একাকীত্ব.......... ইত্যাদি।

আমি মেট্রিক পাশ করার পর বাবা প্রথম সংসারে মন দেন। সে বছরই ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছে জেঠু এক অজানা রোগে শয্যাশায়ী। বাধ্য হয়ে বাবাকে চাষবাসের কাজে মন লাগাতে হয়।

তখন পাঞ্জাবে মুরব্বেবন্দী* প্রথায় চাষবাসের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির পাশেই ফজলু তেলীর পাকাবাড়িতে পাটোয়ারি, কানুনগো, আর তহসীলদারের দপ্তর খুলে যায়।

বাবা আমাদের এগারো বিঘে সুফলা জমির সঙ্গে উনিশ বিঘে বালুময় উঁচু জমি এক করে মুরব্বেবন্দী করতে চান। তাতে বারো আনা মূল্যের বদলে আমরা মোট পাঁচআনা মূল্য পাবো। কিন্তু এত ফসল হবে যে আমাদের সাম্বৎসরিক প্রয়োজন মিটিয়েও আরো থাকবে। তিনি পাটোয়ারিকে আলাদা করে ডেকে কিছু দিতে চেয়েছিলেন। সাধারণ জাটের মতনই যেন তেন প্রকারেন নিজের কাজ হাসিল করাতে চান। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

পরে একটা ঘটনার চাপে ঐ কাজটাই এত সহজে হয়ে যায় যেন ভোজবাজি। নকৌড়েওয়ালার বউকে সবাই 'ছল্লো'* বলতো। বেটেখাটো মানুষটির ফর্সা রঙ, আটোসাটো বাঁধন আর পুরুষকে ঘায়েল করার মতন সম্মোহনী দৃষ্টি থেকে গ্রামের কেউ রক্ষা পায়নি। তিন প্রজন্মের পুরুষদের ও পাগল করেছে। আমার মতন দু-একজন অভাগাই শুধু বাকী রয়ে গেছে।

জানি না ঘটনাটা কাকতালীয় না বাবাই ঘটিয়েছে। সেদিন দুপুরে গ্রামের লোকেরা স্কুলের বারান্দায় পাটোয়ারিকে ঘিরে দরবার করছে। পাটোয়ারির ঘরে তহসীলদার আরাম করতে গেছে। বাবা কী ভেবে ঐ ঘরের জানালায় লাঠি দিয়ে একটা ঠোকর মারতেই জানালাটা হা করে খুলে যায়। ছল্লো কোনমতে কাপড় সামলে ওঘর থেকে দৌড়ে পালায় কিন্তু তহসীলদার ঐ অবস্থাতেই বাবার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিনতি করে বলে, তোর যা যা দরকার বল, সব হয়ে যাবে, ব্যস, কাউকে কিছু বলিস না......!

বাবা হেসে বলেন, ঠিক আছে, তাই হবে, এখন আয়েস করুন। তিনি নিজেই টেনে জানালাটা বন্ধ করতে করতে বলেন, যা করার ছিটকিনি লাগিয়ে করুন! তারপর থেকে বাবা যা চায় তা খুব সহজে হয়ে যায়। সাড়ে দশ একর উঁচু জমির পাশাপাশি সুফলা নিচু জমির একটা অতিরিক্ত টুকরাও কেমন করে আমাদের ভাগে জুড়ে যায় তা গ্রামের লোক বুঝতে পারে না। ঐ জমি এত সুফলা যে ওতেই আমরা বীজতলা বানাতাম। বাবা তবু গ্রামের লোকের সামনে তহসীলদারকে গালিগালাজ করে, মিথ্যে ঝামেলা করে ওর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দেওয়ার নাম করে শহরে গিয়ে তহসীলদারের বাড়িতে উপহার দিয়ে আসে।

গ্রামের কেউ কেউ কয়েকদিন পর ওর চালাকি বুঝতে পারে যখন আমাদের উঁচু জমিতেই গ্রামের প্রথম টিউবওয়েল পোতা হয়। নানারকম যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সরকার থেকে যত রকমের ঋণ পাওয়া যায় সবই বাবার নামে মঞ্জুর হয়। তারপর যতরকম ঋণ মুকুবের সুবিধা রয়েছে তাও বাবা পেয়ে যান। না জানি কেন বিডিও সাহেবও ওকে ভয় পান। সেজন্যে উন্নতমানের বীজ আর সারও সবার আগে বাবাই পান।

যখন আমি বি. এ. ফেল করে কলেজ ছেড়ে দিয়েছি তখন বাবার কাছে এত টাকা যে দীনানাথ কাকার গুদামেরও চারআনার অংশীদার হয়ে পড়েছেন। গ্রামে যাওয়ার পথেই কিছু জিনিস নিজের দোকানে নামিয়ে নিতেন। দীনানাথ কাকা সহজ সরল ব্যবসা করতেন। কাউকে ঠকাতেন না। চাষীরা ফসলের মূল্য পেয়ে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরতো। পাশাপাশি প্রয়োজনে ধারও পেত। বাবাই প্রথম দীনানাথ কাকাকে লোক ঠকানোর পদ্ধতি শেখান আর প্রয়োজনে সরকারী দপ্তরেও ওর সঙ্গ দেন।

কলেজ ছেড়ে ঘরে ফিরতেই বাবা ট্র্যাক্টর কিনে আমাকে ওর চালকের সীটে বসিয়ে বলেন, নে, বছরখানেকের মধ্যেই দেখিস আমরা লোকের ক্ষেতে হাল দিয়ে এর দাম উঠিয়ে নেব। রাতে ঐ ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি লোকের ক্ষেতে হাল চালাতাম আর দিনের বেলায় সাধারণত বাবা নিজেই

চালাতেন। কমরেড বলদেব সিংহ দেবী তখন পুরোদস্তুর জমিদার। পার্টির ঝোলা কাঁধে তাকে আর দেখা যায় না। কারো কোন কাজ করে দিলে তা থেকে নিজের লাভ উঠাতে তিনি ওস্তাদ। তবুও লোকে ওর প্রশংসাই করে। ওঁর পা কখনো এক জায়গায় টেকে না। কিন্তু যা ছোঁন তাই থেকে পয়সা কামান।

পরের বছর আমার বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু হলে বাবা আমাদের পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে নতুন পাকাবাড়ি বানিয়ে ফেলেন। অনেক অনেক দূর থেকে আত্মীয়রা আসতে শুরু করে। তারপর একদিন আমার বিয়ে হয়ে যায়।

হজুরা জেঠু এখন গমক্ষেতের মাঝে ঐ টিউবওয়েল ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে দিনরাত শুয়ে থাকেন। ওর হাঁপানি হয়ে যাওয়ায় হাঁটা-চলা কিম্বা কোনরকম কাজ করা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। গন্ডাসা মাথার দিকে রেখে শুধু কাশতেন। একদিন ভোরে চা নিয়ে গিয়ে দেখি উনি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন। একটু পরেই বুঝি যে ওর সমস্ত দুঃখের অবসান হয়েছে। মনে হচ্ছে এত বড় চারপাইয়ের মাঝে জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে কিছু হাড্ডির পোটলা। কী ছিল ঐ জমিদারের জীবন! ভাল মতন দুটো খেল না, পরলো না,.... ... বিয়ে শাদীও করলো না!..... না জানি কেন গ্রামবাসীরা ওকে 'বেইলী' বলে ডাকতো! এর মানে হলো 'ভোগী'। এখন মনে হয় লোকে ওর দারিদ্র্যের মজা ওড়াতে ঐ নামে ডাকতো। কানাছেলের নাম পদ্মলোচন। এখন বাড়িতে সব সুখ রয়েছে কিন্তু তিনি সব ছেড়ে চলে গেলেন।

ক্ষুধার্তের সামনে রুটি দিলে যেরকম হয়, বিয়ের পর আমার অবস্থাও তাই। ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না। কোন কাজে পাঠাতে হলে মা হাসিমুখে কাকুতিমিনতি করে পাঠাতেন।

মাসখানেক পর বাবার না জানি কী হলো? সবসময় আমার বউ সীতোর উপর রেগে থাকেন। রি রি করেন। ওর প্রত্যেক কাজে খুঁত বের করেন। ভালমতন শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা না করার আরোপ লাগান। কখনো কখনো এত বাজে ভাবে বলেন যেন কোন ছোটজাতির কাজের মেয়েকে বলছেন। আমার খারাপ লাগে। কিন্তু কিছুই বলতে পারি না। যখন সীতোকে কাঁদতে দেখি, রেগেমেগে বাবার কামরায় গিয়ে ঢুকি। তিনি চশমার কাচের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকান, তখন আর কিছু বলতে পারি না। ঘুরে চলে আসি।

বছর খানেক পর সীতো কন্যা প্রসব করলে বাবার দৃষ্টি আরো বিষিয়ে ওঠে। এখন ওর ওঠাবসা, জামাকাপড় পরা কিম্বা চলাফেরার ত্রুটি দেখতে পান। মা ধমকে বলেন, তুমি খালি এসবই দেখতে থাকো আর গবেষণা করো...... আর কী কাজ রয়েছে তোমার?

একথা শুনে তখন চুপ হয়ে যেতেন, কিন্তু পরের দিনই আবার বকাঝকা শুরু।...... রাতের আঁধারে সীতো আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদে, ওর চোখের জল আমার কাঁধ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, আমার ভেতরে ঝড় উঠতে থাকে। মনে হয় তক্ষুণি উঠে গিয়ে এতজোরে ঘুষি মারি যে বাবা মেঝেতে লুটিয়ে পড়বেন। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি না। আমার মনে করুণা জাগে হয়তো মায়ের অসুস্থতার কারণে বাবা এত খিটমিটে হয়ে পড়েছেন। এমনিতে বাবা সবসময় মায়ের সেবা করেন। মায়ের পেটে বড়সড় আলসার ধরা পড়েছে। সেজন্যেই হয়তো বাবার কপালে এত তাড়াতাড়ি বুড়োদের মতন বলিরেখা, থুতনির দাড়িগুলো সব সাদা। আমি সীতোকেও এইসব বুঝিয়ে শান্ত করি। তবু ও কাঁদতে থাকে। আমি ওকে আদর করে..... ঘুম পাড়িয়ে দিই। ভাবি, স্বামীর ভালবাসা পেলে মেয়েরা কত দুঃখ ভুলে যেতে পারে।

সীতো ভোরে উঠেই উনোনে আঁচ দেয়। চা বানায়। আমি চা নিয়ে মা আর বাবাকে দিয়ে আসি। বাবা যাতে সকাল সকাল ঝামেলা না করেন, যাতে খুশী হয়ে খেয়ে নেন। সে জন্যে মিথ্যে বলি, আমি বানিয়েছি।

বাবার কাছে সেই চা সত্যি ভাল লাগে। কিন্তু সত্যিকথা বললে একই চা এক চুমুক খেয়ে মুখ বিষ্ঠা করে বলেন, এটা একটা চা হলো!

তারপর কাপ নামিয়ে রেখে আর তো ছোনই না, তার উপর গজরগজর করতে থাকেন। কোন কাজে বাবা শহরে গেলে সীতো মায়ের দেখাশোনা করে। কথায় কথায় ও কেঁদে ফেললে মা ওকে সান্ত্বনা দেন, সোনাবউ আমার, ওর কথায় কিছু মনে করো না, আজকাল কিরকম খিটমিটে হয়ে পড়েছে যেন, আগে তো এরকম ছিল না!

কিন্তু বাবা বকাঝকা করলে বেশীরভাগ সময়েই তিনি কেন চুপ থাকেন? উল্টো পাশে বসা কোন প্রতিবেশিনীকে বলতে শুনেছি, না জানি ছেলেটাকে কী গুলে খাইয়ে রেখেছে! না জানি ছেলেটার কী হয়েছে, কে জানে ! ও কিছু বোঝে না কেন?

এসব শুনে ভাবি, মায়ের কথা কিছুটা হলেও সত্যি। বিয়ের পর দেড় বছর পেরিয়ে গেছে তবু সীতো চোখ তুলে তাকালেই আমি অবশ, অজান্তেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে থাকে। কচিৎ এহেন অবস্থায় বাবা আমাদেরকে দেখে ফেললে জ্বলেপুড়ে কাবাব হয়ে পড়েন।

মা বেশীদিন সেবা করাননি। অপারেশানের তিনদিন পর হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাবা ভীষণ শোকগ্রস্ত, কাঙাল হয়ে পড়েন। খাওয়া, কথা বলা কমিয়ে দিয়েছেন। সারাদিন বারান্দায় চারপাই পেতে শুয়ে থাকেন। শহরে দীনানাথ কাকার ওখানে চলে যান। দিনের পর দিন ওঁর বারান্দায় চারপাই পেতে শুয়ে থাকেন। আমি ডাকতে গেলে বলেন, এখানেই ভাল আছি।

কাকার কাছে শুনি না জানি কোন্ কোন্ ওষুধের নেশা করেছেন, সেগুলি খান আর ঘুমিয়ে থাকেন। বাড়ি ফিরতে চান না।

জয়পালের জন্মের পর বাবা আবার বাড়িতে এসে থাকা শুরু করেন। এখন সীতোর তৈরী খাবারও খান। নাতি হওয়ায় সারা গ্রামের লোককে মিষ্টি খাওয়ান। নামকরণ অনুষ্ঠানে আসা নিজের শালীকে অনেক দামী জিনিস উপহার দেন। অন্যদেরকেও দেন। এমনকি নিজের স্বভাবের বাইরে গ্রামের পণ্ডিতদেরও ভাল দক্ষিণা দেন। মন্দির এবং গুরুদুয়ারাতেও ভাল টাকা ভেট করেন।

কিন্তু কিছুদিন পরই আবার শহরে চলে যান। মাঝেমধ্যে গ্রামে এলে সন্ধ্যার আগেই শহরে ফিরে যান। উড়ো খবর পাই, তিনি নিয়মিত মদ খান আর এক বিধবার সঙ্গে থাকেন। সীতোকে এসব জানাই না। আমরা ঘরে সুখী, এখন সংসারে সীতোই সর্বেসর্বা।

একদিন দীনানাথ কাকা স্কুটারে বসিয়ে বাবাকে বাড়ি ছেড়ে যান। ওর মুখ ও কপালের নানা জায়গায় ফুলে নীল। কাকা বলেন, দুর্ঘটনা। জোর বেঁচে গেছেন, তোরা সেবাযত্ন করিস বাবা।

আমি ও সীতো ওর এত সেবাযত্ন করি যে দিন পনেরর মধ্যেই ঘোড়ার মতন টগবগে হয়ে ওঠেন। আমি খোঁজ নিয়ে জেনিছি ওর কোনই অ্যাকিডেন্ট হয়নি। যে মহিলার কাছে যেতেন তার বাড়িতেই মার খেয়েছেন। কিন্তু তা শুনে আমি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি। সীতোর হাতের রান্না, ফলের রস আর আমার আনা দামী মদ খেয়ে ওর গালগুলি রক্তিম হয়ে ওঠে। বেশ বীরদর্পে চলাফেরা শুরু করেন। শহরে আর যান না। পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আড্ডা মারেন। গরু বাছুরদের জলটল খাওয়ান। রান্নাঘরে ঢুকে কখনো নিজের হাতে বানিয়ে চা খান। ওখানে বসেই সীতোর হাতে তৈরী গরম গরম খাবার খেয়ে নেন।

একদিন সীতো আমাকে বলে, বাবা আমার দিকে কিরকমভাবে যেন তাকিয়ে থাকে...... ভাল লাগে না।

আমি বলি, চোখে কম দেখে তো, এজন্যেই এরকম করে তাকায় হয়তো। এরপর একদিন সীতো বলে ও নাকি স্নান করার সময় বাবাকে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাতে দেখেছে। আমি এর কী জবাব দেব? চুপচাপ উঠে ট্র্যাক্টর নিয়ে ক্ষেতে চলে যাই।

এরপর একদিন আমিও এক আজব দৃশ্য দেখি। বাবা বৈঠকে বসেছিলেন। পাশেই একটা চেয়ারের উপর রোদ থেকে তুলে আনা শুকনো জামাকাপড় রাখা ছিল। আমি হঠাৎ ঐ ঘরে ঢুকে দেখি বাবা ঐ জামাকাপড়ের মধ্যে রাখা সীতোর অন্তর্বাসে হাত রেখে ধীরে ধীরে আঙুল ছুঁইয়ে নাড়ছেন। আরেকদিন আমি ওকে সীতোর ছাড়া কুর্তা শুঁকতে দেখি।...... এসব দেখে আমার ভীষণ গ্লানি হয়। বাবার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?

রাতে ওকে গরম দুধ দিতে গেলে আমাকে কাছে বসিয়ে ক্ষেত খামার, ফসল ও ফলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মায়ের কথা বলেন। তোর মা এরকম করতো, ওরকম বলতো...... ইত্যাদি। শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগলে আমি অন্যকথা পাড়ি।

এক রাতে ঘরে আলো জ্বালানো ছিল। আমি আর সীতো লেপের তলায় শুয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ সীতো ফিসফিসিয়ে বলে, ঐ দেখ, বাবা দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেখছে।

আমি বলি, ধ্যাৎ! তবু ভ্রম ভাঙ্গানোর জন্যে দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই একটা ছায়াকে দৌড়ে বাবার ঘরে ঢুকে পড়তে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। তারপর চুপচাপ বিছানায় এসে শুই।

কিন্তু বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি না। রাগে আমার শরীর ষাঁড়ের মতন ফুলতে থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে। অজান্তেই কখন বাবার ঘরে ঢুকে ওর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তারপর এক টানে ওর মাথামুখ ঢাকা চাদরটা সরিয়ে ছুঁড়ে ফেলি। তিনি উঠে বসেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ওই ডাইনিকে একটু বুঝিয়ে বল... . .! ওর কথা আর শুনতে পাই না। ওকে ঢোক গিলতে দেখি। আমার মাথায় তান্ডব শুরু হয়ে যায়। আমি ওর ঘাড়ে ধরে একটা ঘুষি মারি। ওর চশমা ছিটকে পড়ে। দ্বিতীয় ঘুষিতে পাগড়ি খুলে পড়ে। তিনি হতভম্বের মতন আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর চারপাইয়ে বসে দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে মায়ের নাম উচ্চারণ করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। এ সময় ওর মুখে মায়ের নাম শুনে আমার আরো পেটাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার অসীম শক্তির সামনে ওকে ভীষণ অসহায় লাগে। কান্না সহ্য হয় না। ওর পাগড়ি আর চশমা তুলে টেবিলের উপর রাখি। তারপর নীরবে বেরিয়ে আসি।

সীতোর কাছে ফিরে চুপচাপ বিছানায় বসে থাকি। ওর দিকে তাকাতে পারি না। এ কী করলাম আমি!

আধঘন্টা পর দরজা খোলার শব্দ পেয়ে উঠে গিয়ে দেখি বাবা বাইরের জামাকাপড় ও পাগড়ি পরে শহরের পথে বেরিয়ে পড়েছেন। দেখতে দেখতে তিনি অন্ধকারে মিলিয়ে যান।

বেশ কিছুদিন তিনি আর ফেরেননি। খবর নিয়ে জানতে পারি যে তিনি যথারীতি দীনানাথ কাকার ওখানেই আছেন। অবশেষে একদিন গিয়ে হাত পা ধরে ফিরিয়ে আনি। যতই হোক বাবা তো।

কিন্তু দুদিন পরই আবার খ্যাপামো শুরু। একরাতে মদ খেয়ে এসে তিনি সীতোকে গালিগালাজ করেন। গালির বিষয় ভালমতন রাধতে না পারা, জামাকাপড় পরা ইত্যাদি। সীতো নাকি পর্দা আব্রু বজায় রেখে ওঠা-বসা জানে না। আমি কানে আঙুল দিয়ে থাকার চেষ্টা করি। নিজের রাগ নিজেই গিলে খাই।

কিন্তু কয়েক মাস পর সব কিছু অসহ্য হয়ে ওঠে। এখন তিনি আর সীতোকে একদমই সহ্য করতে পারেন না। পাড়াপ্রতিবেশিদের কাছে বকবক করেন, এই ডাইনি শাশুড়ীকে খেয়েছে, আমার ছেলেকে লুটেপুটে বাপের ঘর ভরে...... ওই বাঞ্চোৎ ক্ষেত কেনার পয়সা কোথায় পেল? ওর মামা বাঞ্চোৎ দু বছর আগে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছে, এখনো দেওয়ার নাম নেই। এই ডাইনিকে তাড়াবো..... ছেলেকে আরেকটা বিয়ে দেব।

সীতোকে তাড়ানোর জন্যে তিনি আত্মীয়স্বজন আর পঞ্চায়েতের লোকজনকে পটাতে থাকেন। আমি সীতোর মামাকে লুকিয়ে টাকা পাঠিয়ে বলি যাতে বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু আমার শ্বশুরের ঋণ ভারী হওয়ায় তার পক্ষে এই মুহূর্তে ফেরানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাবা তাই হিসাব করে খবর দেয়, ছাড়াছাড়ি করিয়ে নিলে সব মাফ করে দেব! এতে যদি আমার লাখ টাকা লোকসান হয়, হোক। ওর বাড়াবাড়িতে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা উত্যক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন বিকেলে সীতোর ছোটভাই ক্ষেতে এসে আমাকে একা পেয়ে বলে, জামাইবাবু আর তো সহ্য করা যায় না, সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, শেষে কি জাটবিদ্যার আশ্রয় নিতে হবে?

ও আমার বাবাকে পেটাতে চায় নাকি? ওর কথা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। ট্রাক্টর নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আমি ভাবতে থাকি। সীতোর ভাই বকরবকর করতে থাকে। ওর কোন কথা আমার কানে ঢোকে না। ট্রাক্টরের হেডলাইট রাতের আঁধার চিরে পথ দেখায়। তবু বেশী দূর দেখা যায় না।

বাড়ি ফিরে শেডের নিচে ট্রাক্টরের ইঞ্জিন সবে বন্ধ করেছি তখনই এক আর্ত চিৎকারে দু'জনেই লাফিয়ে নামি। সাপে কাটার মতন চিৎকারে সীতো বৈঠক থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। আমি দৌড়ে কাছে যেতেই ও ত্রাসে কাঁপতে কাঁপতে বলে, বাবা আমাকে ধরেছে..... এখানে ধরেছে.. এখানে ধরেছে...... হায় ঈশ্বর! লোকটা মরে না কেন? ওর নিজেরও তো মেয়ে ছিল ! সব দাড়ি পেকে গেছে তবু ...

আমি ওর মুখ চেপে ধরি। লোকলজ্জার ভয়ে ওকে চুপ করাই। ঘরে ঢুকে দেখি সীতোর ভাই উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে এঘর ওঘর তন্নতন্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবা কোথাও নেই। অন্ধকারে পালিয়েছে। রুটির থালি মেঝেতে, চুড়ির ভাঙ্গা টুকরো আর ডাল-সব্জি সারা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাখামাখি। বাবা নিজের গরম চাদরটাও ছেড়ে গেছেন। বাইরে প্রতিবেশিদের কোলাহল আমাকে বিব্রত করে।

সীতো খাটে বসে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। ওর হাতের জখমে রক্ত জমে উঠেছে। কামিজটা গলা থেকে ছিঁড়ে গেছে। ও আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন কুকর্মটা আমিই করেছি। ওর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে গেলে ও মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি দরজার বাইরে এসে প্রতিবেশিদের বিদায় করি, বলি, তেমন কিছু না, সীতোকে বোলতায় কেটেছে।

বাবা আর গ্রামে ফেরেননি। একবার দীনানাথ কাকার বাড়ি গিয়ে ওকে দেখে এসেছি। আমাকে দেখে ওর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। আমি ওর সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে কিছু বলি না। তিনিও কোন সাফাই গান নি। ফেরার আগে মাথা নীচু করে বলেন, ঘর সামলে রাখিস, ... অনেক পরিশ্রম করে সব বানিয়েছি,........ একদিন জয়পালকে নিয়ে আসিস।

একমাসের মধ্যেই দীনানাথ কাকার মুনিম বাবার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসে। অনেক লোক জড়ো হয়। নানারকম কথা বলে। অন্তিম সংস্কার হয়ে যায়। আমি আর কাকা বাবার অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করে আসি। এখানে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। সীতো দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলে বাড়ির পরিবেশও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আমরা বিয়ের মতন অনুষ্ঠান করে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াই। তখন বাবার কথা মনে পড়ে। ওর স্মৃতিতে গীতাপাঠ করাই।

এখন সীতোও মাঝেমধ্যে বাবাকে নিয়ে গল্প করে। ওর আওয়াজে আর আগের মতন কোনরকম ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। একদিন ও যখন বাবার গল্প করছিল আমি মজা করে বলি, তাহলে বাবা তোমাকে কোথায় ছুঁয়েছিল.... ...? ও হাসতে হাসতে আকাশকুসুম গল্প করে। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে বলি, এখানে ছুঁয়েছিল? না এখানে?

তখনও মুচকি হেসে বলে, সত্যি কথা বলবো?

বলো।

আসলে সেদিন বাবা কিছুই করেনি, ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সেদিন আমি নিজেই থালী ফেলেছি........ চুড়িগুলো দেওয়ালে মেরে ভেঙেছি আর নিজের জামা নিজেই টেনে ছিঁড়েছি...... ভাইকে আসতে দেখেই ঐ বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিল।

তাই বলে ঐরকম করতে হবে? আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে বসি।

ঐরকম না করলে লোকটা আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দিত? একথা বলে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়।

কিন্তু আমার মনে হয় সীতো নয় আমাকে এখন বাবার প্রেতাত্মা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

রচনাকাল : ১৯৯৩

* জাট : কৃষক সম্প্রদায়। * নম্বরদার : জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ ও খাজনা আদায়ের সময় সনাক্তকরণের জন্য নিযুক্ত পারম্পরিক পদ। রাজা রণজিৎ সিংহের আমল থেকে চলে আসছে। এখন অবশ্য জেলা প্রশাসক নম্বরদার মনোনীত করেন। সাধারণত নম্বরদারের বড় ছেলেই মনোনীত হয়। * মুরব্বেন্দী : ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করার সুবিধার্থে অনেকটা যৌথ খামার জাতীয় ব্যবস্থা। চাষীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিকে বিনিময়ের মাধ্যমে একত্রীকরণ। * ছল্লো - চালু মেয়েছেলে। * জমিদার : পাঞ্জাবী সম্পন্ন চাষী, * গণ্ডাসা- লম্বা হাতলঅলা কাস্তে

রামসরূপ আণখী

হাড্ডিগুলি

মঙ্গল এবং বারু প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছে। ভোর না হতেই ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জল খেয়ে বা পেচ্ছাব করে আবার চারপাই-এ গিয়ে শোয়। কিন্তু নিদ্রা দেবী আর ফিরে আসে না। গভীর রাত অব্দি ধুনীর পাশে বসে থাকে। দেরীতে শুলে সাত সকালে উঠতে হবে না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও চার পাঁচ ঘন্টার বেশী শুতে পারে না। দু'জনেই নাতিনাতনীওয়ালা। অনেক বছর আগেই সংসারের জোয়ালমুক্ত। বিছানাতেই 'বাহেগুরু বাহেগুরু' করতো। লোকজনের চলাফেরা শুরু হতেই ওরা কম্বলমুড়ি দিয়ে চৌপালে এসে বসতো। কাশতো, থুতু ফেলতো, খোশগল্প করতো। নাতিনাতনীরা ওখানেই চায়ের লোটা দিয়ে যেতো। ওদের পাশে আবো লোক এসে বসতো। ওরা দু-এক কথা শুনে উঠে যেতো। মঙ্গল এবং বারু অনেক বেলায় উঠতো।

একদিন সূর্য ওঠার আগে ওঁরা চায়ের লোটা খালি করে কেবল বসেছে তখনই ধীচরের মুকুন্দ চুপচাপ ওদের কাছে এসে বসলো। মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া। চোখ দুটি বড় বড় এবং কেমন যেন। দু'জনের কথার মাঝেই ও বলতে শুরু করলো-একটা কথা শোন, ভোর বেলায় সবে ঘুম থেকে উঠেছি। পরতাপ এর মা তখনো জাগেনি। উঠোনে জলের পাম্প এব পাশে একটা হাড্ডি, একদম তাজা গায়ে মাংস লাগা....' হাড্ডি? মানুষের হাড্ডি? মঙ্গল চমকে জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ মানুষেব। কোথায়? বারুও উত্তেজিত।

আমার কাছে আছে!

ওটা নিয়ে কী করবি? নদীতে ফেলে আসছিস না কেন? কোন কাক কিম্বা কুকুরে ফেলে গেছে হয়তো। মঙ্গল এক নিঃশ্বাসে বলে।

আমি উঠিয়েছি, আমার কাছে আছে, মুকুন্দ কম্বল মুড়ি দিয়ে হাটু মুড়ে বসে রয়েছে। হাত দুটো দু'হাটুর মাঝখানে। ওর ঝোলায় নিশ্চয়ই কিছু আছে!

তাহলে কী করবি? মরার হার নিয়ে ঘুরছিস কেন? বারু ওর ঝোলার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে কেন? এটা হয়তো আমার পরতাপের হাড্ডি; এখন ওর অদ্ভুত দর্শন চোখ দুটিতে জল ভরে আসে।

হাড্ডির কথা শুনে দু'জনেরই কষ্ট হয়। কিন্তু এবার দু'জনেই ভয় পেয়ে যায়। মঙ্গলের মনে

পড়ে, ক'দিন আগের খবরের কাগজের কথা।" অমুক মন্দিরে গরুর লেজ, শিঙ, গরুর কান..... এখন মানুষের হাড্ডি ও.........।" বারু একটু সরে মুকুন্দের কাছে এসে ওর ঝোলায় ধরতে যায়। মুকুন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে। বিড় বিড় করে কিছু বলে ছুটে দূরে চলে যায়।

এ কী হলো মঙ্গল? বুঝতে পারছি না ভাই। একটাই ছেলে ছিল। বাপ-মায়ের বয়সই বা কত হবে? পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। ছেলেটা একমাত্র সম্বল। নালায়েক ভুল পথে গেল। জীবনটা খোয়াল। ভুল অথবা ঠিক সেটা ভেবেই হয়তো পা বাড়িয়েছে নইলে প্রাণ হাতে নিয়ে কে ঘোরে? ঐদিন সুবেদার খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল শুনিসনি? অনেকের কাছেই জমি এখন অনেক কম। বিঘা দুবিঘা পড়ে আছে। এদিকে ছেলেরা বি এ, এম এ পাশ করে ঘুরে বেড়ায়। বস্তাভরা নোট নিয়ে যাও তবে চাকুরী পাবে। আগে নকশালবাদীরা ছিল। এরা এদিকে হয়েছে। কোথায় যাবে? গরম রক্ত কাজে লাগিয়ে দেখো। অনাথা এরকমই হবে। কোন দল তো ওদের সঠিক পথ দেখায়নি। ওরা অবশেষে ধর্মীয় শিবিরে ভিড়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরুতে তো সরকারও এদের নিয়ে মজা লুটেছে, আরে ভাই, শিঙ ভাঙ্গা ষাঁড় পেয়েছ মজা দেখে যাও। হয়রান হয়ে আপনাআপ বসে পড়বে। তারপর যখন সব কিছু বিগড়ে গেল তখন কে সামলাবে। ঐ দিল্লীর সরকার। ওদের ওই ফিরিঙ্গী কায়দা। কোথা থেকে কী হয়ে গেল।

ওরা আবার মুকুন্দকে আসতে দেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে হাত দুটো পেছনে করে হন্তদন্ত আসছিলো — চোখ মাটির দিকে। ওদের পাশ দিয়েই ও হেঁটে এগিয়ে যায়। একবারও ঘুরে তাকায় না। মঙ্গল পেছন থেকে আওয়াজ দিল — মুকুন্দ সিং তোর হাড্ডি? মুকুন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে বললো কুয়োতে। ওর গলার আওয়াজ কেমন ভয়ঙ্কর। কুয়োতে হাড্ডি ফেলার কথা শুনে ওরা ঘাবড়ে যায়। চতুর্থ-পঞ্চম দিন ওরা যখন চৌপালে বসেছিল সাত সকালে সূর্যোদয়ের আগেই আবার মুকুন্দকে দেখতে পায়। মাথায় খালি টুকরি। কম্বল ঢাকা। এক হাতে। টুকরি-ধরা আর অন্য হাত পেছন দিকে মোড়া। কম্বলের ফাঁক দিয়ে কনুই দেখা যাচ্ছে। এই চার পাঁচ দিনে মুকুন্দ সিং-এর নামে রঙবেরঙ-এর গুজব রটেছে। মুকুন্দের বউ এখন ছেলের মৃত্যুশোক ভুলে স্বামীর জন্য বেশী চিন্তিত।

প্রতিবেশীরা আলোচনা করছিল — মুকুন্দ ভাবছে ছেলে এখনও জীবিত। পুলিশের লোকেরা ছেলের একটি করে অংগ কাটে আর রাতের আঁধারে চুপিসারে ওর আঙিনায় ফেলে যায়। ও ঐ অঙ্গটি কুয়াতে ফেলে আসে। ধর্মপ্রাণ মানুষ ওর বিশ্বাস সালোয়ানের ছেলে পূরণের হাতগুলি কুয়ো থেকে বেরিয়ে যেমন শরীরে জুড়ে গেছিল তেমনি একদিন কুয়ো থেকে বেরিয়ে পড়বে, ওর পরতাপ সুস্থ দেহে ঘরে ফিরবে।

সেদিন ওরা ওকে ডাকলো না। ওর সাথে কোন কথা বলা এখন ওকে হাস্যাস্পদ করারই নামান্তর।

ও উল্টোপাল্টা বকে। বকতেই থাকে। গম্ভীর থাকে। ওর শোক সবার পরিবারে ছেয়ে যায়। কিন্তু সেদিন ও নিজেই ফেরার পথে সবাইকে ডেকে বলে — আজও টুকরি ভরে ফেলে এলাম কুয়োতে।

এখন ওকে কি বোঝানো যাবে? মৃত ছেলে তো আর ফিরে আসবে না। এখন তো কেবল বাহেগুরুর নামই রয়ে গেছে। বেটা মাথা খারাপ করে বসে আছে, মঙ্গল আফশোস করে!

বারু বলে — ঐদিন আমরা রেডিওতে পরতাপের খবর শুনলাম। বিলকুল একই খবর পেয়ে সবারই কি এই অবস্থাই হয়? একই খবর, কোন্ খবর? না জানি মঙ্গলের মনপাখী কোথায় উড়ে গেছে। ঐ যে স্কুটারে দু'জন, পুলিশের সন্দেহভাজন। পুলিশ চালেঞ্জ জানালে ওরা গুলি চালায়। জবাবী গুলীতে একজন মারা যায় অন্যজন পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশীরা সবাই মুকুন্দের কম্বল ঢাকা টুকরী নিয়ে প্রতিদিন সকালের কুয়োর দিকে যাওয়ার

কথা জেনে গেছে। কিন্তু দু'দিন ধরে কেউই ওকে দেখতে পায়নি। মুকুন্দের বউ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী লোক পাঠিয়েছে। কোন হদিশ নেই। ক্ষেতে খামারে খোঁজাও নিষ্ফল। তৃতীয় দিন ভোরে চৌপালে মঙ্গল আর বারুর দশ বারো জন প্রতিবেশী জড়ো হয়। সবাই মুকুন্দের কথা বলতে থাকে। কুয়োতে গিয়ে দেখতে পারি। জল তো আর নেই। একশো বছরের পুরনো কুয়ো। বারু যেন কুয়োর ইতিহাস নিয়ে বসেছে। সবার মনে এখন কুয়ো নিয়ে জিজ্ঞাসা। এখন মঙ্গল এবং বারু সবার আগে আর তাদের পেছনে সমস্ত প্রতিবেশী পুরুষেরা এক পা এক পা করে এগিয়ে যায়। পথে লোকসংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে সবাই ভেতরে উঁকি দেয়। অনেক গভীরে কী একটা কালো জিনিস। সবাই মিলে দড়ি বেঁধে বচনে ঝিয়রকে কুয়োতে নামায়।

কিছুক্ষণ পর কুয়োর ভেতর থেকে বচনে ঝিয়রের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে শোনা যায়।

মুকুন্দ ম-রে গেছে...।

রচনাকাল ১৯৮৯

চৌপাল : গ্রামের মাঝামাঝি পাকা বাধানো বারোয়াড়ি আড্ডাখানা

অজিত কৌর

ওকে মেরো না

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাত। দূর থেকে কয়েকটা কুকুরের চিৎকার অন্ধকারকে ফালা ফালা করছে। ঘরের কোন কোণায় লুকিয়ে থাকা একটি টিটহরী পাখি লাগাতার টি টি করছে। ঘুম আসছে না। আমার ভাই কেবলের মৃত্যুর পর থেকে আমার আর মায়ের ঘুম উড়ে গেছে। তবু মা-বেটি পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমরা কেবল ঘুমের বাহানা করি। এরকম সময়ে একটা অদ্ভুত শব্দে আমি ধড়ফড়িয়ে উঠি।

ওরা বলে, আমার ভাইকে আতঙ্কবাদীরা মেরেছে। জানি না, ওর সঙ্গে কার কী শত্রুতা ছিল। অবশ্য হত্যা তো যে কেউ করতে পারে। সেজন্যে সন্ত্রাসবাদী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কাউকে মেরে ফেলা কত সহজ। বছরের পর বছর কত কষ্ট করে মা-বাবা তাদের ছেলেকে বড় করে তোলে, আর একটিমাত্র গুলি! বাস! মস্ত ফোলানো বেলুনে একটা সুঁই ফোটালে যেমন হয়। যতক্ষণ মানুষ হাঁটতে চলতে থাকে, ততক্ষণই সে মানুষ! একটা ফুটো করে দিলেই সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যায়। বাকী থাকে লাশ! মাটি! তাকে পুড়িয়ে দিলেও কিছু থাকে না, কবর দিলেও প্রায় একই ব্যাপার।

একমাসও হয়নি, মনে হচ্ছে যেন কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। উঠতে বসতে ভাল লাগে না, রান্না করতে ভাল লাগে না। এমনিতে মায়ের কথা ভেবে উনুন ধরিয়ে দু'টি রুটি সেঁকে নিই। মা-ও তেমনি আমার কথা ভেবে রান্না করে। পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আমরা প্রতিদিন কিছু গলাধঃকরণ করি।

এমনও হতে পারে ভাইকে সরলার ভাইরা মেরেছে। কতবার তো ওরা ধমকি দিয়েছে। সরলা উঁচু নাকঅলা ব্রাহ্মণের মেয়ে। ভাই বলতো, আমাদের পূর্বপুরুষ জামাকাপড় রঙ করতেন ঠিকই কিন্তু আমার বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার, তিনি আমাদেরকে কলেজে পড়িয়েছেন। তিনি বলতেন, জন্মসূত্রে কেউ ছোট বড় হয় না। কিন্তু তিনি বললে কী হবে? আমার বান্ধবীরা, প্রতিবেশী মেয়েরা এমনকি কলেজের সহপাঠিনীরাও বলতো, সব ছোটজাতের লোকেরাই বলে থাকে যে ছোট-বড় কিচ্ছু হয় না! কিন্তু ছোট-বড় তখনই থাকবে না, যখন বড়রাও এরকম বলবে।

আমি কখনো ওদের কথা পাত্তা দিই নি, কিন্তু কেবলের হত্যার পর থেকে শুধু এইসব উৎপটাং চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খায়। আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। আর এই অন্ধকার রাতে মনে হয়

ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে; এক অমূলক ভয়! কোন হিংস্র জন্তুর জ্বলজ্বলে চোখ যেমন অন্ধকার চিরে কাউকে অনিমেষ দেখতে থাকে। অথচ এখন আর কিসের ভয়? গত এক বছর কেবল ঘর থেকে বেরোলেই আমরা দুশ্চিন্তায় ছটফট করতাম, শুধু কি হয়, কি হয়। এখন আর কিসের ভয়? মৃত্যুর থেকে মারাত্মক কি আর কিছু রয়েছে? কিন্তু শব্দটা যে আমাদের কোন ঘর থেকেই এসেছে তা আমি নিশ্চিত।

দূর থেকে একপাল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে মনে হয় ওরা বুঝি আমাদের বাড়ির দিকেই তাক করে চেঁচাচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে দু'টো কামরাই ভাল করে দেখি। ঝুঁকে খাটিয়াগুলির নিচে ও দেখি। বাল্বের টিমটিমে আলোয় খাটিয়াগুলির নীচে কেবল খাটিয়ারই ছায়ারা জড়সড়। আমার মনে হয়, ছায়াগুলি নড়ছে, এপাশ ওপাশ করছে। নিজেকে বোঝাই, এখন কিসের ভয়? কেবলকে তো ওরা মেরেই ফেলেছে।

ওকে কি সরলার ভাইরাই মেরে ফেলেছে? অবশ্য যে কেউ মারতে পারে। এই শিখরাও পারে যাদেরকে আতঙ্কবাদী বলা হয়, অথবা অন্য কেউ।

তিনটি কামরা পেরিয়ে আমি পেছনের উঠোনে যাই। জলের কল থেকে থেমে থেমে টপ করে এক বিন্দু করে মেঝেতে পড়ছে। প্রত্যেক দুই-তিন সেকেন্ডের পর - টপ...! লাগাতব...!

অন্ধকারে সব কিছু অদ্ভুৎ লাগে। দূরে রাখা টুকরীটাকে মানুষের মতন লাগে, যেন হাঁটুমুড়ে বসে আছে, বড় বালতিটার মধ্যে কেউ লুকিয়ে নেই তো, অথবা কোণে রাখা চারপাই এর নীচে? কে জানে! একটা আতঙ্কের গোলা আমার গলায় আটকে যায়।

পেছন দিকে রান্নাঘরের গায়ে লাগা কামরায় পেঁয়াজের স্তূপ, গমের বস্তা, পুরনো বিছানা-চাদর-লেপ-তোষক থাক থাক করে সাজানো। কিছু পুরনো কাঠের বাক্স একের পিঠে দুই করে রাখা আছে। প্রত্যেকটাতেই কিছু না কিছু অব্যবহৃত জিনিস ভরা। কয়েকবার মাকে বলেছি, এগুলি ফেলে দিই। মা বলেন, জিনিস ফেলতে হয় না, তিল তিল করে জমাতে জমাতে তবেই সংসার ভরাট হয়। আমি অবাক হই, ঘরেও এমনি ফাটা পুরনো বহু ব্যবহৃত জিনিসপত্র অনেক রয়েছে। এই বাক্সগুলিকে দেখলে আমার ভীষণ রাগ হয়, সেগুলি থেকে যত মৃত মানুষের ইচ্ছা-স্বপ্ন আর অতীতের গন্ধ ভেসে আসে।

নিকষ অন্ধকার রাতে এই প্রহরে সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। শুধু কুকুরেরা জেগে আছে, অথবা জেগে রয়েছে আমার মতো কিম্বা আমার মায়ের মতো বেঁচেও মরে থাকা কিছু অভিশপ্ত মানুষ, কেমন একটা শব্দ পেয়ে আমি ঐ ঘরের ভেজানো দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালাই। টিমটিমে আলোর বাল্বটাকে অনেকদিন পর জ্বলতে দেখে আমি অবাক। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠি। একটা কাঠের বাক্সের পেছনে একটি ছেলে বসে কাঁপছে। ওর একটি পা থেকে গবগব করে রক্ত বেরোচ্ছে। ও দু'হাতে পা'টাকে চেপে ভয়ার্ত খরগোশের মতন তাকিয়ে কাঁপছে। ও কি আমাকে ভয় পাচ্ছে?

আমারও পা কাঁপে। ও কে? এখানে লুকিয়েছে কেন? আমি কি চেঁচাবো? কিন্তু আমার গলা দিয়ে এখন কোন আওয়াজই বেরোবে না। তার উপর ছেলেটা আহত। ও কাতর কণ্ঠে বলে, পানী!

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে দিই। আমার হাত কাঁপতে থাকে। মাথা কাজ করে না। ও আমার হাত থেকে গ্লাস নেয়। একে ঠিক নেওয়া বলা চলে না, একরকম ছিনিয়ে নেয়। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওর জল খাওয়ার ঢক ঢক শব্দ শুনি। ও গ্লাস খালি করে আমার দিকে বাড়ায়। ঐ গ্লাস নিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে আবার জল ভরে আনি। এবার ও ছিনিয়ে নেয় না, আস্তে হাত বাড়িয়ে জল নিয়ে ধীরে ধীরে অর্ধেক জল খেয়ে বাকী অর্ধেকটা নিজের পায়ের কাছে রাখে।

আমি ওকে দেখতে থাকি। আতঙ্কেরও বুঝি এক নিজস্ব সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে, যা মানুষকে অবশ করে দেয়, সে বলতেও পারে না, কিছু করতে পারে না।

ছেলেটি চোখ তুলে তাকায়। এখন ওর চোখে ভয় নেই। চেহারায় নানারঙ খেলা করে। ও যে নিজের অসহায়ত্বের জন্য বিরক্ত তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাকে বলে, ভয় পেয়ো না বোন, একটু চলাফেরার শক্তি পেলে নিজে নিজেই চলে যাব!

এতক্ষণে আমার গলায় জমা আতঙ্কের গোলাটা গলছে। বুকে জমা ভয়ের বরফ গলছে। আমি চুপচাপ আবার রান্নাঘরে যাই আর ডেকচি থেকে এক গ্লাস দুধ ভরে আনি। ও ধীরে ধীরে দুধটাও খেয়ে নেয়। গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে ঐ হাতের পেছন দিয়ে মুখ মোছে।

একটু কাপড় দেবে, পায়ে বাঁধবো!

আমি একটা কাঠের বাক্স খুলি। মায়ের একটা পুরনো ওড়না পেয়ে যাই। ও ওড়নার একপ্রান্ত জখমের উপর রেখে পায়ে তিন চার প্যাঁচ দেয়। তারপর ও ওড়নায় গিঁট লাগাতে থাকে। আমি দেখি ওর হাত কাঁপছে। তাই ওর থেকে ওড়নার দুই প্রান্ত নিজের হাতে নিয়ে কষে গিঁট বাঁধি। ও বলে, গুলি লেগেছে!

— গুলি! আমি চমকে উঠি।

— হ্যাঁ, কুত্তা পুলিশের গুলি!

— পুলিশ? আমার আওয়াজ কেঁপে ওঠে!

— না, আমি কোন চোর-ডাকু নই আমি তো —

— আতঙ্ক-বা-দী?

আমার প্রশ্নে ওর চোখে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়। ঠোঁট দু'টি আগের মতই কাতর। ও বলে, — আতঙ্কবাদী আবার কোন্ জানোয়ারের নাম?

আর তখনই বোধ হয় ওর ক্ষতস্থান কনকনিয়ে ওঠে। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে। তবু গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, চোয়াল শক্ত হয়, মুখমন্ডলের সমস্ত পেশী টানটান হয়। ও ক্ষতস্থানটাকে দুই হাতে চেপে ধরে বলে, যাও, তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়, ব্যথা একটু কমলেই আমি চুপচাপ উঠে চলে যাব।

কোথাও যেতে হবে না! নাজানি কিসের অধিকার থেকে বলি, এই অবস্থায় কী করে যাবে? আমি উঠে বাইরে থেকে ঘরটায় তালা লাগাই। তারপর ঘরে গিয়ে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে পড়ি।

ঘুমও আহত অতিথির মতন কোথাও লুকিয়ে আছে। আমি ঘুমের তরঙ্গে ভেসে যেতে পারি না। ধীরে ধীরে এক বিশাল কালো বিড়ালের মতন সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলতে থাকা রাতকে অনুভব করি। ছেলেটির গুলি লাগা পা আর যন্ত্রণাকাতর মুখ আমার কোন চিন্তাকেই সম্পূর্ণতা পেতে দেয় না। ও কে? কেন পুলিশ ওকে গুলি করলো? ওকে আটকালাম কেন? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই আমার মনে হয় রাত প্রায় শেষ। তখনই মনে হয়, আরে ভোর হয়ে গেলে ও পায়খানায় যাবে কেমন করে? আমি চমকে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে লোটায় জল ভরি। তারপর ঐ ঘরের তালা খুলি। ও খুব চাপা আওয়াজে কোঁকাচ্ছে। থেমে থাকা যেন হাওয়ারই কাতরতা হাল্কা বাতাসকে ভারী হাওয়ার করাৎ দিয়ে কাটা হচ্ছে। ওকে বলি, ভোর হলে তো বেরোতে পারবে না, যাও ওখানে জল রয়েছে, মাঠে ঘুরে এসো।

তারপরই কী ভেবে বলি, দূরে যেতে হবে না, কাছেই কোথাও বসে পড়ো, আমি তোমার দিকে পেছন দিয়ে পাহারা দেব, দূর থেকে কাউকে দেখলেই শিস্ দেব!

ও অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। আমি ওর হাত ধরে থাকি। ধীরে ধীরে ওকে নিয়ে পেছনের দরজা অব্দি পৌঁছে আস্তে ছিটকিনি খুলি। বাইরে বেরিয়ে ওকে দেওয়ালের কাছেই বসার ঈশারা করি। পাশেই লোটা রাখি। তারপর দু'হাত ছড়িয়ে নিজের ওড়নাকে তাঁবুর মতন করে ওকে আড়াল করে দাঁড়াই। আমি যেন এক মা-মুর্গী, ছড়ানো ডানার নীচে ছানাগুলিকে লুকিয়ে রেখেছি, চারিদিকে,

আকাশে শকুনেরা উড়ছে। আমার কুমারী হৃদয়ে মাতৃত্ব ছলকে ওঠে; ও যেন আমার অসহায় সন্তান!

ও আওয়াজ দিলে ওকে উঠিয়ে এক হাতে খালি লোটা নিয়ে অন্যহাতে ওকে শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে বাড়িতে ঢুকে তেমনি নিঃশব্দে ছিটকিনি আটকাই। তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে পুরণো জায়গায় বসাই। তারপর বিছানার বাক্স থেকে একটা পুরণো তোষক বের করে ওর পায়ের নিচে রাখি। দু'টো বালিশ আর একটা চাদর বের করে দিই। শেষরাতের হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

সকাল হতেই দু'জন পুলিশের লোক আমাদের বাড়িতে আসে। কেবলের হত্যার পর থেকে দুই-চারদিন পরপরই নানা সূত্রের সন্ধানে আমাদের বাড়িতে পুলিশ আসে। কিন্তু আজ আমি ওদেরকে দেখে শিউরে উঠি। একজন বলে, গতকাল রাতে চার-পাঁচজন আতঙ্কবাদী পুলিশের দু'জন সিপাহীকে ঘিরে ওদের বন্দুক দু'টি ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। তখন দূর থেকে তৃতীয় এক সিপাহী ওদের দিকে তাক করে গুলি চালায়। সবাই পালালেও কম করে একজনের গায়ে অবশ্যই গুলি লেগেছে। মাটিতে রক্তের ছিটে পাওয়া গেছে। সেই ছিটে অনুসরণ করে আমরা এই গলিতে ঢুকেছি। আপনারা ভয় পাবেন না, ভাল করে ছিটকিনি লাগিয়ে রাখুন। সময় অসময়ে বাইরে বেরোবেন না। গলির সমস্ত শিখদের বাড়িতে তল্লাসী চলছে। পালিয়ে যাবে কোথায়? কোথাও লুকিয়েছে হবে। নাহলে এই গ্রামেই কোথাও হবে। যদি ওর সঙ্গীরা ওকে ট্রাকে করে তুলে অন্য জায়গায় না নিয়ে থাকে। সেই সম্ভাবনা কম। আমাদের সন্দেহ এই গ্রুপটাই আপনাদের কেবলকে মেরেছে। শালা, বাঞ্চোৎ, পালাবে কোথায়? এক একটাকে ধরে...!!! ওরা বলে যায়। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শোনে। আর আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ধমনীতে বেগে ধাবমান রক্তের আওয়াজ শুনতে পাই।

তবু দুপুর অব্দি ঐ ঘরে যেতে পারি না। মা কখনো এই ঘরে, কখনো ঐ ঘরে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। আজকাল মা এইরকমই ছটফট করে। কী যেন হারিয়ে গেছে, মনে পড়ছে না কী হারিয়েছে, অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে দুপুরের খাবার খেয়ে মা রামায়ণ খুলে বসলে আমি চারটি অতিরিক্ত রুটিতে বেগুনের তরকারী রেখে ওড়নার আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে সাবধানে ঐ ঘরের তালা খুলি। দিনের আলোয় ওকে একটি জড়সড় বাছুরের মতন লাগে। রাত থেকেও খর্বাকৃতি, অনেক ঝিমিয়ে পড়া! ওর গালের দু'পাশে. ঠোঁটে ও থুতনিতে হাল্কা বাদামী রোয়া গজিয়েছে। আমার মনে হয়, ওর থুতনিতে নিশ্চয়ই একটি ছোট্ট গর্ত থাকবে; থুতুনির মাঝামাঝি।

ওর চোখ বন্ধ। আমি ধীরে ওর হাত ঝাকাই। ও চোখ খোলে। চোখে কালো যন্ত্রণা সাঁতার কাটে। ব্যথা ও অনিদ্রায় চোখের কোল দু'টি সামান্য ফুলে আছে। আমি রুটিগুলি বাড়াই। ও বলে, ক্ষিদে নেই। তারপর কোঁকাতে কোঁকাতে দু'হাত দিয়ে আহত পা-টাকে ধরে কিছুটা সোজা করে। আমি অনেকটা হুকুমের স্বরে বলি, ক্ষিদে না থাকুক, তবু খেতে হবে।

এতে কাজ হয়। ও রুটিগুলো হাতে নিয়ে খেতে শুরু করে। আমি রাতে রেখে যাওয়া জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে দেখি—খালি। রান্নাঘরে গিয়ে জল ভরে আনি। রাতে বাঁধা ওড়নার গায়ে কালো হয়ে রক্ত জমেছে। আর দু'পাশে ওর পা টকটকে লাল হয়ে ফুলে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করি, খুব ব্যথা?

হ্যাঁ, গুলিটা যে ভেতরে রয়ে গেছে।

ওর কথায় ভীষণ কষ্ট হয়। গতকাল রাত থেকেই তো মাংসপেশী কিম্বা হাড্ডিকে জখম করে লুকিয়ে থাকা গুলিটি আমাকে অস্থির করে রেখেছে। ওকে অনেক আগেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন সমস্ত হাসপাতাল, ডাক্তার, চিকিৎসাশাস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ওর জন্যে

অর্থহীন।

আমি চুপচাপ ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে আবার তালা লাগিয়ে দিই। উঠোনে পড়ন্ত বেলার রোদ অলসভাবে শুয়ে আছে। উঠোন পেরিয়ে সামনের ঘরে পৌঁছে দেখি মা তখনো রামায়ণ পড়ছে। কিন্তু ওর আওয়াজ শুনে মনে হয় ওর মন অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। আমি পার্স থেকে একটা দলানো মোচড়ানো একশো টাকা নিয়ে ওড়না ঠিক করি আর গলিতে বেরিয়ে পড়ি। গলির মুখে বাজেমালের দোকানের সামনে পাতা একটা লম্বা বেঞ্চে তিনজন সিপাহী বসে রয়েছে। আমি তাই অন্যদিক দিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে ঘুরে গিয়ে বড় রাস্তায় ঔষধের দোকানে পৌঁছোই। কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলি, একশিশি ডেটল দাও, একটা তুলোর বান্ডিল আর একটা ব্যান্ডেজের পাকেট। এই ছোট্ট শহরে সবাই সবাইকে চেনে ও জানে। এখানে ওষুধের দোকানদারকেও আমরা ডাক্তারবাবু বলি, আসলে ও ডাক্তার নয় তবে রেজিস্ট্রীকৃত ঔষধ বিক্রেতা। ও ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, কী হলো? মাতাজী কোথাও পড়ে টড়ে গেছেন নাকি?

কেবল হত্যার পর থেকে এলাকার সবাই আমাদের সঙ্গে বেশ দরদী আওয়াজে কথা বলেন। আমি বলি, না তো! হ্যাঁ, এমনি হোঁচট লেগেছে।

আমি ঘরে গিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব!

না না, তেমন কিছু না। আমি নিজেই করে নেব?

এবার আমার আওয়াজ আরো কেঁপে ওঠে। ও চশমার ফাঁক দিয়ে একবার আমাকে দেখে। তারপর ডেটলের শিশি, তুলোর বান্ডিল আর ব্যান্ডেজের গোলা হাতে ধরিয়ে দেয়।

এগুলি হাতে নিয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। এগুলি হাতে নিয়ে আমি গলি দিয়ে কেমন করে যাব? ওর দিকে না তাকিয়ে বলি, পলিথিন আছে?

ও তখুনি একটা বড় পলিথিনের প্যাকেট বের করে সবজিনিস ঢুকিয়ে দেয়। ঔষধের দোকান থেকে আমি অন্য একটা বাজেমালের দোকানে যাই। একটা লবণের প্যাকেট আর চারটে দিয়াসলাই কিনে সেগুলিও ঐ পলিথিনের প্যাকেটে ঢুকিয়ে আগে রাখা জিনিসগুলি ঢেকে হনহন করে হেঁটে বাড়ি ফিরি। ঐ তিন সিপাহী তখনও বেঞ্চে বসে রয়েছে। ঐ ঘরের তালা খুলে ঢুকে আমি ওর ক্ষতস্থান থেকে ওড়নার বাঁধন খুলি। ক্ষতের আশেপাশে রক্ত শুকিয়ে কাল হয়ে আছে। এরকম ভয়ানক ক্ষত আমি এর আগে শুধু কেবলের শরীরে দেখেছি। বুলেটের ক্ষত। তবে ওর শরীরটা এত ভয়ঙ্কর ছিল না। একটা মামুলি গর্ত, গর্তের চারপাশে রক্তের ধারা। ওর ক্ষত এত ফুলে ছিল না। বিশাল এক রাজতিলকের মতন কপালে একটা মৃত্যুর ছোবলমাত্র। সেই দৃশ্য মনে পড়তেই দু'চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজেকে সামলাই। তবু কানে শা শা হতে থাকে।

ক্ষতটাকে ভালমতন পরিষ্কার করে আমি তুলোর বড় একটা পোটলা ডেটলে ভিজিয়ে ওতে রাখি আর তার উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই। ক্ষতের উপরে ও সাঁড়াশির মতন দুহাতের আঙুলগুলি দিয়ে পা-টাকে চেপে রাখে, যন্ত্রণায় ওর চেহারায় অসংখ্য নীলরেখা ফুটে ওঠে।

রান্নাঘরে গিয়ে আমি একটি গ্লাসে ঈষদুষ্ণ দুধ ভরে এনে ওর কাছে রাখি। তারপর বাইরে থেকে ঐ ঘরের দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দিই। এবার উঠোনে এসে দু'হাতে মাটি নিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধুই। তবু ডেটলের গন্ধ যেতে চায় না। রান্নাঘরে গিয়ে চা বানাই। এককাপ চা নিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে রাখি। তারপর খাটিয়ায় বসে অন্য গ্লাস থেকে চুমুক চুমুক চা খেতে থাকি। আমার চোখে কেবল ঐ ভয়ঙ্কর ফোলা ফোলা কালো রক্তমাখা গুলির ক্ষত আর বাইরের গলিতে বাজেমালের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসা তিন সিপাহী ভাসতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতজাগা শরীরে কখন ঘুম ছেয়ে আসে যে আমার পুরো চা-টাই খাওয়া হয় না।

সে যে কেমন ঘুম; অস্তিত্বের একটা ভাগ জেগে থাকে, অন্যভাগ ঘুমোয়। ঘুমিয়ে থাকা অংশটি উন্মুক্ত এক মাঠে ছুটতে থাকা একটি খরগোশকে দেখতে পায়, তার পেছনে কয়েকটি ভয়ঙ্কর কুকুর ধাওয়া করে। খরগোশটি প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু কুকুরেরা প্রচন্ড চিৎকার করে ওকে ধাওয়া করতে থাকে। কুকুরের ডাকের প্রচন্ডতায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি চমকে উঠে আসি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে বসে গেছে। মা ঘরে নেই। বাইরে কুকুর ডাকছে।

আমি উঠে পেছনের উঠোনে যাই। মা উনুন ধরিয়ে তার পাশে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে লাকড়ির গায়ে লাগা আগুন দেখছে। উনুনে ডালের কড়াই। একদম পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ধীরে মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করে, কীরে মাথাব্যথা করছিল? কখন থেকে ঘুমোচ্ছিস?

আমি বলতে যাই, জেগেই বা কী করবো? কিন্তু চুপ থাকি, এই গনগনে নৈঃশব্দে আমি একবার ঐ ঘরটার দিকে তাকাই, তারপর মাকে বলি, ওঠো মা, রুটি আমি সেঁকছি।

মা হাঁটুতে হাত রেখে চুপচাপ উঠে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে মাকে খাবার দিয়ে এসে একটা বাটিতে ডাল নিই। তাতে এক চামচ গরম ঘি ঢালি, তারপর থালায় রুটি রেখে সাবধানে ঐ ঘরের তালা খুলি।

ও ঘুমিয়ে আছে। আমি ওর হাত ছুঁই। ছ্যাকা লাগে। থালাটা মেঝেতে রেখে আমি ওর কপালে হাত রাখি। গরমে পুড়ে যাচ্ছে। ওর প্রত্যেক শ্বাসে এক হাল্কা কোঁকানি মিশে আছে। আমি ওর পা দেখি। ব্যান্ডেজের উপর রক্ত চুঁইয়ে কালো হয়ে আছে। ওর পা এখন ভীষণ ফুলে গেছে।

এক অদ্ভুৎ অসহায়তা আমাকে গ্রাস করে। বাইরে বেরিয়ে তালা লাগাই। ঘরে গিয়ে চেষ্টা করেও খেতে পারি না। ওঁকি উঠে আসে। গা গুলায়। পাগল-পাগল লাগে। বিছানায় শুয়ে আমি কখনো এপাশ-কখনো ওপাশ-কখনো উপুড়-কখনো চিৎ-ছটফট করতে থাকি।

মাঝরাতে উঠে পা টিপে টিপে আমি আবার ঐ ঘরে যাই। আলো জ্বালাই। ও নিজের পায়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর কোঁকানি এখন প্রলম্বিত ও অসহনীয়। আমি ওকে ডাকি, কিন্তু ও ওঠে না। রুটিগুলি যেই কে সেই থালায় রাখা; ডালের উপর ঘিয়ের সাদা সর পড়েছে।

এক গ্লাস জল এনে ওর চিবুক ধরে মুখটাকে উঁচু করি, জলের গ্লাসটা ওর ঠোঁটে লাগাই। ও জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে বুঝতে পারি না। দুই ঢোঁক জল খেয়েই ও আবার আহত পাযের উপর ঝুঁকে পড়ে।

ও বোঁচকার মতন পুরণো বাক্সের পেছনে পড়ে থাকে, আর বাইরে বিপদ ওর জন্যে ওৎ পেতে থাকে। আমি ওকে নিয়ে কী করবো বুঝে উঠতে পারি না।

পরেরদিনও একইরকম জ্বরে ও সারাদিন পুড়তে থাকে। সন্ধ্যায় আমি জোর কবে ওকে একগ্লাস গরম দুধ খাওয়াই। একবার ও চোখ খোলে। টকটকে লাল চোখ। ফিসফিসিয়ে বলে, আমি এখানে মরতে চাই না, আমার লাশ বের করতে তুমি বিপদে পড়বে বোন। ও অনেক কষ্টে কথাগুলি বলে।

মহা দুশ্চিন্তায় অবশপ্রায় নিজের ঘরে ফিরতেই সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। মা বলে, এই সময়ে আবার কে রে?

তুমি শুয়ে থাক আমি দেখছি, চিন্তা করো না, বাইরে পুলিশ রয়েছে।

আমি বাইরে বেরিয়ে সদর দরজা খুলে দেখি দু'জন সিপাহী। ওরা বলে এমনিতে আপনাদের বাড়িতে তল্লাসীর কোনই প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের কুকুর গত দু'দিন ধরে রক্ত শুঁকে শুঁকে বারবার এখানে চলে আসছে! একটু খুঁজে দেখা উচিত।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলি, মা সারারাত আতঙ্কে শুতে পারেননি। এইমাত্র খাবার খাওয়ার পর চোখ লেগেছে। আপনারা ঘন্টাখানেক পর.....!

ঠিক আছে, মাজীকে ঘুমুতে দিন! আমরা ঘন্টাখানেক পরেই আসছি। সাবধানে থাকবেন। কিন্তু এত রাতে...!

না না, রাত হয়েছে তো কী, আপনারা তো ভালর জন্যই...! ঘরে ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করে, কে রে?

দু'জন সিপাহী! এক ঘন্টা পর তল্লাসী নেবে। কেউ পালিয়ে এসে এই গলিতে লুকিয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

মা খাটিয়ায় শুয়ে জিজ্ঞেস করে, ভাল করে ছিটকিনি লাগিয়েছিস?

কিছুক্ষণ পর আমি ধীরে উঠে পেছনের ঘরে গিয়ে ঢুকি। ও এখন জেগে আছে। ওর চোখমুখে আবার পরশু রাতের আতঙ্ক। আমি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করে, কে এসেছিল? আমি অবাক হই। এই বন্ধ ঘর থেকেও সদর দরজা খোলার আওয়াজ কেমন করে পেল?

আমি তাড়াতাড়ি সব কিছু বলে যেন দোষমুক্ত হতে চাই।

মুহূর্তেই ওর চেহারায় সিদ্ধান্ত খেলা করে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত। কাঠের বাক্সগুলিকে চেপে ধরে ও উঠে দাঁড়ায়, চোয়াল শক্ত হয়। ও বলে, আমি যাচ্ছি।

আমি আর ওকে আটকাই না। আটকেই কী করবো? সেও জানে আর আমিও জানি আর বাঁচাব কোন রাস্তা নেই। বাইরের বিপদ চৌকাঠ পেবিয়ে অনেক আগেই ভেতরে চলে এসেছে। ও থরথর পায়ে এক কদম বাড়ায়। তারপর আরেক কদম। এভাবেই ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আমি পেছনের দরজা খুলে দিই। ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে একবার আমাকে দেখে। ওর দৃষ্টিতে মৃত্যুর ছায়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা, আরো না জানি কী সব অনুভূতি মিশে থাকে। আমি তা ভাষায় বর্ণনা কবতে পারবো না। শুধু এইটুকু জানি ও অনেক বছর ধবে আমার আশেপাশেই ঘুরতে থাকবে, অবসর সময়ে সুযোগ পেলেই আমার কাছে ঘুরে ঘুরে আসবে।

ও বেরিয়ে গেলে আমি ছিটকিনি লাগিয়ে দিই। একটি দীর্ঘশ্বাস শরীরের কোন গহণ অতল থেকে উঠে আসে। আমি ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ অনেকক'টা কুকুর চেঁচিয়ে ওঠে। একঝাঁক গুলির শব্দ অন্ধকার ফালাফালা করে। কিন্তু কোন মানুষের চিৎকার শুনতে পাই না।

বাইরে কেবল অনেক ক'টা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর ভারী বুটের দৌড়নোর আওয়াজ। হয়তো এসব শুনেই আমার মা আধোঘুম আধোচেতনাব চৌকাঠ পেরিয়ে উঠে দাঁড়ায় আর ঘর ছেড়ে সদর দরজার দিকে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে, আমার ছেলেকে মেরো না গো, আমার কেবলকে মেরো না, ওকে ছেড়ে দাও। ওকে গুলি করো না!

বচনাকাল: ১৯৮৮

জসবন্ত সিংহ ভিরদী

পাগলের শিং

ডাক্তার সিংহ চুপচাপ নিজের ক্লিনিকে (পাগড়ি - সেলাম বাবদ যে অগ্রিম টাকা বাড়িওয়ালাকে দিতে হয়) একাকী বসে বসে ভাবছেন, ধ্যাৎ একটা বাজে জায়গায় ব্যবসা শুরু করলাম, একলাখ টাকা পাগড়িও দিলাম কিন্তু গ্রাহক এত কম। এখন কি আমাকে রোগী খোঁজার জন্যেও পাগড়ি দিতে হবে? শুনশান বিকেলের সমস্ত আলো ফুরিয়ে গেলে ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার ছেয়ে যায়। ডাক্তারবাবু আলো জ্বালান। কতক্ষণ এমনি চুপচাপ বসে থাকতে হবে, কে জানে?

তখন হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। ডাক্তারবাবু খুশী হয়। ওকে রুগী ছাড়া আর কে ফোন করবে? তিনি টেলিফোন তুলে বলেন, হ্যালো।

— আপনার হাসপাতাল ক'টা অব্দি খোলা থাকে?

— ভোর থেকে রাত অব্দি, কেন?

— আমরা আপনার কাছে এক কুকুরে কাটা রুগী নিয়ে আসছি।

— কেন?

— চিকিৎসার জন্য।

— কিন্তু আমি তো কুকুরে কাটা রুগীর চিকিৎসা করিনা।

— কেন আপনি ডাক্তার না?

— হ্যাঁ, ডাক্তারই, তবে.....।

— তাহলে ঠিক আছে।

— কী ঠিক আছে?

ডাক্তারবাবু এবার কোন জবাব পান না। অপর প্রান্তে টেলিফোন হাতে নিয়ে কয়েকজন আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। এরা কারা? ডাক্তারবাবুর উৎসুক্য বাড়তে থাকে। তখন তিনি রিসিভারে 'হ্যালো!' বলেন। তারপর ঘড়ি দেখেন। নভেম্বর মাসের শীতল রাত। সাড়ে আটটা বাজে। এখন ক্লিনিক বন্ধ করে বাড়ি যাওয়া উচিত। একথা মনে পড়তেই ডাক্তারবাবু ফোনে আরেকবার 'হ্যালো' বলেন। তারপরও কিছুক্ষণ অপরপ্রান্তে শলাপরামর্শ চলতে থাকে। ডাক্তারবাবু ভ্রূ কুঁচকে আবার হ্যালো বলেন। এবার অপরপ্রান্ত থেকে অচেনা আওয়াজ জানতে চায়, আপনি কুকুরের চিকিৎসা করেন না?

— কেমন কুকুর?

— আমি জানতে চাইছি, কুকুরের চিকিৎসা।

— করি। তখনই অপরপ্রান্তে অন্য কেউ রিসিভার নিয়ে বলে, আমরা আপনার কাছে একজন পাগলকে নিয়ে আসছি।

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, আশ্চর্য। পাগলের চিকিৎসা আমি করি না। আপনারা ওকে কোন পাগলের হাসপাতালে নিয়ে যান।

— পাগলের হাসপাতাল আবার কোথায়?

— শহরে অনেক ক'টা রয়েছে।

— বলুন তো কোনটায় নিয়ে যাই।

— তা আমি কী করে বলি, আপনারা খুঁজে নিন।

— আমরা পাগল সামলাবো না হাসপাতাল খুঁজবো। আপনি তো আজব ডাক্তার।

— শান্তভাবে কথা বলুন, আপনার গলা ভেঙ্গে গেছে।

— আপনি কেমন করে বুঝলেন স্যার?

— আমি দরজা-জানালার আওয়াজ চিনি, পশুপাখির আওয়াজ চিনি, ভাল মানুষ-খারাপ মানুষের আওয়াজও বুঝতে পারি।

ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি এবার হেসে উঠে বলে, তাহলে আমাকেও চিনে নিন।

— খুব চিনেছি, মদ খেয়ে আলফাল বকে আপনার গলা ভেঙ্গেছে, স্বরযন্ত্র ভেতর থেকে ফুলে উঠেছে, কাল সকালে গলা বসে যেতে পারে। আপনি কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যান।

— আপনি দয়া করে কারো নাম বলবেন?

— দাঁড়ান দেখছি। তিনি নিজের ডাইরি খুলে নানা ডাক্তার ও হাসপাতালের ঠিকানা খুঁজতে থাকেন। কিন্তু এধরনের পাগলকে কার কাছে পাঠাবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না।

গত পাঁচ-সাত বছরে পাঞ্জাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। কুকুর পোষা ধনী কৃষক আর জাগীরদারদের পরিবারেই এই রোগ বেশী দেখা যাচ্ছে। এখন পাঞ্জাবের খেতখামারে সমস্ত পরিশ্রমের কাজ বিহার ও পার্শ্ববর্তী উত্তরপ্রদেশের শ্রমিকরা করে। কাজেই এককালের পরিশ্রমী পাঞ্জাবী কৃষকদের বর্তমান প্রজন্ম অলস ও আরাম আয়েসে দিন কাটায়। অথচ একটা গ্রামেও গ্রন্থাগার নেই, সঠিক শিক্ষা নেই। ফলে এধরনের রোগ বাড়ছে। রোগ বাড়লে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও গজিয়ে ওঠে, নতুন নতুন রোগই তো নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ তৈরী করে। কে জানে পরিস্থিতি আমাকেও কোন নতুন রোগের বিশেষজ্ঞ করে তুলবে কিনা। কানে লাগানো রিসিভারে তখন নিরন্তর হৈ হুল্লোড় গালিগালাজ ও হাসিঠাট্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর বক্তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস। গ্রীষ্মের ভরদুপুরে কুকুর যেমন হাঁপায়। ডাক্তারবাবু ভাবেন, ওরা পাগলকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। তিনি ফোনে বলেন, হ্যালো।

হ্যাঁ স্যার হ্যালো, প্লীজ আমাদের সাহায্য করুন, প্লীজ।

আমার কাছে এমন কোন ঠিকানা নেই, আপনারা শহরে গিয়ে—

আপনি বুঝছেন না কেন, এই পাগলকে নিয়ে আমরা এসব......., এখানকার লোকেরা তো আপনারই নাম করছিল।

কোথাকার লোকেরা?

যারা আপনার থেকে চিকিৎসা করায়।

আমি তো কেবল পশুপাখি আর কুকুরের চিকিৎসা করি।

এখন আপনাকে পাগলের চিকিৎসাও করতে হবে, আপনি তো ডাক্তার, ডাক্তার তো ঈশ্বরের

স্বরূপ, আপনি কুকুর আর মানুষকে আলাদা চোখে দেখবেন কেন? কুকুরের চিকিৎসা করবেন আর কুকুরে কাটা মানুষের চিকিৎসা করতে পারবেন না?

ডাক্তারবাবুর কাছে এ যেন এক চ্যালেঞ্জ। কলেজে অধ্যাপকরা বলতেন, রুগীর প্রতি এক চিকিৎসক যত বেশী সহানুভূতিশীল আর সংবেদনশীল হবে, ভাল করে রুগী ও তার রোগকে বুঝবে, সফলতার সম্ভাবনা ততই বাড়তে থাকবে। ডাক্তারবাবু পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফোনে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোত্থেকে বলছেন?

এই কাছেই. আপনার চেম্বার থেকে দশ কিলোমিটার দূরের একটি খামারবাড়ি থেকে।

ওর কথা শুনে ডাক্তারবাবুর চোখে ভাসে সন্ধ্যা নাগাদ খামারবাড়ির জিনস টিশার্ট মার্কা তরুণদের জীপগাড়িতে কুকুর নিয়ে বসে, স্টিরিওতে উঁচু আওয়াজে পপ সঙ আর বিলিতি মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে প্রবল বেগে গাড়ি চালানো। ওদের বেসামাল ড্রাইভিং-এর শিকার অনেক লোককে তিনি ফার্স্ট এইড দিয়েছেন। অনেককে বাধ্য হয়ে বড় হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তবু তিনি এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে বলেন,

— ঠিক আছে নিয়ে আসুন, দেখি কী করতে পারি।

— ধন্যবাদ স্যার, আমরা এখুনি পাগলকে নিয়ে আসছি।

— কী করে আনবেন?

— ধরে আনবো! আমাদের কাছে জীপ রয়েছে।

— এভাবে ওকে সামলাতে পারবেন না।

— তাহলে?

— ওকে ট্রাকের ক্যারিয়ারে বেঁধে আনুন।

— ট্রাকে কেন?

— তাহলে ও আসার পথে কাউকে কামড়াতে পারবে না। আমি তো অনেক মাতালকে এভাবে নিয়ে যেতে দেখেছি।

— কাদেরকে দেখেছেন?

— ঐ কোন খামারবাড়ির—

— কিন্তু ওদের কাছে তো জীপ থাকে, মদ খেয়ে তো গাড়িও চালানো যায়।

— তা তো. যায়ই, তারপর নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরকেও হাসপাতালে হাত-পা ভেঙ্গে শুয়ে থাকতে হয়।

— কিন্তু ট্রাক পাই কোথায় বলুন তো। আর ভাড়াও অনেক হবে।

— তা তো হবেই। নিজের মানুষকে বাঁচাতে আপনারা খরচ করবেন না? এরকম সময়ে সহায়তা পাওয়ার জন্যই তো মানুষ রোজগার করে।

— চিকিৎসাতেও কি অনেক খরচ?

— হ্যাঁ, তা তো হবেই, ভালোই খরচ হবে।

— তবুও একটা আন্দাজ......!

— সে তো পেশেন্ট দেখে, পরীক্ষা করে তবেই বলা সম্ভব।

— এই পাগলামি থেকে কেমন করে বাঁচা যায় বলুন তো।

এই ঘষা আলাপ ডাক্তারবাবুর আর ভাল লাগে না। রাত বাড়ছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে। তিনি রেগেমেগে বলেন, হ্যাঁ বাঁচা যাবে, যদি তোমরা জীপে বসে কুকুরগুলিকে মদ আর সিগারেট না খাওয়াও। মদের নেশায় অহেতুক ওদের লেজ মারিয়ে ওদেরকে উত্যক্ত না করো।

— ছিঃ, এরকম কেউ করে নাকি?

— অবশ্যই করে। পাগল হওয়ার এর থেকে সহজ উপায় আর কী আছে? বুঝতে পারছেন না? কিছুক্ষণ ওপাশ থেকে কোন আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। ডাক্তার বলেন, দেবী করছেন কেন? তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। পেশেন্টে কি জল দেখে ভয় পাচ্ছে?

— আচ্ছা ডাক্তারবাবু এই রোগ হয় কেমন করে বলবেন কি?

ডাক্তারবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তবু নিজেকে সামলে বলেন, যদি কোন পাগল কুকুরে কামড়ায়, অথবা যে কুকুরের শরীরে জার্ম রয়েছে, কিম্বা কোন মানুষ যদি পাগলা কুকুরকে কামড়ায় তারও হতে পারে। আপনার কী কেস?

— এই বোগ আদৌ হয়েছে কিনা তা কেমন করে বোঝা যাবে?

— একে ডাক্তাররা হাইড্রোফোবিয়া বলে। শরীরে রেবিজের জীবাণু বেড়ে গেলে পেশেন্ট জল দেখে ভয় পায়, কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে, পাগলা কুকুরের মতন সামনে যাকে পায় তাকেই কামড়াতে ছোটে।

এটুকু বলেই ডাক্তারবাবু থেমে যান। জলাতঙ্কে মৃত্যুর প্রবল সম্ভাবনার কথাটা ও আর মুখে আনে না। মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করা ডাক্তারের ধর্ম নয়। ও ভাবে, এইসব খামারবাড়ির লোকেরা ডাকাতের ভয়ে মারাত্মক সব দেশী-বিদেশী কুকুর পোষে। মদ খাওয়ার পর ওদেরকেও মদ খাওয়ায় আর তারপর তো মানুষে কুকুরে কোন পার্থক্যই থাকে না। ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে ওঠেন। অনেকদিন পর অনুভব করেন যে এই পেশায়ও হাসা যায়।

— আপনি হাসছেন ডাক্তারবাবু, এদিকে আমাদের মরণদশা, আর কি কোন লক্ষণ রয়েছে? আবো লক্ষণ জানতে চান? মাঠে ছেড়ে দিয়ে দেখুন ওর গন্ধ পেয়ে আশপাশের যত কুকুর সব এসে জড়ো হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘিবে ফেলবে।

— তারপর?

— তারপর সবক'টা কুকুব কাঁদতে শুরু করবে।

— এরকম কেন?

— কেন আবার?

— অদ্ভুৎ ব্যাপার?

— হ্যাঁ, অদ্ভুৎ তো বটে। তবে এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। লুই পাস্তুর বলে গেছেন তাঁর নাম নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন। ফ্রান্সেব বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরই প্রথম রেবিজের প্রতিষেধক তৈরী করেন। এজন্যে তাকে পাগলা কুকুরের লালা সংগ্রহ করে ঔষধ বানাতে হয়েছিল, শুধু তাই নয়, এর প্রভাব দেখাব জন্যে তিনি নিজেব জিহ্বায় এক ফোঁটা পাগলা কুকুরের লালা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

— হ্যাঁ শুনেছি, তারপরই তিনি মরে যান।

— না মশাই, বৈজ্ঞানিকরা এত ভীতু নন, ভীতু কাপুরুষরাই বারবার মরে।

— তাই? সত্যি কথা বলছো?

-- কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি, তাহলে -

— তাহলে আমাদের পেশেন্টও মরে যেতে পারে।

— দাঁড়াও। ডাক্তারবাবু জোর দিয়ে বলেন, একথা আমি তোমাকে বলবো না।

— কেন স্যার?

— আগে বলো, কুকুরটা কি মরে গেছে?

— কোন্ কুকুর স্যার?

— যেটা পেশেন্টকে কেটেছে।

— কি-ন্-তু। লোকটার কম্পিত আওয়াজ শুনে ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু কি? তোমরা কি ফোনে খালি গল্পই করবে, এতক্ষণে পেশেন্টকে এখানে নিয়ে আসতে পারতে।

— আমার বন্ধুরা ট্রাকের বন্দোবস্ত করছে, স্যার। প্লীজ আপনি রাগবেন না।

ডাক্তারবাবু ভাবেন, আজকাল বেশীরভাগ খামারবাড়িতে আলু-পেঁয়াজ ও অন্য ফসল বোঝাই করে শহরে পাঠানোর জন্যে ট্রাক কেনা হয়। এখন ফসলের বদলে পাগল বোঝাই হবে। ডাক্তারবাবু মনে মনে ঐ দৃশ্য কল্পনা করে যখন খামারবাড়ির লোকেরা পাগলটাকে ট্রাকের পেছনে ওঠাতে চাইবে আর ও হা হা করে সবাইকে কামড়াতে ছুটবে। আশপাশের কুকুরেরা জড়ো হয়ে ঘেউ ঘেউ শব্দে আকাশ-বাতাস আলোড়িত করবে। আমার আর কী? এখানে ওরা ধরে বেঁধে নিয়ে এলে বড়জোর অ্যান্টিরেবিজ ইঞ্জেকশান দিতে পারি। আমার তো আর হাসপাতাল নেই যে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে পারবো। হাসপাতাল-ওয়ালারা পেশেন্টকে লুটেপুটে এমনকি কাপড় অব্দি খুলে নেয়। আমি তো ইঞ্জেকশানের পয়সা ছাড়া খুব বেশী হলে প্রত্যেক ভিজিটে পঞ্চাশ টাকা নেব। তেমন শেঠিয়া পার্টি দেখলে একশো করেও নিতে পারি। এরকম ভাবতে ভাবতে ডাক্তারবাবু বলেন,

— হ্যালো, পেশেন্টকে তাড়াতাড়ি আনো, এত দেরী করছো কেন?

— কাকে আনবো? এখনো তো কাউকে কুকুরে কাটেনি।

— তাহলে আপনারা আমাকে বিরক্ত করছেন কেন?

— এই ডাইরেক্টরী দেখে নাম্বার লাগাচ্ছিলাম, আপনার নাম্বার লেগে গেল! ভাবলাম আপনার সঙ্গেই একটু গল্প করি।

ডাক্তারবাবু দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে বলেন, ও তাই বলুন। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

— কী স্যার।

— আপনার মাথায় হাত দিয়ে দেখুন তো শিং গজিযেছে কি না?

— এ কেমন কথা স্যার?

— না, অনেকেরই গজায় তো।

— আপনি কি সত্যি সত্যি আমাকে পাগল ভাবছেন?

— আমি তো চিকিৎসক।

— সে তো বটেই, ভয়ঙ্কর চিকিৎসক আপনি।

— কেমন করে বুঝলে, তাহলে পাগলকে নিয়ে এসো।

— এত রাতে?

— হ্যাঁ রাত তো বটেই। ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে বলেন, এখন ঘড়ির কাটা দশের ঘর পেরিয়েছে।

— এ জন্যেই তো এই সময় এত রঙিন, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কে'? বলুন? তারপর লোকটা সিটি বাজায়, পাশাপাশি কয়েকজন পুরুষ ও নারীকণ্ঠের হাসি হুল্লোড় এবং সিটির উল্লাস শোনা যায়।

ডাক্তারবাবু বলেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি তো কেবল রোগের লক্ষণ বলছি, অপরপ্রান্তে লোকটি তখন গর্জন করে ওঠে, যদি নেশায় চুর না হতাম এখুনি তোমাকে দু-ঘা মারতে আসতাম, বেঁচে গেলে শাল্লা।

— আচ্ছা জী ধন্যবাদ। ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে রিসিভার নামিয়ে রাখেন। আর কী করার আছে? তিনি জিনিসপত্র গোছাতে থাকেন।

একটু পরেই একজন আধবয়েসী মাতাল টলতে টলতে ওর ক্লিনিকে ঢুকে জিজ্ঞেস করে,

তুমিই কি সেই ডাক্তার যে কুকুরদেরকে পাগল বানায়?

ডাক্তার উঠে ওর হাত ধরে হেসে বলেন, আবে, আসুন আসুন, বসুন, এতক্ষণ তো আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।

বচনাকলা ঃ ১৯৯৯

গুলজার সিংহ সন্ধু

সম্পর্ক

ও দাড়ি কামাতে কামাতে সামনের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। হয়তো কেউ মারা গেছে। চারপাশের অন্য বাড়িগুলি থেকে এতক্ষণ যে নানা প্রকারের আওয়াজ ওর অফিস যাওয়ার প্রস্তুতিকে বিরক্তিতে ভরিয়ে রেখেছিল সব ওই কান্নার আওয়াজে থেমে যায়। কান্নার রোল মাঝেমধ্যেই উচ্চগ্রামে ওঠে, আবার কখনো ইনিয়ে বিনিয়ে। ইস্তিরিওয়ালার ঠেলা, পাউরুটিওয়ালার সাইকেল আর কেরোসিন বিক্রেতার ট্রাইসাইকেল ঐ বাড়ির সামনে থামতে থামতে এগিয়ে যায়। ডিম-পাউরুটিওয়ালা অর্ধেক হাঁক দিয়ে কী ভেবে থেমে যায়। ঐ বাড়িতে রোজই ডিম-পাউরুটি বিক্রি হয়, কিন্তু আজ ওখানে দাঁড়ালেই লোকসানের সম্ভাবনা। যে কেউ ডেকে বলতে পারে, এই যা তো, টুকরিটা এখানে নামিয়ে বাইবাই করে সাইকেল চালিয়ে ওই পাড়ায় খবরটা দিয়ে আয় তো! মরার খবর বলে মানাও করা যাবে না।

গালে ফেনা তুলে সাবান লাগানোর পর ও রেজার চালাতে থাকে। উপরতলার ফ্ল্যাট বলে বাবান্দার চেয়ারে বসেও পুরো গলিটা দেখা যায় আর সামনের বাড়ির নিচের ফ্ল্যাট থেকে আসা কান্নার আওয়াজ ওকে বিব্রত করে। কোন বাচ্চার কিছু হলো কি? ও প্রতিদিনই ঐ বাড়ি থেকে দু-তিনটে বাচ্চাকে স্কুলের বাসে উঠতে দেখে। আজও কি ওরা সবাই স্কুলে গেছে? অবশ্য দেখে থাকলেও ও বলতে পারতো না যে কেউ বাকী রয়েছে কি না! কেমন করেই বা জানবে? সাধারণতঃ ছাপোষা লোকেরাই প্রতিবেশী বাচ্চাকাচ্চার খবর রাখে। বাচ্চা থাকলেই পাশের বাড়ির বাচ্চারা খেলতে আসে কিম্বা নিজের বাচ্চা পাশের কোন বাড়িতে খেলতে যায়। কিন্তু ওর তো আর এভাবে জানার কোন সুযোগ নেই!

ওর মনে হয়, না, বাচ্চার কিছু হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওর বাবাকে বাইরে ছোটাছুটি করতে দেখা যেত। অবশ্য এরকম হয়নি বলেই কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এমনও তো হতে পারে যে বাচ্চার বাবা ঘরেই নেই, কোন কাজে কোথাও গেছেন, বা দূরে কোথাও থাকেন। ও তো লোকটাকে চেনেই না। আগেই টেঁসে গেছেন কিনা তা-ও জানে না। রোজ সকালে দু-তিনজন মাঝবয়েসী লোক ওখান থেকে স্কুটার স্টার্ট করে। তার মধ্যে একটা স্কুটার খুব আওয়াজ করে। এদের মধ্যেই কেউ হয়তো ঐ ফ্ল্যাটের কর্তা, তাঁর আদৌ কোন ছেলেপিলে আছে কিনা তা-ও তো জানা নেই।

ইতিমধ্যে কান্নার রোল আবার উচ্চগ্রামে। এত গগণভেদী হাহাকারে ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দাড়ি কামানোর পর মুখ দেখতে থাকা আয়নাটা হাতেই ধরা থাকে। এই মহিলার স্বামী মারা গেছেন, না জানি বয়স কত ছিল, তুমি আমাকে ফেলে কোথায় গেলে গো, আমি কার ভরসায় বাঁচবো! ওর এই বিলাপ পরিবেশকে হাহাকারদীর্ণ করে তোলে। এ দুঃখের ভাগ কে নেবে? মহিলা মরে গেলে ভদ্রলোক আবার বিয়ে করে নিতে পারতেন। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে বেশীরভাগ স্ত্রীর দুর্দশার অন্ত থাকে না। বাচ্চাদের হাত ধরে আত্মীয়-স্বজনের দোরে দোরে ঠোকর খেতে হয়।

অবশ্য স্বামীর মৃত্যু, স্বামী-স্ত্রীর দুঃখ বা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আর কী ও ভাবতে পারে? নিজের মা-বাবা আর ওর দেখা কয়েকজন আত্মীয়ের দাম্পত্য জীবন কলহময়। কেউ ঘরে এলে ওরা পরস্পরের সঙ্গে হেসে কথা বললেও জানতো সব লোক দেখানো। এইসব দেখে শুনে ওর মনে দাম্পত্য জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে বলেই হয়তো বিয়ের প্রতি ওর আযৌবন অনীহা ওকে আজ পঞ্চাশের কোঠায় ঠেলে দিয়েছে। এখন আর বিয়ে করে কী হবে।

আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এখনও বলিরেখা তেমন পড়েনি। কিন্তু গালের চামড়া ভালই ঝুলে পড়েছে। আরে ঠোলু, গরম জলটা বাথরুমে দিয়ে যাতো, আমার স্লেটরঙের স্যুটটা ইস্তিরি করিয়ে আন!

নিজেকে এমনভাবে বলতে শুনে ভাবে, যেন ইস্তিরি করা স্যুট পরলেই ঝুলে পড়া চামড়া টানটান হয়ে পড়বে! ও মুচকি হাসে। তখুনি আবার কান্নার রোল তীব্র হলে জিজ্ঞেস করে, কে কাঁদছে রে, কে মরেছে? জবাবে ঠোলু মাথা চুলকে বলে, সামনের বাড়ির সাহেবের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সাহেব! কে জানে মরেই গেলেন কিনা! মেম সাহেবের কান্না শুনে তো সেরকমই মনে হচ্ছে!

বাচ্চাটাচ্চা?

বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, তখনই অঘটন।

আচ্ছা যা, গরম জলটা দিয়ে যা!

ঠোলু নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ও হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভাবে। ওর নিজেরও তো এমনটি হতে পারে। ঠোলু বলেছে বাথরুম থেকে বেরোতেই নাকি বেচারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই হৃদযন্ত্রের কী ভরসা! ছোটবেলায় একবার দোলনায় চড়ে ওর ভীষণ বুক ধড়ফড় করেছিলো। যৌবনে যেদিন অন্য কারো সঙ্গে প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যায় সেদিনও ওর ভীষণ বুকব্যথা ও মৃত্যুসম কষ্ট হয়েছিলো। সেসময়ই একদিন দিল্লী থেকে তাজমহল দেখতে যাওয়ার পথে মথুরা রোডে কারো সঙ্গে পাল্লা করে জোরে স্কুটার চালাতে চালাতে হঠাৎ গতি কমিয়ে পেছনের জনকে এগিয়ে যেতে দিয়ে রাস্তার পাশে দম নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে ভাবে, কী হবে পাল্লা করে চালিয়ে, বেকার মৃত্যুকে ডেকে এনে কী লাভ?

একটা অস্বস্তিতে ও বুকে হাত দেয়। একী, সেরকমই একটা ব্যথা চিনচিন করে বুকে-পিঠে ঘাই দিচ্ছে যে! ও কী ভেবে টেলিফোনটাকে দরজার সামনে রেখে বাথরুমে ঢোকে। ঠোলু ওকে গরম জল দিয়ে স্যুট ইস্তিরি করতে চলে গেছে। এখন কিছু হলে? ঘরে তো আর কেউ নেই যে......! ও ছিটকিনি খোলা রেখেই গায়ে জল ঢালতে থাকে। গায়ে জল ঢালার সময়ও টেলিফোনের দিকেই তাকিয়ে থাকে। যেন স্টুলটায় কোন টেলিফোন নেই, একজন ডাক্তার বসে আছেন! তেমন কিছু হলে.......!!!

তখনই প্রতিবেশীর বিড়ালের বাচ্চাটা জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে এসে টেলিফোনটার পাশে গুটিসুটি মেরে বসে। চুপচাপ। চেহারা দেখে বোঝা যায় আজ ওর পেটে খিদে নেই। হয়তো বাড়ি থেকেই পেটভরে খেয়ে বেরিয়েছে। নয়তো সবসময় 'মিয়াঁও মিয়াঁও' করতে করতে এ ঘরে আসে

আর ও যা দেয়, পাউরুটির পিস, ওমলেটের টুকরা অথবা সামান্য মাংস লেগে থাকা হাড্ডি - চোখের পলক পড়ার আগেই সব নিঃশেষ করে দেয়। ওভাবে, তোমরা খাওয়াতে পারো না তো পুষেছো কেন? অথচ বিড়ালটার তেমন চাহিদা নেই। নিজে থেকে যা-ই দেবে তা খেয়ে আর চাইবে না।

আজ বিড়ালটা উদাস চেহারা নিয়ে বসে আছে। এত চুপচাপ যে ও কিছু খেয়েছে কি খায়নি তা বোঝার কোনই উপায় নেই। হয়তো সামনের বাড়ির কান্না ও বিলাপে ঘাবড়ে গেছে। এত জোরে কান্নার কি আছে? যত জোরেই কাঁদো না কেন, যে চলে গেছে সে তো আর ফিরবে না! বিড়ালের বাচ্চাটিকে এমন স্বভাববিরুদ্ধ গুটিসুটি বসে থাকতে দেখে ওর কষ্ট হয়। বুকের ব্যথাটাও আর টের পায় না।

ঠোলু স্যুট ইস্তিরি করে ফিরে আসার আগেই ওর স্নান হয়ে যায়। আয়নায় নিজেকে দেখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, চোখ দু'টিও সমান উজ্জ্বল। সামান্য ঝুলে পড়া চামড়া নিয়েও ওর কোন অস্বস্তি হয় না। বয়সের সঙ্গে সবারই একদিন চামড়া-মাংস সব ঢিলে হয়ে ঝুলতে শুরু করে। ইস্তিরি করা স্যুট পরার পর চেহারার সামান্য ঢিলেঢালা ভাবটাও নিমেষে উধাও। ওর ভাল লাগে। ভাল ফিটফাট পোষাক পরলে মানুষের বয়স কমে যায়। মন চনমনে থাকে।

পনের বছর আগে আকাশবাণীতে চাকুরী নেওয়ার কিছুদিন পব এই স্যুটটা নতুন বানিয়ে স্টুডিওতে গেলে একটি লাজুক মেয়েও ওর প্রশংসা না করে পারেনি। অন্য সহকর্মীদের তাক লাগিয়ে ও বলে ওঠে, আপনার স্যুটের রঙটা এত সুন্দর আর কাপড় এত মোলায়েম যে ওর পকেটে হাত ঢোকাতে ইচ্ছে করে। যেন ও বলছে, ইচ্ছে করছে জাপটে ধরে আদর করি।

যাক সেসব কথা। ঐসব স্মৃতি নিয়েই তো বেঁচে থাকা! ওর থেকে কম বয়সী লোকেরাও তো পটল তোলে! ঠোলুব বর্ণনা অনুযায়ী সামনের বাড়ির প্রয়াত ভদ্রলোকের বয়সও কেবল চল্লিশেব কোঠা ছুঁয়েছিল। এত শক্তসমর্থ এবং আত্মবিশ্বাসপূর্ণ ছিল যে কুড়ি বছর চাকুরী করেও জীবন বীমা অব্দি করায় নি। অথচ কুড়ি বছরেও ওর চাকুরী স্থায়ী হয়নি। নির্দিষ্ট কোন অফিসে থাকলে অনেক আগেই স্থায়ী হয়ে যেত। কিন্তু আরো পদোন্নতি, আরো ভাল মাইনের খোঁজেও দু-তিন বছর পর পর অফিস পাল্টেছে। নিজের কিছু জমানো টাকা ছাড়া কোথাও কিছু নেই। এখন বউ বাচ্চার কী হবে, কে জানে? ও ভাবে, সবাই ঘুরে এসেছে, যাই আমিও দেখে আসি!

কিন্তু ওখানে কেউ চেনে না যে! এক এই বিড়ালটার মালিক সহকর্মী বলে ওকে চেনে। সকালবেলাই তিনি আকাশবাণী ভবনে চলে গেছেন। এখন নিচে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলবে? পাশে দাঁড়ানো কেউ কোন কাজের কথা বলে দিলে? ওখানে তো আর কাজের অভাব নেই। শ্মশানঘাটের কর্মকর্তাদের থেকে দাহসংস্কারের সময় নেওয়া, শবাধার-ঘড়া-ধূপ-ধুনো-চন্দনকাঠ ইত্যাদি জোগাড় করা; আরো কত কাজ! এই তো কিছুদিন আগে এক বন্ধুব অনুপস্থিতিতে ওর বাবা মারা গেলে দাহসংস্কারের যাবতীয় হ্যাপা ওকেই সামলাতে হয়েছে। সেখানে পুরুত ও ডোমদেব কথার বাইরে একচুলও যাওয়ার উপায় নেই। ও ইলেকট্রিক চুল্লীর পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু বন্ধুব স্ত্রীর ঘোর আপত্তি থাকায় সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু এখানে ওকে কেউ চেনে না। এ বাড়ির লোকেরাই ক'জন চেনে? কখনো কখনো লিফ্ট কিম্বা সিঁড়িতে ওঠানামার সময় কেউ মাথা ঝাকিয়ে অভিবাদন জানালে সে-ও মুচকি হেসে মাথা ঝাকায়। ওর চাকুরীও এমন নয় যে কারো দরকার পড়বে। ফলতঃ কারো সঙ্গেই তেমন মিল - মহব্বত গড়ে ওঠেনি। লোকও তো কম নয়! চার হাজার গজেরও কম জায়গায় ছয়টি সাততলা ব্লক, প্রত্যেক ব্লকে বারো থেকে ষোলটি ফ্ল্যাট, আর কোন ফ্ল্যাটেই পাঁচ ছয় জনের কম লোক থাকে না। ক'জন আর ওর মতন একা থাকে! বড়জোর পনেব কুড়িজন! কার কার সঙ্গে মিল মহব্বত করবে?

এই বয়সে স্বার্থহীন মেলামেশা অবান্তর প্রায়। ও একমনে কার্জন রোডের দিকে তাকিয়ে সারি সারি যানবাহণের যাওয়া-আসা দেখতে থাকে।

একটু থেমে থেমেই উচ্চকিত কান্নার রোল ওকে আনমনা করে দেয়। ছোট ছোট তিনটে বাচ্চা নিয়ে বউটা কী করবে? গত সপ্তাহে এ পাড়ার ডিমওয়ালা ভদ্রলোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেলে ও ভেবেছিল, এখন ডিম কে বেচবে? কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যেই যে ছেলেটা দোকানে বসতো, সে ডিমের সাইকেলটা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে আর তার ছোটটা দোকানে বসতে শুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওদের রথের চাকা আবার আগের মতনই ঘুরতে শুরু করে। কিন্তু এই চাকুরীজীবীর বিধবা তাঁর প্রভিডেণ্ড ফান্ডে জমানো কিছু টাকা ছাড়া আর কত পাবে? আত্মীয়স্বজনের দোরে দোরে ঘুরবে আর ঘাড়ধাক্কা খাবে। স্বামীর অস্থায়ী চাকুরীর, উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণাম ভুগবে। হয়তো এই মহিলাই স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুঘটক। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, কী আর করা যাবে!

ব্রেকফাস্ট সেরে ও মানুষসমান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আপাদমস্তক দেখে। কোটের কলারে একটা গোলাপের কুঁড়ি গুঁজে নেয়। তখনই পায়ের কাছে কিছু নড়ে উঠলে দেখে বিড়ালের বাচ্চাটা টলোমলো পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। অবাক হয়ে দেখে একজন মানুষের মৃত্যু ও বিলাপে স্তব্ধপ্রায় পরিবেশে বিড়ালটাও কেমন প্রভাবিত। ও কোটের কলারে লাগানো গোলাপের কুঁড়িটাকে আলতো ছুঁয়ে ভাবে, আজ অফিসে না গিয়ে আকাশবাণীর স্টুডিওতে গিয়ে সেই পরিচিত মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে আসে। একমাত্র ওর চেহারাতেই সে কখনো দুঃখের ছায়া দেখেনি। বিয়ের পর ওর লাজুক ভাবটাও কেটে গেছে। বিয়ের আগে সে-ও ছিল বিয়ে বিরোধী। যতদিন চাকুরীতে আছি কোয়ার্টার পাবো, মা-বাবাকেও প্রয়োজনে সঙ্গে রাখা যাবে। চাকুরী শেষ হলে পেনশান ও পি এফ-এর জমানো টাকা দিয়ে একটা বড় বাড়ি বানানো এমন কঠিন নয়। বাড়ি হলে ভাড়াটেও পাওয়া যাবে, ওদের বাচ্চাকাচ্চা থাকবে; একেবারে ভরাট সংসার। ওর কথায় উপস্থিত সহকর্মীরা হেসে ফেলতো। কিন্তু মেয়েটি সিরিয়াস। ও বুঝতে পারতো না কথাগুলি ওকে ব্যঙ্গ করে বলছে কিনা। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলে ও হেসে সিদ্ধান্ত বদলের কারণ জিজ্ঞেস করলে দুষ্টুমিমাখা দৃষ্টি দেখেই বোঝে সত্যি সত্যি ও একদিন ব্যঙ্গ করেই বলতো। এখন হেসে বলে, সবাই কি আপনার মতন বোকা? এখনো সময় আছে, মিষ্টি দেখতে কাউকে বিয়ে করে ঘর বসান!

এরপর একদিন ওর স্বামীর সঙ্গেও পরিচয় করায়। খুব মানিয়েছে, একেবারে মেড ফর ইচ আদার! ওদেরকে দেখে মনে এত আলোড়ন জাগে যে নিজেকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়। না জানি কেন সেদিন ঘরে ফিরে বুক ব্যথা করে।

আজ অনেকদিন পর সেই হাসিখুশী বউটিকে দেখতে ইচ্ছে করে। এই হতাশ শোকগ্রস্ত পরিবেশে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয় ওই লাস্যময়ীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলেই সে আবার তরতাজা হয়ে উঠবে। আগেও এমনি অনেক হতাশ সময়ে ওর কাছে গিয়ে, ওর হাসিমুখ দেখে নিজেকে নতুন করে ফিরে পেয়েছে। তাই সে এখন আকাশবাণীর স্টুডিওতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

ও ঘর থেকে বেরোনোর জন্যে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। পা ভারী ঠেকে, যেন কম্বল জড়ানো। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে বিড়ালের বাচ্চাটা কখন নিঃসাড়ে গুটিসুটি মেরে ওর পায়ের উপর এসে বসেছে। হয়তো মেঝেতে ওর ঠাণ্ডা লাগছে। পরিবেশে থেকে থেকে কান্নার রোল। মহিলার জন্যে কষ্ট হয়। কিন্তু কী করা যাবে! সে তো এ-ও ঠিকঠাক জানে না কে মারা গেছেন। কাল সকালে কোন একজনকে স্কুটার নিয়ে বেরোতে না দেখলেও ঠিক মনে করতে পারবে না। এই মৃত ব্যক্তির আদৌ স্কুটার ছিল কিনা তাও জানা নেই। যারা ঐ বাড়িতে ভীড় করেছে সবাই কি লোকটাকে চিনতো? ওদের ভীড়ে মহিলার হাহাকারদীর্ণ শীতলতা বিন্দুমাত্রও

দূর হবে কি?

বিড়ালছানাটি ঠাণ্ডা মেঝে থেকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বিছানা খুঁজে নিয়েছে। এ-ত-ক্ষ-ণ, না জানি কতক্ষণ একভাবে ওর পা জড়িয়ে বসে থাকায় বিড়ালটার শরীরের ওমে ওর জুতোর চামড়া অব্দি তেতে উঠেছে—আরাম লাগছে। পশুরাও কত বোঝে, কেমন করে উষ্ণতা খুঁজে নেয়।

এমনি হুলোটাকে আশ্রয় ও উষ্ণতা দিতে পারার অনুভূতি ওর মনেও একপ্রকার উষ্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। ও ভাবে, থাক, এমনি বসে থাক্ হুলোটা। অফিসে না গিয়ে, আকাশবাণীর স্টুডিও যাওয়ার প্রবল ইচ্ছেটাকেও ভুলে গিয়ে ও এখন শুধু শরণাগত বেড়াল শিশুটাকে উষ্ণতা দিতে চায়। নাকি নিজেই এভাবে উষ্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরা কী মূর্খ। ঠিক মতন খাবার তো দেয় ই না, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে এইটুকু আশ্রয়ও বিছিয়ে দেয় না। অথচ ওদের কিসের অভাব? আসলে কাউকে উষ্ণতা দিলেও যে উষ্ণতা পাওয়া যায় তা বোধ হয় ওদের জানা নেই। অথবা ওদের এহেন উষ্ণতার প্রয়োজনই নেই। ওরা তো আর ওর মতন একা নয়!

সে কিন্তু বিড়ালছানাটিকে কোনদিন অযত্ন করেনি। কখনো খালিমুখে চলে যেতে দেয়নি। এখন আয়নার সামনে স্টুলে বসে ও নিচু হয়ে বিড়ালটার পিঠে হাত বোলায়। ওর পেলব স্পর্শে হঠাৎই আবার আকাশবাণীর স্টুডিওতে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করে। ও ঠোলুকে ডেকে দরজা জানালা বন্ধ করতে বলে। বিড়ালছানাটাকে বাইরে রাখবে বলে কোলে তুলে দেখে ওটা মরে গেছে। ও আৎকে উঠে বলে, ঠোলু-রে!

ঠোলুও অবাক কিছুক্ষণ দু'জনেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই ওটাকে উঠিয়ে বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে প্রতিবেশীর চাকরকে খবরটা দেয়। ওদের বাড়ির চাকর বলে, ফেলে দে, আজ সকালেই মালকিন ওর খাবারে বিষ দিয়েছে, ঘরে এত ছোট বাচ্চা! বিড়ালছানাটা প্রায়ই খেলতে চায়। কখনো আঁচড়ে লেগে গেলেই মহাবিপদ, তাই........!!

ওদের কথা শুনে সে উঠে গিয়ে বিড়ালটাকে আবার কোলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ওর শরীর এখনো পুরো ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। পশমীনা কম্বলের মতন রোয়াগুলোকে হাত বোলাতে বোলাতে ওর চোখে জল চলে আসে। আয়নায় ওর মৃতদেহের পাশে নিজের কোটের গোলাপ কুঁড়িটা বেমানান লাগে। ও কলার থেকে কুঁড়িটাকে খুলে দূরে ফেলে দিয়ে আরামকেদারায় বসে পড়ে।

এতদিনে হয়তো আকাশবাণীর বউটি ওকে ভুলে গেছে !!

রচনাকাল: ১৯৮২

মোহন ভাণ্ডারী

ঘোটনা*

কিশ্‌না বঢ়ই-এর মনে মেঘের ঘনঘটা। ওর ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে, না জানি কতক্ষণ লাগাতর কাঁদলে তবেই ওর বুকটা হাল্কা হবে।

ছুটির দিন। সকাল থেকেই মুখোমুখি বসে কিশ্‌না আর তাঁর মেয়ের জামাই মদ খাচ্ছে। কিন্তু কারোই নেশা হচ্ছে না। অবশেষে কিশ্‌না উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। জামাই ওকে থামায় না। ও জানে, কিশ্‌না এভাবে থামার লোক নয়। ও সোজা গিয়ে দোকান থেকে নতুন বোতল নিয়ে ফিরবে। আগেও অনেকবার ও এমন করেছে। নেশা না হলে চুপচাপ উঠে গিয়ে আনকোরা বোতল নিয়ে আসে আর মাঝরাত অব্দি আকণ্ঠ গিলতে গিলতে ছুটির দিনটা ফুরিয়ে যায়।

সেদিন কিশ্‌নার খুব মন খারাপ। জীবনে কোনদিন এত খারাপ লাগেনি। পেকে ওঠা ফোঁড়াব মতন দুঃখের পুঁজ ওকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। জামাই-এর এত বৈভব, ধনদৌলত যে দুনিয়ার যেকোন সুখ-আরাম ও যেকোন মুহূর্তে কিনে আনতে পারে। কিন্তু ও শ্বশুরের জন্য একরত্তি নিষ্কৃতিও কিনতে পারে না।

তাই জামাই হয়রাণ।

তাই মেয়ে বিপন্ন। আর কিশ্‌নার মুখ অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে, অনেক অনেক কাঁদলে বুঝি বুকটা হাল্কা হবে।

এ সময় ওর বউ-এর কথা মনে পড়ে, ছেলেটার কথা মনে পড়ে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বউ মারা গেছে। ছেলেটা তো ছোটবেলাতেই মরেছে। এখন এই বিশাল দুনিয়ায় এক মেয়ে আর তার জামাই ছাড়া ওর আর কেউ নেই।

একদিন এই জামাই-ই ওকে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে শহরে নিয়ে এসেছে। সেই সন্ধ্যায় শহরের হৈ-হট্টগোল, ইলেকট্রিকের তীব্র আলোর মালা ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সবাই ছুটছে, হাঁপাচ্ছে, চোখমুখে আতঙ্ক, আগুন লাগলে মানুষ যেমন সন্ত্রস্ত হয় তেমনি ব্যস্ততা। ওর পরণে নতুন কড়কড়ে জামাকাপড়। অথচ ভীষণ অস্বস্তি—মনে হয় যেকোন সময় জামাকাপড়গুলি শরীর থেকে পিছলে পড়বে আর ও সবার সামনে নগ্ন হয়ে পড়বে! এত শব্দ ও ব্যস্ততায় ওর পা টলোমলো। মাথা থেকে পা অব্দি ঘামে জবজবে। দুই পা বেয়ে অস্বস্তিকরভাবে ঘামের ধারা নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি অস্বস্তিময় দিনটি ও কেমন করে ভুলবে?

তারপর পাঁচ পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনে ও জামাই এর মনজয় করে নিয়েছে। পুরো কারখানা এখন ও একাই দেখাশোনা করে। এখন অব্দি যত বেচাকেনা করেছে, জামাইকে লোকসানের মুখ দেখতে হয়নি। মেয়ে তাই গর্বিত। জামাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গত কয়েক বছরে ও এত দড়সড় হয়ে উঠেছে যে আজকাল দরাদরিতে অনেক বড়দেরকেও মাৎ করে দেয়। সেজন্যেই জামাই ওকে ছাড়তে চায় না। প্রত্যেক ব্যবসায় কিছু কূটকৌশল থাকে যা সবাইকে বলা যায় না। উপরন্তু কিশ্না ওর শ্বশুর। একমাত্র মেয়ের জামাই এর কোনরকম অনিষ্ট তো সে হতে দেবে না! সেজন্যে ও শ্বশুরকে যেনতেন প্রকারেণ খুশী রাখার চেষ্টা করে। এক কথায় হাসিমুখে গোছা গোছা টাকা বের করে দিতে চায়। কিন্তু টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায়? মনের শান্তি তুমি কোন্ দোকানে পাবে? ওর জামাই শহরের সবচাইতে বড় কারখানার মালিক, সবচাইতে বেশী ধনী। তবুও শ্বশুরকে শান্তি এনে দিতে পারে না। কিশ্নার ভীষণ মন খারাপ। সৃষ্টি সুখ বিজড়িত অতীত ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

.... গ্রামের শেষপ্রান্তে বাড়ি। সামনে ছোট উঠোন। উঠোনে এক ঝাকড়া ঘন পল্লবিত শহতুত গাছ। শীতল ছায়া। মাথায় খদ্দরের পাগড়ি বেঁধে খালি গায়ে বসে বসে ও একমনে ঘোটনা বানাতো। কপালের ঘাম নিংড়ে নিজের মনের মতন কারুকার্যমন্ডিত করতো। কেউ দেখা করতে এসে বলতো, ওরে কিশ্নে শ্বশুরের পুৎ, কিসের জন্য দিনরাত লাগাতর খেটে মরিস? এই গরমে দু-দন্ড জিরিয়ে নে। দ্যাখতো, কেমন জবজবে হযে ঘেমেছিস।

কিশ্না হেসে জবাব দিত, ওরে ভালমানুষ, কাজই মানুষের আসল ধর্ম। কাজ করতেথাকলে মন শান্ত থাকে, শরীর থাকে নিষ্পাপ শুদ্ধ সোনা। সঠিক পরিশ্রমের বহিঃপ্রকাশই হলো, ঘাম। ঐ গল্পটা শোনোনি?

আগন্তুক এগিয়ে আসে। কিশ্না গল্প শুরু করে। একবার এক দেবতা পৃথিবী ঘুরতে এসে বেকায়দায় পড়ে। তাঁর ভীষণ গবম লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গলা শুকিয়ে কাঠ। তখন খরা। নদী-নালা-পুকুর-কুয়ো সব শুকিয়ে গেছে। পরীরা দেবতার কষ্ট দেখে দূরের পাহাড় থেকে কিছু কুয়াশা এবং অরণ্য থেকে ফুলের মধু আহবণ করে আনে।

কিন্তু এসব খেয়ে দেবতার তৃষ্ণা মেটে না। পরীরা আবার জলের খোঁজে বেরোয়। কিন্তু ততক্ষণে পাহাড়ে ঘাসের বুক থেকে কুয়াশা শুকিয়ে গেছে। ফুলের মধুও প্রজাপতি এবং মৌমাছিরা নিয়ে গেছে। ইতস্ততঃ উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ওরা একটা গাছের নীচে কিছু ভেজা কাপড় দেখতে পায়। ওরা একটা পাত্রে সেই কাপড় নিংড়ানো জল নিয়ে উড়ে গিয়ে দেবতাকে সব খুলে বলে। দেবতার তখন এত শোনার সময় নেই, তিনি ঢকঢক করে সেই জল আকণ্ঠ পান কবে পরিতৃপ্ত হন। তারপর পরীদেবকে বলেন, এত সুস্বাদু পানীয় আমি কোনদিন খাইনি। এ যেন চরণামৃত থেকেও বেশী স্বাদ! যেখান থেকে এই জল পেয়েছ সেখানে নিয়ে চলো।

দেবতা ও পরীরা সেখানে পৌঁছে দেখে ঐ কাপড়গুলি আর নেই। কাঠুরেরা নিজেদের জামাকাপড়ের ঘাম শুকিয়ে যেতে দেখে সেগুলি পরে লাকড়ি মাথায় হাটে পৌঁছে গেছে। দেবতা অবাক হয়ে বলেন, সে জন্যেই এত স্বাদ, ঘামের মতন সুস্বাদু আর কিছু হয না!

কিশ্নার গল্প শুনে আগন্তুকও লজ্জা পায়। কিশ্না ওর কাঁধ থপথপিয়ে বলে, বুঝলি বাপ্, যে ঘাম দেখে তুই নাক সিঁটকাচ্ছিস, দেবতারাও এর জন্যে তৃষ্ণার্ত থাকেন!

আগন্তুক মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। কিশ্না আবার বাটালিব সুক্ষ আঁচড়ে ঘোটনার কারুকার্যগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে থাকে।

হাতের কাজ সেরে গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে সে গ্রামে বেরিয়ে পড়ে। কারো খাট-পালঙ্ক সারায়, নতুন হাত-পা জুড়ে কারো চেয়ার কিম্বা আরাম কেদারা একেবারে নতুন করে দেয়। কাউকে পিড়ি

বানিয়ে দেয়, কারো যাঁতায় ধার দিয়ে দেয়, চরকার মুন্নি পাল্টায়, বাচ্চাদের জন্যে গুল্লি-ডান্ডা বানিয়ে দেয়, খেলতে খেলতে বাচ্চারা গুল্লি হারিয়ে ফেললে আবার বানিয়ে দেয়। এভাবেই নিজেকে নিয়ত ব্যস্ত রাখে।

ঘরে ফেরার পথে পুরুষ কিম্বা মহিলা যার সঙ্গে দেখা হোক না কেন, ও কুশল বিনিময় করে। কেউ কাজের বদলে ফসল দেয়, কেউ গুড় দেয়, কেউ এক গ্লাস দুধ খাওয়ায়, আবার কেউবা — এই দেওরা! বলে চোখ মারে।

খুশীতে ডগমগ হয়ে ও আরো কাজ করে। উঠোনে বসে ঘোটনা তৈরী করছিলো, বচনের ছেলে মেলু খেলতে খেলতে এত জোরে গুল্লিটাকে ডান্ডা দিয়ে মারে যে গুল্লিটা বনবন করে এসে কিশ্‌নার কপাল ফাটিয়ে দেয়। গবগব করে রক্ত বেরিয়ে ওর মুখ-বুক ভেসে যায়। ও অন্ধকার দেখে। মেলুর মা করতারো দৌড়ে আসে। ও নিজের আনকোরা ওড়নাটা ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে কপালে বেঁধে দেয়। কিশ্‌না হতভম্ব।

একটু পরেই গ্রামের কবরেজের কাছ থেকে হলদি, চন্দন, ফটকিরি ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরী মলম এনে লাগিয়ে আবার পট্টি বেঁধে দেয়। এরপর থেকে বেশ কয়েকদিন ও নিয়মিত এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসতো আর মলম পট্টি লাগিয়ে ফিরতো।

দীর্ঘদিন ধরে কিশ্‌নার মনে ঐ সাহচর্যেব স্মৃতি পল্লবিত হয়। উঠোনে বসে ঘোটনা বানাতে বানাতে প্রায়ই ভাবে এই বুঝি আবার মেলুব গুল্লি উড়ে এসে ওকে রক্তাক্ত করে দেবে আর করতারো দৌড়ে এসে ওড়না ছিঁড়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ওর কপালে পট্টি বাঁধবে, তারপর আবার মলম নিয়ে এসে নরম হাতে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে আবার পট্টি বেঁধে দেবে।

করতারোর কথা ভাবতে ভাবতে ঘোটনাব শরীর মিহি শিরিষ কাগজের ঘর্ষণে মসৃণ হয়ে ওঠে, হাত পিছলে পিছলে যায়। এতে ঘোটনার গায়ে খোদাই করা ফুলগুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। ওর ঘোটনার সুনাম দূরদূবান্তের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্য গ্রামের লোকেরা এই গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যেভাবেই হোক একটু সময় ওর শহতুত গাছের নিচে এসে দু'দন্ড জিরিয়ে নেয়। ওর সঙ্গে গল্প করে, যাওয়াব সময় নিদেন পক্ষে একটা ঘোটনা কিনে নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে ওর কারুকার্যের প্রশংসা করে, কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট, কোন্ মন্ত্রীর ঘরে কিশ্‌নার ঘোটনা গেছে সেসব গল্প করতে করতে ওরা বাড়ি পৌঁছে যায়।

বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে মেয়েবা যদি দেখে পণেব সামগ্রীতে কিশ্‌নার তৈরী নকশাদার ঘোটনা নেই তাহলে তাদের মুখভার হয়ে যায়, রুটি খায় না। পণসামগ্রী দেখতে আসা প্রতিবেশিনীরা থুতনিতে হাত রেখে বলে, মেয়েকে কী ছাই দিয়েছে, পণেব আসল সামগ্রী ঘোটনাই রাখেনি।

এরকমই এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে গোসা করে বসে থাকলে গ্রামে ভীষণ চর্চা হয়। মানুষ হাতের কাজ সেরে আড্ডায় বসে সেই মেয়ের গোসাব চর্চা কবে। সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতাব গল্প শোনায়। গজন নামক চারণ কবি গান বানিয়ে কানে হাত দিয়ে নিজস্ব রাগিনীতে গাইতে থাকে, — তাবে, তাবে, তাবে'/বাহমণাঁ দী ঘী রুস গী, / জদোঁ তুরন লগী মুকলাবে/ দাজ বিচ ঘোটনা নহীঁ, / ঝোরা ওহদয়াঁ/ তেরী সিফত কবী ন জাবে।/ নিম্ম দিয়া ঘোটনায়া.....ব্রাহ্মণের মেয়ে পণের জিনিস দেখে গোসা করে, পণেব মধ্যমণি ঘোটনা নেই দেখে ওব রাগ হয়, ঘোটনার বদলে পণের ডালায় খাটের পায়া রেখে বাপ্ ধোঁকা দিয়েছে। হায়রে নিমের ঘোটনা! তোর অপার মহিমা!

গান শুনে কিশ্‌না বড়ই আনন্দে নেচে ওঠে। ও গজনের পিঠ চাপড়ে নিজের কোমরে রাখা খদ্দরের থলে থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ওকে উপহার দেয়। উপস্থিত সবাই হাততালি দিয়ে অভিবাদন করে।

এমনি সব ছোট ছোট ঢেউ খুশী ও সামান্য অভিমানে কারুকার্যময় ছিল কিশ্‌নার জীবন, ছোট ছোট ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়া নৌকার মতন, যাকে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঢেউ এসে ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় নেই। সুখ-দুঃখের ঢেউ-এরা শুধু দুলিয়ে যায়। ও দোলনার মতন জীবন নৌকায় দুলতে থাকে।

কিন্তু একদিন সেই শান্ত জলে ঝড় আসে। হঠাৎ ওর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে ও উত্তাল ঢেউয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। গ্রামের কবিরাজ থেকে শুরু করে জেলা সদরের বড় হাসপাতাল অব্দি দৌড়ঝাঁপ করেও কোন লাভ হয় না। কিশ্‌নার অহোরাত্রি সেবা বৃথা যায়। একদিন ও কিশ্‌নাকে এত বড় দুনিয়ায় একা ছেড়ে চলে যায়। কিশ্‌না একে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়ে পুরো দুঃখের নদীকে আকণ্ঠ পান করে। নিজেকে আবার কাজে ফিরিয়ে আনে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখে। এভাবেই অনেক কষ্টে ধীর ধীরে ও জীবনের গতিকে আবার সহজ লয়ে ফিরিয়ে আনে।

তখনই একদিন ওর মেয়ের জামাই এসে ওকে পটিয়ে পাটিয়ে শহরে নিয়ে আসে। তারপরও পাঁচ-পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেছে। এখন ও মেয়ের জামাই-এর চোখের মণি । ও এখন কোন কাজই শ্বশুরকে জিঞ্জেস না করে করে না।

কিশ্‌না গদীতে বসে ভাবতে থাকে। অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে আর কারখানার কর্মচারীদের উপর নজর রাখে। এসব কাজে আবার পরিশ্রম কি? যে কাজে শরীর থেকে ঘাম বেরোয় না তাকে ও কাজ বলেই মেনে নিতে রাজী নয়। অন্যের কাজের নজরদারী করাকে যারা কাজ ভাবে সে ওদেরকে মূর্খ ভাবে।

এসব অকাজ ও কর্মহীনতা ওকে প্রায়ই ভাবুক করে তোলে, এই ভাবনার বাষ্প জমতে জমতে ওর মনে দুঃখের মেঘ ঘনীভূত হয়, ও আড়মোড়া ভাঙ্গে, ওর পেশী, হাড্ডি ও মজ্জা শিনশিন করে, মাথা ঘোরায়, বারবার হাই ওঠে, চোখ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

ক্রমশঃ ও এই জীবনের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে।

ওকে খুশী রাখার জন্যে জামাই জলের মতন খরচ করতে রাজী। কিন্তু হাজার হাজার টাকা দিয়ে কেনা আরাম আয়েসের কোন উপক্রমই ওকে খুশী করতে পারে না। কোন কিছুতেই ওর লোভ নেই। ও কেবল এক মুহূর্তের শান্তির জন্যে আকুল।

অগত্যা জামাই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু ওর নাড়ি দেখেন, জিভ দেখেন, সারা শরীর পরীক্ষা করে কিছুই বুঝতে না পেরে ওকেই জিঞ্জেস করেন,

— কী হয়েছে আপনার?

— ব্যস জী, মন উচাটন থাকে, মাঝেমধ্যে দমবন্ধ লাগে, হাসফাঁস করি। কিন্তু মনটা খুলছেই না। যেন আমার ভিতরে কিছু ঘাটতি

— বুঝেছি, বুঝেছি মশাই। ডাক্তারবাবু বলেন, — আপনার শরীরে ভিটামিন 'বি'র অভাব, এক ফাইল ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খান লিখে দিচ্ছি, চিন্তা করবেন না, সেরে যাবে।

কিশ্‌না সুবোধ বালকের মতন মাথা নাড়ে। তারপর চেম্বার থেকে বেরিয়েই হেসে ফেলে, শশালা, এই প্রথম জানলাম মন শান্ত করারও ঔষধ রয়েছে। অনেকদিন পর ওকে হাসতে দেখে জামাইও হেসে ফেলে। তারপর ওকে নিয়ে এক বিলিতি মদের দোকানে দামী হুইস্কি ও রামের বোতল কিনে বাড়ি ফেরে। একমাত্র এটা খেয়েই মানুষ কিছুক্ষণের জন্যে বাদশা হয়ে পড়ে, অনেক গভীর দুঃখ ভুলে থাকে। জামাই ভাবে, — একমাত্র মদের নেশাই হয়তো শ্বশুরকে অজানা দুঃখবোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে!

সেদিন কারখানা ছুটি। কিশ্‌না আর তাঁর জামাই সামনাসামনি বসে সমস্ত দুঃখবোধ থেকে

মুক্তি পেতে রঙিন বলিতি পানীয় খাচ্ছে। হঠাৎ কিশ্‌না উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। হয়তো নতুন বোতল আনতে গেছে।

জামাই খুশী। কিন্তু বড় বেশী দেরী করে ফেলছে মানুষটা। মদের দোকানে গিয়ে ঘুরে আসতে তো এতক্ষণ লাগার কথা নয়। ও শুয়ে শুয়ে ভাবে, কী হলো?

আরো কিছুক্ষণ পর দুশ্চিন্তার পারদ চড়চড় করে চড়তে থাকে। ও ভাবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে না ফিরলে আমি উঠে গিয়ে দেখবো। তখনই বাইরে থেকে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ আসে। জামাই পাশ ফেরে। বাইরে আবার ঠক ঠক। শ্বশুরমশাই হয়তো বোতল নিয়ে ফিরেছেন। জামাই খুশী হয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলেই হা হয়ে যায়।

বাইরের উঠোনে কিশনা বড়ই মদে চুর হয়ে বসে এক হাতে একটা বাটালি আর অন্য হাতে ছোট হাতুড়ি নিয়ে একটা মুসলাকার কাঠকে খোদাই করছেন। ওর পাশে রাখা প্রায় ভরা একটা হুইস্কির বোতল।

এখন ও অনেকদিন পর হাসিমুখে বসে একমনে আবার ঘোটনা বানানোব চেষ্টা করছে।

বচনাকাল ঃ ১৯৮৩

ঘোটনা ঃ 'কাঠেব তৈরী গাইলচা, যা দিয়ে কাঠের বা পাথরের হইলচায় মশলা কোটা হয়।

গুরুবচন সিংহ ভুল্লর

জ্বলন্ত চোখ

দেখতে দেখতে ওদের উঠোনে ভীড় জমে যায়। ওরা নিজেরাই গ্রামসভার কয়েকজন সদস্য ও অন্য মাতব্বরদের ডেকে এনেছে। প্রতিদিনের ঝগড়া-ঝামেলা থেকে নিষ্পত্তির জন্যে যা কিছু ফয়সালা ওদের সামনেই হওয়া উচিত। যাদের সঙ্গে এই পরিবারের কামধান্দা, যারা হাল জুতে হাল চালিয়ে মাটিতে সার ও জল দিয়ে উর্বরা করে তোলে, প্রথম বিছন বানিয়ে চারা বোনে, তারপর সময় এলে আবার চারাগুলি তুলে নিয়ে নানা ক্ষেতে রোপণ করে, যারা ওদের ফসল কাটে ও রোদে শুকিয়ে ঝাড়াই বাছাই করে শস্য গুদামজাত করে—আজ ওদেরকে ডেকে আনা হয়েছে; কেননা এরা অনেক ঘটনা জানে যা পঞ্চায়েত শত চেষ্টা করেও বের করতে পারবে না। কোন না কোন ভাই-এর উপর ওদের প্রভাব রয়েছে বলে সহজেই ওরা অনেক রহস্যের গিঁট খুলে দেবে। কয়েকজন কুচুটে বিনা আমন্ত্রণেই এসেছে। ওরা গ্রামের কোথাও ঝগড়া ফ্যাসাদের গন্ধ পেলেই দৌড়ে যায়; সর্দারি করার জন্যে অনেক সময় আমন্ত্রিতদের আগেই রবাহুতদের আগমন হয়। এছাড়া অনেকেই মজা দেখতে এসেছে, এমনকি গ্রামের হদ্দ কুড়ে লোকটির পাশাপাশি সবসময় ঘরের বাইরে থাকা আমলী বুড়োও পৌছে গেছে। আমলী বুড়োর কথা হলো, "ন কাহু সে দোস্তী না কাহু সে বৈর", ও কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সবসময় হক কথা বলে। কারো লাভ কিম্বা লোকসান নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই, ও শুধু উত্তেজনার আর মধ্যস্থতার মজা নিতে ভালবাসে। আর জুটেছে যত বাচ্চাকাচ্চা; ভাল-খারাপ, শোক-উল্লাস সব কিছু দু'চোখ ভরে দেখার জন্যে এদের মহা উৎসাহ। প্রথমে ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পা টিপে টিপে ভীড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের অজান্তেই ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গেজেগুঁজে একেবারে সামনে পৌছে যায়।

উঠোনে এত ভীড় জমলেও এখনো আসল ব্যাপারে কথা শুরু হয়নি। সবাই নিজের নিজের কথা বলছে। শোরগোলে কারো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না। গ্রামসভার সদস্য ও কয়েকজন মুরুব্বি খাটিয়ায় বসেছেন। অনেকে ঘরের বাইর কিম্বা ধাঁপিতেই বসেছে, কেউ কেউ একটি কাঠের টুলে আর বাকীরা সবাইকে ঘিরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিন ভাই এর মধ্যে সবার বড় দয়ালা আর সবার ছোট পালা আলাদা আলাদা খাটিয়ায় মুরুব্বিদের মাঝে, সবার হৈচৈ গুজুর গুজুরের মাঝে

ওরাই শুধু চুপচাপ, পাশে বসা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ হ্যাঁ করে জবাব দিয়ে তারপর থম মেরে বসে থাকছে।

উঠোনে তৈরী বড় তিনমুখী উনুন ঘিরে পাড়া প্রতিবেশীর পাঁচ-সাতজন মহিলা অধীর অপেক্ষায় বসে আছে। পঞ্চায়েত এর বিচার কে না শুনতে চায়। যদি কোন গুরুদুয়ারা, ধর্মশালা অথবা সরপঞ্চের বাড়িতে এই পঞ্চায়েত বসে তাহলে অবশ্য এই মহিলারা দেখার সুযোগ পায় না। কিন্তু এই জমায়েত কারো বাড়িতে হলে ওরাও এক এক করে একত্রিত হয়ে নিজেদের আলাদা পঞ্চায়েত জমিয়ে বসে। দয়ালার বউ গুরনামো এবং পালার বউ মহিন্দ্রোও ওদের মধ্যে বসে আছে।

মঙ্গলসিংহ কোথায়? সরপঞ্চ জিজ্ঞেস করেন, এখন ওকে ডাকো ভাই। সমস্ত বয়স্ক লোকেরা যখন পৌঁছে গেছে, তাড়াতাড়ি মীমাংসা করে নেওয়া যাক।

দয়ালা বলে, এই তো ঘরেই ছিল, গুদাম ঘরে কী যেন করছিলো, যা-তো পালে, ডেকে নিয়ে আয়, ও কি জানে না.........?

পঞ্চ গুরবখ্স সিংহ ওর মুখোমুখি সরপঞ্চের খাটিয়ায় রোয়াব নিয়ে বসে থাকা সোহনা আমলীকে বলেন, যা তো সোহনে, এই ছেলে-ছোকরাদের তাড়া। এদের এখানে কী কাজ? বেকার হৈ হল্লা করে কানের কাছে বলা কথাটি অব্দি শুনতে দিচ্ছে না!

ওর কথায় একটু দাদাগিরির সুযোগ পেয়ে সোহনা আমলী কাঁধে রাখা গামছাটা পাখি তাড়ানোর মতন করে ঘুরিয়ে মাটিতে পা দিয়ে থপথপ শব্দ করে বলে, এই বাচ্চারা, পালা এখান থেকে!

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বড়দের ফাঁকে ঘাপটি মেরে লুকানোর চেষ্টা করা একটা ছেলেকে টেনে বের করে বলে, এই লুকাচ্ছিস কোথায়, পালা এখান থেকে! না হলে তোব ঠাম্মাকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে যাব!

তিনমুখী উনুনের পাশ থেকে নামী বুড়ি একথা শুনে চেঁচিয়ে বলে, দ্যাখো কান্ড, এই ভরা পঞ্চায়েতের সামনেও এরকম সুবচন বলতে সঙ্কোচ হয় না তোর?

সোহনা আমলীর মুখচুন হয়ে যায়। বাচ্চাটার ঠাম্মা ও যে এখানেই বসে রয়েছে সে খেয়াল করেনি। কিন্তু পঞ্চায়েত সভায় আসার আগেই আজ তাড়াতাড়িতে এক তোলা আফিম বেশী খেয়ে এসেছে বলে এখন পুরো আমেজে ভাসছে। ও হেসে উঠে বলে, কেন গো লম্বরদারনিয়ে এমনিতে কেউ কিছু বললে তুমি শুনতে পাও না। চেঁচিয়ে বলতে বলো, কিন্তু মেলায় যাওয়ার কথাটি কেমন ঝট্ করে শুনে নিলে?

উঠোন ভরা মানুষ একথায় নানা আওয়াজে হেসে ওঠে। মহিলারাও হেসে ওঠে। নামীবুড়ি মিনমিনিয়ে কিছু বলে, কিন্তু এখন ওর কথা কে শোনে? ও এখন রেগেমেগে দু'হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বলছে। কিন্তু সোহনা আমলীই এই মুহূর্তে সবার মন জয় করে নিয়েছে।

ততক্ষণে মঙ্গল ঘর থেকে বেরিয়ে একটি খাটিয়ার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে। সরপঞ্চ সবাইকে চুপ করিয়ে মূল বিষয়ে আসতে চায়। কিন্তু সোহনা আমলী সরপঞ্চেব কথার মধ্যেই বলে, আরে মঙ্গল সিয়াঁ, এরকম কুঁকড়ে বসেছিস কেন, তোকে তো আর কেউ এখন দৌড় লাগাতে বলবে না! ঠিকভাবে বস, ভাইদের সমানে সমানে, সমান অংশের মালিক তুই!

তিনমুখী উনুনের পাশে বসা মহিলাদের মধ্য থেকে মহিন্দ্রো বলে, সমান সমান তো ঠিকই কাকু, একই মায়ের সন্তান!

ও নিজের ছোটছেলে গুরজন্টকে স্নানটান করিয়ে মাথার তেলপাটপাট চুলগুলিকে ক্লিপ দিয়ে আটকে কোলে নিয়ে বসে আছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ওর বাঁ চোখটাকে প্রদীপের মতন জ্বলতে দেখা যায়।

সোহ্না আমলী এই উল্টো জবাব আশা করেনি। এই অকল্পিত আক্রমণে নামী বুড়ির সঙ্গে বলা হাজির জবাবে একটু আগেই ওর যে ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছিল তা যেন মিইয়ে যায়। ও কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। কী বলবে তা ভেবে উঠতে পারে না। একজন মুরব্বি বলে ওঠে, আঃ বউমা, মাঝখানে কথা বলো না!

তখন লম্বা ঘোমটা টেনে বসে থাকা মহিন্দ্রোর বড়জা বলে, তুই মাঝখানে জাল ফেলছিস কেন? চুপ করে বস্, পঞ্চায়েতে পরমেশ্বর থাকে, পঞ্চায়েত যে ফয়সালা করবে তা দুধ থেকে জল আলাদা করেই ছাড়বে!

কয়েকজন বৃদ্ধা গুরনামোকে সমর্থন করে মহিন্দ্রোকে চুপ থাকতে বলে। মহিন্দ্রো বলে, কেন বলবো না, আমলী বুড়ো ফালতু বিভেদের কথা বলে কেন, মঙ্গল সিয়াঁর সমান ভাগে কি কারো আপত্তি রয়েছে, এই বাড়িতে ওকে আমরা তাঁর থেকেও বেশী মানি। উঠোনে বসা লোকেরা ভাবে, হ্যাঁ, আজতো সত্যি সত্যি মঙ্গলকে অনেক বেশী ওজনদার মনে হচ্ছে। কুড়ি একর উর্বরা জমিতে তিনভাই-এর সমান ভাগ। বড় দয়ালা আর ছোট পালা ছাপোষা গৃহস্থ, কিন্তু মেজভাই মঙ্গল এখনো বিয়ে করেনি। দয়ালা আর পালার অনেক ছেলে পিলে। কাজেই তুলনা করলে মঙ্গলকে অনেক ভারী লাগবেই। জাট কৃষকের নিজের তো আর কোন ওজন হয় না। জমির আয়তনেই ওর ওজন, জমি ছাড়া জাটের আর অস্তিত্ব কি?

দয়ালার বিয়ে এমনি কথায় কথায় ঠিক হয়ে গেছিল। তখন এ অঞ্চলে মস্তান সিংহের খুব নাম-ডাক। সুন্দর সুডৌল দু'টি নাগৌরী বলদ হালে জুড়ে তিনি চাষ করতেন। তিন ছেলেই ওকে চাষের কাজে সাহায্য করতো। যে কৃষকের বাড়ি থেকে চারজন লোক ক্ষেতে যায় তার আর চিন্তা কিসের? এমনিতেও সততার জন্যে সবাই ওর প্রশংসা করতো।

কিন্তু মঙ্গলের কৃশ তনু আর অবিন্যস্ত বসন্তের দাগ থাকায় কোন মেয়েপক্ষই এগিয়ে আসেনি। তার উপর ওর অবিন্যস্ত পাগড়ি, ঠিক মতন আঁটোসাটো করে পাগড়ি বাঁধা ও কোনমতেই আয়ত্ত করে উঠতে পারলো না! কোনমতে মাথায় পেঁচিয়ে রাখে বলে ওকে পাগলা পাগলা লাগে। ছেলে দেখতে আসা অনেকেই যাওয়ার সময় ঘটককে বলে যায়, ছোটটার জন্যে হলে এক্ষুণি টাকা দেব, কিন্তু এই ছেলে তো.......।

তবু মস্তান সিংহ আর কিশ্নো কয়েক বছর নানা রকম চেষ্টা চরিত্র করে। মস্তান সিংহ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কারো সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, ওর ঘর বসিয়ে দাও ভাই! কিশ্নোও এ গ্রাম ও গ্রামে বিয়ের সম্বন্ধের জন্যে খ্যাত মহিলাদের ঘরে বারবার চক্কর লাগায়। ওদেরকে ঘটকালির জন্যে ভারী আংটি, ভাল স্যুট আর মোটা বক্‌শিশের লোভ দেখায়। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য না মঙ্গলেরই ফাটা কপাল কে জানে, কোন বিয়ের আলাপই ওর পাকা হয়নি। অবশেষে একদিন ওরা ভাবে, এর চক্করে ছোটটাও এমনি থেকে যাবে নাকি? তাই ওরা পালার জন্যে পণের টাকা স্বীকার করে নেয়।

তারপর তো আরো মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। ছোট ভাই এর বিয়ে হয়ে গেলে বড়কে আর কে চায়? লোকে ভাবে, নিশ্চয়ই এর কিছু সমস্যা রয়েছে। নইলে বিয়ে হলো না কেন?

মস্তান সিংহের মৃত্যুর পর কিশ্নো জাটের গরিমা ত্যাগ করে এমনকি নিজে থেকে টাকা দিয়ে

বউ আনতে রাজী হয়ে পড়ে। তবু কোন লাভ হয় না। না জানি কে বা কারা মাঝখানে ভাঙ্গানি দেয়, বেশ কয়েকবার সব কিছু ঠিকঠাক হয়েও শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। কিশ্‌নো কপাল চাপড়ে বলে, মেরে ভাগ মাড়ে, নালে মাড়ে এস চন্দরে দে — আমার পোড়া কপাল, ছেলেটাও কপালপোড়া! ও তারপর আরাধ্য দেবতাকেও গালিগালাজ করতে থাকে।

কিশ্‌নোর এই নিত্যদিনের প্যানপ্যানানি মঙ্গলের ভাল লাগে না, লজ্জাও করে, বউদি ও ভ্রাতৃবধূর সামনে নিজেকে হীন লাগে। ও মাকে বকে, যখনই দেখি তুমি ঘ্যানঘ্যানর করতে থাকো, আমার বউটউ দরকার নেই!

তারপর ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিশ্‌নো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আরে বুদ্ধির ঢেঁকি, সারা জীবন কি দু'টো রুটির জন্যে অন্যের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবি? কেউ তোকে ডেকে ডেকে খাওয়াবে না রে বাপ। একবার চোখ বুজি.......!!!

দু'একটা আলাপ মহিন্দ্রোও এনেছিল। একবার ওর মামা নিজের গ্রাম থেকে এক মেয়ের বাপকে নিয়ে আসে। ভদ্রলোকের ছেলে পছন্দ হয়। কিন্তু সঙ্গে আসা ভগ্নীপতি আর শালার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে খবর দেবে বলে সেই যে যায়, আর আসেও না খবরও দেয় না। মহিন্দ্রোর মাসতুতো দাদার তো শলাপরামর্শ করার জন্যে কোন শালা কিম্বা ভগ্নিপতি ছিল না, তবু ওর মেয়ের জন্যে পাকা দেখা করেও শেষে কেন যে পিছিয়ে গেল, ঈশ্বর জানে। মহিন্দ্রোর পিসেমশাই-এর সঙ্গে আসা মেয়েপক্ষ কোন ভাল লগ্ন দেখে বিয়ের দিন পাকা করার কথা অব্দি বলে গেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও কেউ মাঝপথে ভাঙ্গানি দিয়েছে। মহিন্দ্রো বুঝে উঠতে পারে না যে ভাঙ্গানি দিয়ে লোকের কী লাভ হয়। কেউ সুখে দু'টো রুটি খাবে, স্ত্রী-সুখ ভোগ করবে তা-ও লোকের সহ্য হয় না। কে বা কারা এমন করছে জানতে পারলে মহিন্দ্রো ওদের চোখ উপড়ে নিত।

যতদিন কিশ্‌নো বেঁচে ছিল সবাই এক চুলোতেই খেত। কিশ্‌নো চোখ বোজার পরই বাড়ির পরিবেশ পাল্টাতে থাকে। গুরনামো রোজ রাতে দয়ালার কাছে মহিন্দ্রোর নানারকম বাড়াবাড়ির কথা বলে। গাধার খাটনী সব গুরনামোকেই খাটতে হয়। প্রত্যেক কাজের ভারী দিকটা ওর ভাগে আসে আর হাল্কা দিকটা মহিন্দ্রোর। মহিন্দ্রো ঝাড়ু দিয়ে টুকরীতে নোংরা ভরে রাখে, গুরনামোকে তা উঠিয়ে জঙ্গলের স্তূপে ফেলে আসতে হয়। মহিন্দ্রো আটা মাখে আর সম্বার দিয়ে ডাল বসায়, গুরনামোকে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুটি সেঁকে পাহাড় বানাতে হয়। তারপর মহিন্দ্রো টুকরিতে রুটি, ডাল আর লস্‌সী সাজিয়ে পেঁয়াজের খোসার মতন ফিনফিনে ওড়নাটাকে নেটের কুর্তার উপর নিয়ে, আঁটোসাটো সালোয়ার পরে পায়ে নকশাদার জুতি গলিয়ে মচরমচর শব্দ করে যৌবন প্রদর্শন করতে করতে ক্ষেতে স্বামী ও ভাসুরদেরকে খাওয়াতে যায়। গুরনামোকে তখন বাড়ির সবার জামাকাপড়ের টাল নিয়ে কাচতে বসতে হয়। ঐ ফুলবিবি যা কাজ করে নিজের কাজ সেরে গুরনামো অনায়াসে সেগুলিও করে নিতে পারে, কিন্তু ওর চালাকিগুলি একদমই সহ্য হয় না! ও কাজ কম করে, উচ্ছাবাছা খায়, সিনেমার নায়িকাদের মতন জামাকাপড় পরে, কিন্তু কথাবার্তার একদমই ছিরি নেই, শুধু নানারকম কায়দা আর ঢঙ!

মহিন্দ্রোও বড়জায়ের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। ওভাবে, ভাসুবেব ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, কাল যদি ভাসুরের বড় মেয়ে সীতোর বিয়ে লাগে তো ওদেরকেও সমান খরচ করতে হবে, ওর ছেলেমেয়েবা বিবাহযোগ্য হতে অনেক দেরী, ততদিন অব্দি এক থাকা সম্ভবই না। ও তাই রাতে পালার কাছে শুয়ে ওর নির্বুদ্ধিতার কথা বলে, বুদ্ধিমান মানুষেরা নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরী করে। ওরা দু'জনে ঘরে-বাইরে দয়ালা আর গুরনামোর সমান কাজ করে কিন্তু বেশীর ভাগ খরচ হয় বড়জনের

একগাদা ছেলেপিলের পেছনে। ওদের প্রয়োজন ফুরোলে ওরা লাথি মারবে তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না। তার চাইতে এখন থেকেই নিজের নিজের সংসার সামলানো ভাল। আলাদা খেলে নিজের নিজের সর্দারী থাকবে আর সুসম্পর্কও বজায় থাকবে।

এভাবেই প্রত্যেকের মনে তুষের আগুনের মতন ধিকিধিকি ক্লেশ বাড়তে থাকে।

মায়ের মৃত্যুর পর মঙ্গল যেন অকুল পাথারে। নিজেকে ফালতু বলে মনে হয়। সারাদিন সবার সমান পরিশ্রম করে দু'টো রুটি খায়। ওর ভাল লাগে না, আজকাল কাজেও মন লাগে না। মাঝেমধ্যে ক্ষেতে যেতেও কোন উৎসাহ পায় না। কখনো কোন ভাইপো বা ভাইজিকে কোলে নিয়ে অথবা আঙ্গুল ধরে ঘুরতে বেরোলে কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে, এই যে দয়ার সাগর, ভাইবৌরা ঠিকমতন খেতে দেয় তো?

মঙ্গল মুচকি হাসে। কিন্তু কোন জবাব দিতে পারে না। ওর গলায় একদলা কফ এসে আটকে যায়।

গুরনামো ওর থেকে বয়সে অনেক বড়, তাই শুরু থেকেই ও বৌদির সামনে চোখ নামিয়ে চলে। দয়ালার পর দুই দিদি, তারপর মায়ের একটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছিল। তার অনেক পরে মঙ্গলের জন্ম। গুরনামো যখন এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসে, মঙ্গল তখন সবে কৈশোরে পা দিয়েছে, আর পালা আরো ছোট। পালা ছোট হওয়ায় বৌদির আদর পেত কিন্তু মঙ্গল লজ্জায় দূরে দূরেই থাকতো। গুরনামোর তখন পাকা গমের মতন রঙ আর টানটান শরীর। তারপব বছরের পর বছর এই সংসারের জোয়াল ঠেলতে ঠেলতে এখন ঢিলেঢালা মোটাসোটা হয়ে পড়ায় মঙ্গলের মাঝমধ্যে মনে হয় যেন মা কিশ্‌নোই এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ছোটবউ মহিন্দ্রো মঙ্গলকে শিয়ালের মতন লেজের উপর নাচায়, কিন্তু ধরা দেয় না! মক্কার রুটির মতন গাত্রবর্ণ আর আঁটোসাটো শরীর নিয়ে ফুলবিবি সেজে ঘুরলে একা সময়ে মঙ্গলের শরীরে আগুন লেগে যায়, ওর প্রতিটি কদম তখন নগাড়ার মতন কানে বাজে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ওর জ্বলজ্বলে চোখ দু'টি ওকে পাগল করে তোলে, তখন নিজের শরীরটাকে শুকনো ঘাসের মতন দাহ্য বলে মনে হয়। কিছু পুরনো স্মৃতি ওকে তোলপাড় করে।

একদিন সারা বাড়িতে শুধু মঙ্গল আর মহিন্দ্রো। মঙ্গল শুয়ে বসে মহিন্দ্রোকে এঘর ওঘর করতে দেখে। তখনই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকানো মহিন্দ্রোর জ্বলন্ত চাহনি ফুলকির মতন উড়ে এসে সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে যায়। টুকটাক কাজ করতে থাকা মহিন্দ্রোর ওড়নার আঁচল সেই আগুনে বাতাস দিয়ে বারবার এঘর ওঘর করতে থাকে। মঙ্গল একসময় আর থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে পেছন থেকে মহিন্দ্রোকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে চুমু খায়।

মহিন্দ্রো তখনই হাত উঁচু করে দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, এই যে সীতো! মঙ্গল চমকে হাত সরাতেই মহিন্দ্রো এক লাফে হরিণীর মতন উঠোনে বেরিয়ে পড়ে। মঙ্গল বাইরে বেরিয়ে দেখে সীতো কোথাও নেই। ওকে ঠকানো হয়েছে। তখনই মহিন্দ্রো ফিসফিসিয়ে বলে, মাথা খারাপ? সত্যি সত্যি কেউ এলে গেলে কী হতো? কথাটা মঙ্গলের মনে ধরে। এত বড় পরিবারে যে কেউ যখন খুশী আসতে পারে। কিন্তু মহিন্দ্রোর ভালবাসামাখা বকুনিও ওর ভাল লাগে। ও মনে মনে মহিন্দ্রোর বুদ্ধির প্রশংসা করে। কী সুন্দর সামলে নিয়েছে! পরে সুযোগ বুঝে......! মঙ্গল বাইরে বেরোতে যাবে তখনই মহিন্দ্রো ওকে বারান্দায় রাখা আড়াই মণের গমের বস্তা দেখিয়ে বলে, বস্তাটাকে একদিকে সরিয়ে রেখে যান, দুপুরেই পিষাতে দিতে হবে। মঙ্গল ভাবে বস্তাটাকে ঘষটে একপাশে সরিয়ে দেবে। কিন্তু ওটা এত ভারী যে ও একা নড়াতেও পারে

না। শরীরটাও হঠাৎ করে দুর্বল লাগে। পাশেই দাঁড়ানো মহিন্দ্রো বলে, দাঁড়ান, আমিও হাত লাগাই।

তারপর দু'জনে মিলে বস্তাটাকে দাঁড় করিয়ে মঙ্গলের বাঁহাতে কব্জি নিজের ডান হাত দিয়ে ধরে মহিন্দ্রো বলে, এবার ওঠান!

ওর কথামতন মঙ্গল বস্তাটাকে বাঁহাতের উপর নিতেই মহিন্দ্রো ওর হাত ছেড়ে এক লাফে দূরে চলে যায়। মঙ্গল বস্তার নিচে একরকম চাপা পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও ও ঠেলে বস্তাটাকে সরাতে পারে না। মহিন্দ্রো হেসে বলে, আপনার ভাই এসে জিজ্ঞেস করবে এমনভাবে বসে আছো কেন? তখন সব কথা নিজেই বলে দেবেন!

মঙ্গল ভয়ে কেঁপে ওঠে। অন্য কাজে যাওয়ার আগে মহিন্দ্রো তেল নিংড়ানোর জন্যে রাখা সর্ষের বস্তাটাও ওর উপর ঠেলে দেয়। মঙ্গল হতভম্ব হয়ে বলে, কী করছো তুমি! এগুলি সরিয়ে দাও লক্ষ্মীটি!

মহিন্দ্রো মুচকি মুচকি হাসে আর চুপচাপ নিজের কাজ করতে থাকে। সত্যি সত্যি এখন পালা বা অন্য কেউ এলে কী হবে? ও আতঙ্কে ঘাসের থেকেও হাল্কা আর জলের থেকেও বেশী তরল হয়ে পড়ে। একটা মাছি ওর নাকের ডগায় বসে অবলীলায় সুড়সুড়ি দিতে থাকে। ও ফোঁসফোঁস করে কিম্বা নাকমুখ কুঁচকে কোনমতেই ওটাকে সরাতে পারে না। দরদর করে ঘামতে থাকে, দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকে। বাঁহাত ও পা অসাড়। ডান হাতও এত বেকায়দায় যে ও কোন সুবিধা করে উঠতে পারে না। মহিন্দ্রো গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে ময়ূরনীর মতন এদিকে ওদিক ঘুরতে থাকে আর তেরছা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

অবশেষে একবার কাছে পেয়ে ডানহাতে ওর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে মহিন্দ্রো ধাক্কা দিয়ে এক এক করে বস্তা দু'টি সরায়। মঙ্গল কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে তারপরই উঠে বাইরে বেরোতে পারে।

এরপর আর কোনদিন ও মহিন্দ্রোর দিকে হাত বাড়ায়নি। সেজন্যেই কেউ ওকে ঠাট্টা করে ভাইবৌদের সেবাযত্নের কথা জিজ্ঞেস করলে ওর গলায় একদলা কফ আটকে যায়। ও কেশে গলা সাফ করে থুতু ফেলে বলে, ভাইবৌরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ওরা রুটি খাওয়াবে না কেন?

বন্ধুরা মজা করে বলে, বাহ্ ওয় সর্দার মঙ্গল সিয়াঁ, খুশ্ কর দিয়া!

সরপঞ্চ একটা কাঠি দিয়ে উঠোনে দাগ কেটে বলে, বলো ভাই ছেলেরা, কোনভাবেই কি তোমাদের এক থাকা সম্ভব নয়? ওর কথায় এতটা জোর নেই, আজ প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে ভাঙ্গনের বাজনা বাজছে। তবু বয়স্ক হওয়ার সুবাদে, সরপঞ্চ হওয়ার সুবাদে নিজের কর্তব্য পালনের ঢঙে এই প্রশ্ন। ভাঙ্গনের পূর্ব মুহূর্তে তিনভাইকে একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে এক থাকার অনেক সুবিধা, একতাই বল!

তিন ভাই-ই মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বসে থাকে। পরিস্থিতি যেখানে ঠেলে এনেছে সেখান থেকে এক থাকার কল্পনা করাও মুশকিল। কিন্তু এখন কেউ নিজের মুখে আলাদা হওয়ার কথা বলতে পারছে না। সেজন্যে নীরবতাই একমাত্র উপায়। ওদের জবাবের অপেক্ষায় পুরো জমায়েত উৎকর্ণ হয়ে থাকায় পুরো উঠোন কিছুক্ষণ নৈঃশব্দে ডুবে থাকে।

কিছুক্ষণ আগে একদম পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিন্দ্রো দুই কদম এগিয়ে এসে বলে, সে সুযোগই আর নেই কাকা। একবার দুধ ফেটে গেলে তা থেকে আর কখনো দুধ হয় না। আপনারা বয়স্ক, জ্ঞানীগুণী.......!! নিজের বউকে এরকম বলতে শুনে পালা ধমকে বলে, মাঝখানে কথা বলতে এস্ছো কেন?

দাদা-বৌদি চুপচাপ বসে আছে আর পঞ্চায়েতের সামনে শুধু মহিন্দ্রো পকপক করছে, দশজনে ভাবেবে ওর চতুরতা আর পালার নীরব সহমতিই বুঝি ভাঙ্গনের মূল কাবণ। ও তাই বিরক্ত কণ্ঠে বলে, যাও, গিয়ে চুপচাপ মহিলাদের মধ্যে বসে থাকো! বড়রা কী বলছে শোন!

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিছু বলবো না, তুমিও বলো না! তোমার এই চুপ থাকাটাই যে সমস্ত বিপত্তির মূলে তা কে বোঝাবে?

মঙ্গল এক ঝলক তাকিয়ে দেখে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মহিন্দ্রোর বাঁ চোখ তেমনি প্রদীপের সলতের মতন জ্বলছে!

তিনমুখো বড় উনুনের পাশে বসা কয়েকজন মহিলাও তখন ওকে ডাকে, চলে আয় পাগলী, এসে চুপচাপ বস্!

না, আমি বুঝতে পারছি না, আলাদা হওয়া কি অন্যায়? প্রথম আমাদের পরিবারেই কি এমন হচ্ছে? দুনিয়ার লোক আলাদা হচ্ছে, ঘরে ঘরে শান্তির জন্যে আলাদা হতেই হচ্ছে। সুখে থাকার জন্যেই তো ভাই-এরা আলাদা হয় যার, যারটা সে সে খায়। যে দুর্ভাগাবশতঃ একা থাকে সে আলাদা হবে না! এতে আর সমঝোতার কী আছে?

গুরনামো এক তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, আরে এখন একটু সবুর কর, আলাদা হয়ে সব আকাঙ্ক্ষা পুরো করে নিস্।

না দিদি, আমাদের কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষাও নেই, আফশোষও নেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম, তবে সদিচ্ছা থাকলে আলাদা হয়েও নিজের মানুষকে আপন করে রাখা যায়, ববঞ্চ এতে সম্পর্ক সুস্থ থাকে। এটুকু বলেই মহিন্দ্রো চুপ করে যায়।

পুরো উঠোনে সবাই টানটান। একজন মুরুব্বী বলেন, তবু তোমবা চিন্তা কর। সাধারণ একটা বাড়িতে দু'টো দেওয়াল উঠলে ছোট ছোট ঘরগুলিতে তোমাদের দমবন্ধ লাগবে। তিনভাই মিলেমিশে কাজ করলে অনেক লাভ। জাটের ছেলের তো মাথায় বোঝা উঠিয়ে দেওয়াব জন্যেও সাহায্যের দরকার হয়। একা একা কী করবে? প্রত্যেককেই রাখাল বাগাল কিম্বা চাকরবাকরের উপর ভবসা করতে হবে!.

তারপর কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। ধর্মকথার মতন সত্য অথচ কেউ কথাগুলিকে আমল দিচ্ছে না দেখে সরপঞ্চ বলেন, কী ভাই ছেলেরা, তোমরা যদি কোনভাবেই এক না থাকতে পাবো তাহলে আমরা ভাগ বাটোয়ারার কাজ শুরু করবো? এখন তো আর চুপ থাকা অভদ্রতাব সামিল! তাই দয়ালা ও পালা মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে!

সরপঞ্চ জিজ্ঞেস করেন, কী মঙ্গল সিয়াঁ, তোর মত কি?

সমস্ত চোখ এখন মঙ্গলের প্রতি নিবদ্ধ। ওর মতামতই এখন মূল আকর্ষণ। ও এখনো মাথা নিচু করে চুপ হয়ে বসে রয়েছে। কষ্টে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে। অনারা ভাবে ও যার দিকে হয়ে যাবে ওর ভাগের জমিও শেষ সময়ে ঐ ভাই কিম্বা তার ছেলেপিলেরা পাবে। জমির এক এক টুকবোর জন্য জাটরা যা খুশী করতে পারে! আর মঙ্গলের মতন সহজ সরল মানুষকে যে ভাইপো রুটি খাওয়াবে সেই ওর জমি লিখিয়ে নেবে। যেদিকে ও যাবে তার ঘরও অপেক্ষাকৃত বড় থাকবে। নাহলে ঘুপচি ঘরে জাটের হাল-জোয়াল-কোদাল-খুন্তি আর গমের গোলা রাখার পর কতটা আর জায়গা বাঁচবে!

যদিও দুই ভাই থেকেই আলাদা হয়ে যায় তাহলে ওকে দশভূতে লুটবে। নেশা আর কাম

বিলাসিতায় ফাঁসিয়ে ওকে কাঙাল বানাতে কতদিন লাগবে। অবশেষে একদিন ও মঙ্গল আমলী হয়ে পড়বে। বেঁচে থাকতেই ঘর-জমি সব খেয়ে লুটিয়ে দুই ভাই এর পরিবারের জন্য কেবল লজ্জা অবশেষে রেখে যাবে।

যদি নেশার পথে নাও যায়, ও কোন বাজারে মেয়েছেলেকে নিয়ে থাকতে পারে, কে আটকাবে? তখন ওর ছেলেপিলে হলে জাটের গরিমায় কালি লেপন করে ওরাই মঙ্গলের সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।

মঙ্গল সিংহ এতসব চিন্তা করে না। ঢিলে ঢালা পাগড়িটাকে টাইট করার চেষ্টা করতে করতে ও বলে, আমার আবার রায় কিসের? পঞ্চায়েত যে ফয়সালা করবে, তাতেই আমি রাজী!

তবুও তোর মনে কিছু থাকলে বল। পঞ্চায়েত ঈশ্বর হয় পাগলা, কোন লজ্জা কিম্বা দ্বিধা মনে রেখে পঞ্চায়েতের কাছে বলতে নেই!

এতক্ষণে সোহনা আমলী আবার নিজস্ব রোয়াবে ফিরে আসে, কথা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ও আর চুপ থাকে কেমন করে, ও নিজের গামছাটাকে বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে সরিয়ে বলে, কেন ভাই পঞ্চায়েত, সহজ কথা বলছো না কেন? তরীকা দস্তুর অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করো, তারপর ওর ভাগ নিয়ে মঙ্গল সিয়াঁ যা খুশী করুক।

ওর কথায় উপস্থিত অনেকেই সায় দেয়। একজন মুরুব্বী বলেন, সোহনা সিয়াঁ লাখ টাকা দামের কথা বলেছে। মতামত জিজ্ঞাসা করার আর কী আছে, তিনভাই-এর তিনভাগ করো। এটাই পঞ্চায়েতী তরীকা। তারপর মঙ্গলের যা ইচ্ছা করুক।

গুরবখস সিংহ বলেন, ওর আবার রায় কী হবে? তিনভাগ করে দাও। ইচ্ছে করলে দু'টো রুটি নিজেই সেঁকে নেবে। যদি কেউ আদর ও সম্মানের সঙ্গে দু'টো রুটি নিয়মিত খাওয়ায় তাহলে নিজে থেকেই ঐদিকে হয়ে যাবে। ভাল না লাগলে যেদিকে ভাল হাওয়া পাবে সেদিকেই চলতে শুরু করবে।

এতজন লোককে নিজের পক্ষে বলতে শুনে সোহনী আমলী বাঘেব মতন হুঙ্কার ছাড়ে, হ্যাঁ ভাই, আমরা কখনো পক্ষপাতিত্ব করি না, হক কথা বলতেও ভয় পাই না, পঞ্চায়েতের ধর্ম সবাইকে এক নজরে দেখা, কোন ভাই তাগড়া হতে পারে, অন্য কেউ দুর্বল, কেউ বিবাহিত হতে পারে অন্য কেউ অকৃতদার, আমাদের কাছে সব এক! মনে হচ্ছে ও-ই যেন সরপঞ্চ।

তখনই গুরজন্টকে কোলে নিয়ে এক হাতে শক্ত করে ঘোমটা ধরে মহিন্দ্রোকে আবার উঠোনের মাঝে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই আবার চুপ হয়ে যায়। সবার শ্বাস থেমে যায়। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে মঙ্গল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একটা জ্বলন্ত চোখ আবার দেখে ফেলে!

তাহলে পঞ্চায়েত আমার একটা কথা শুনুন। ওব কথার হীরার মতন তীক্ষ্ণ ধারে কাচেব মতন সময় কিরিচ কিরিচ করে কাটতে থাকে।

পঞ্চায়েতকে আমরা মা-বাপ মানি। মা-বাপের ইজ্জত আমরা দিই, কিন্তু সত্যকে লুকিয়ে রাখতে চাই না, মা-বাপের কাছে সত্য বলায় কোন লজ্জাও নেই!

সবার চোখ এখন মহিন্দ্রোর দিকে। সবার দমবন্ধ। পালা দাঁতে দাঁত ঘষে। ওর ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে মহিন্দ্রোর ঘেটি ধরে হিড়হিড় করে এনে বসিয়ে দেয়। কিন্তু এই সময় ওকেও জবুথবু করে রাখে। সময়ের রথের লাগাম এখন মহিন্দ্রোর হাতে। ও বলে, মঙ্গলের সন্তানই তো তাঁর সমস্ত

সম্পাত্ত পাবে, তাই না? মহিন্দ্রো এবার দেওয়ালের উপর দিয়ে গুরুদুয়ারার উঁচু রডের মাথায় টাঙানো পতাকার দিকে দেখিয়ে বলে, ঐ যে দেখছেন বড়মহারাজের ঝান্ডা, ওকে সাক্ষী রেখে মঙ্গল সিয়াঁ উঠুক, যদি এই বাচ্চা ওর হয় তাহলে কোলে তুলে নিক, নাহলে.........!!!

বলতে বলতে ও থেমে যায়। গুরজন্টকে কোল থেকে নামিয়ে পঞ্চায়েতের মাঝখানে বসায়। উঠানে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। অজান্তেই প্রত্যেকের মুখ দিয়ে এখন কিছু না কিছু আশ্চর্যধ্বনি বেরিয়ে আসে, হঠাৎ মৌচাকে ঢিল মারার পর যেমন গুঞ্জন শোনা যায়। মঙ্গল চোখ তুলে একবার সবাইকে দেখে। কয়েকজন পঞ্চ আর মুরুব্বি কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছেন। কেউ কেউ হা করে কখনো মঙ্গলের দিকে আবার কখনো মহিন্দ্রোব দিকে তাকাচ্ছে। পালার মুখ অন্ধকার। দং... মাথায় হাত দিয়ে বসে। সোহনা আমলীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি। একপাশে দাঁড়ানো মঙ্গলাব ইয়াবদোস্তরা গোঁফে তা দিয়ে পরস্পরকে বলছে, বাহ্ রে বাঘিনী....... বউদি তো বাঘিনীরই দুধ খেয়েছে দেখছি.....আর আমাদের দোস্ত মঙ্গল সিয়াঁ..... আমরা তো এমনি গপ্ মারে ভাবতাম, সত্যি সত্যি ছেলে পয়দা করে রেখেছে, কে জানতো...... ক্ষমতা আছে ভাই মহিন্দ্রোর... মঙ্গল-সিয়াঁরও জবাব নেই!

মঙ্গলকে এখনো চুপ থাকতে দেখে মহিন্দ্রো আবার চিৎকার করে বলে, মঙ্গল সিয়াঁ! উঁচু ঝান্ডাওয়ালা বড় মহারাজ সাক্ষী, এই ভরা পঞ্চায়েতে আজ তোমাকে সত্যি কথা বলতেই হবে। সত্যিকে ভয় পাচ্ছো কেন?

মঙ্গল মহিন্দ্রোর দিকে চোখ তুলে দেখে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ওর বাঁ চোখ প্রদীপের মতন জ্বলছে। সেই আগুন ওর শুকনো ঘাসখড়ে তৈরী শরীর ছুঁয়ে যায়। ও ঢিলে হয়ে খসে পড়া পাগড়ির কাপড় আবার ভাল করে মাথায় পেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে ভীড়ের মাঝে কাঁদতে থাকা গুরজন্টকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। চুমু খেতে থাকে।

রচনাকাল : ১৯৮১

আমলী : আফিমখোর

পঞ্চ : গ্রামসভার সদস্য

সবপঞ্চ : গ্রাম প্রধান

সিয়াঁ : শতদ্রুর দক্ষিণে মালবা অঞ্চলে সিংহকে এই উচ্চারণে ডাকা হয়।

নম্বরদারনিয়ে : নম্বরদারনিকে বিকৃতভাবে বলা হয়েছে। নম্বরদারের স্ত্রী। নম্বরদার হলো গ্রামে রাজস্ব ও জমি সংক্রান্ত সনাক্তকরণের জন্য বংশানুক্রমিক পদ, আজকাল জেলাশাসক নম্বরদারদের নিযুক্ত করেন।

দলীপ কৌর টিওয়ানা

দেওয়াল

অফিসে তোমার আর আমার কামরা পাশাপাশি। আমার কামরা একচুলও ওদিকে যেতে পারবে না, তোমারটাও এদিকে আসতে পারবে না। মাঝখানে একটা পাতলা দেওয়াল রয়েছে। তবু তোমার হাতে লেগে কিছু নিচে পড়ে গেলে সেই শব্দ আমি শুনতে পাই। একদিন কেউ হয়তো তোমার দিকে পেরেক গাড়ছিল, সেই শব্দে আমার সমস্ত দেওয়াল ভীষণ কাঁপছিলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি তোমার দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। ফিরে আসি। ভাবি, আজকাল সবাই দরজা-জানালায় ভারী পর্দা লটকায় যাতে বাইরে থেকে কেউ কিছু না দেখতে পায়। আমার দরজাতেও ভারী পর্দা ঝুলছে।

কখনো তুমি রেগে চাপরাসীকে বকাঝকা করো, আমি কলম থামিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকাই। উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কী হয়েছে? তারপরই ভাবি, তাহলে তুমি কী ভাববে, সারাদিন বুঝি তোমার দিকেই কান লাগিয়ে থাকি! আসলে তুমি কোন গভীর শ্বাস নিলেও তার শব্দ আমি শুনতে পাই।

একদিন হঠাৎ আমার কামরার পাখা থেমে যায়। কিছুক্ষণ এমান কাজ করার পর ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে আমি আর কলম চালাতে পারি না। ফাইলপত্র বন্ধ করে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। আমি জানি তোমার পাখাও নিশ্চয়ই চলছে না। তবু তুমি কী করে ভেতরে বসে আছ? আমি তোমার পর্দাটা একটু সরিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনার পাখা ঘুরছে? মনে মনে বলি, — বারান্দায় চলে আসুন না, ভেতরে ভ্যাপসা গরম থাকলে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ানো যেতেই পারে!

তুমি মুচকি হেসে জবাব দিলে, — না ম্যাডাম, ঘুরছে না, সেজন্যে পেছনের জানালাটা খুলে দিয়েছি।

আরে তাইতো? আমার তো জানালার কথা মনেই ছিল না। সেজন্যেই বারান্দায় বেরিয়েছি।

একদিন লিখতে লিখতে আমার হাত থেকে কলমটা নিচে পড়ে যায়। নিবটা হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। একবার ভাবি তোমার কামরা থেকে কলম আনাই। তারপর ভাবি, তুমি যদি বলে পাঠাও যে তোমার কাছে ফালতু কলম নেই। সেজন্যে চুপচাপ থাকি। নিজের মনে ... প্রশ্ন ও উত্তর চলতে থাকে। কখনো ভাবি, ইস্, মাঝের দেওয়ালটা যদি ভেঙ্গে দেওয়া যায়! ভাবতেই শিউরে উঠি। তাহলে তোমার কামরাটাও আস্ত থাকবে না।

আমারটাও থাকবে না। মনে হবে খোলা এক বিশাল কামরা। এরকম ভাবা হয়তো ঠিক নয়। স্থপতিরা নিশ্চয়ই অনেক মাথা খাটিয়ে এরকম বানিয়েছে!

কখনো এই পাকা সিমেন্টের দেওয়াল স্বচ্ছ হয়ে পড়ে। তোমাকে ফাইল থেকে মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি। কখনো হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে থাকো। আনমনে কোন ফাইল খোল আবার বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে রাখো। কখনো জুতো খুলে চেয়ারে পা তুলে বসো আবার কখনো চনমনে ফিটফাট সাহেব।

কখনো তোমার চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। টেবিলের উপর পেপারওয়েটটাকে লাটিমের মতন ঘোরানোর চেষ্টা করতে থাকো। ধীরে ধীরে সিটি মেরে কোন সুর ভাজতে ভাজতে এই দেওয়ালে হাত ঠেকিয়ে চেয়ারে পা তুলে চেয়ারশুদ্ধ দুলতে থাকো। তখন আমি এইপাশে এতটুকু শব্দও হতে দিই না। কে জানে তাহলে তুমি চমকে উঠবে কিনা।

কোনদিন আসা-যাওয়ার পথে দেখা হলে তুমি হেসে জিজ্ঞেস করো, — কেমন আছেন?

আমি মুচকি হেসে জবাব দিই, — ভাল!

তারপর তুমি নিজের কামরায় ঢুকে পড়ো। আমিও নিজেব কামরায় ঢুকে পড়ি। আমার কামরা ওদিকে যেতে পারে না, তোমারটাও একচুল এদিকে আসতে পারে না। মাঝখানে দেওয়াল রয়েছে।

তবু তুমি অফিসে না এলে আমার মন কেমন করে। বাববার ঘড়ি দেখি। বারবার জল খাই। একে ওকে ফোন করি। জমে থাকা অনেক কাজও সেরে ফেলি। কখনো বাইরে বেরিয়ে তোমার চাপরাসীকে জিজ্ঞেস্ করি, — আজ সাহেব আসবেন না? চাপরাসী বলে, — সাহেব অমুক জায়গায় গেছেন, অথবা সাহেবের বাড়িতে অমুক আত্মীয় এসেছে, অথবা সাহেবের শরীর ভাল নেই, এত দিনের ছুটি নিয়েছেন।

সেরকম দিনে আজব সব ভাবনারা আমাকে ঘিরে থাকে। আমি ভাবি, আজ থেকে একশো বছর আগে এই প্রাচীন কামরায় কে বসতেন? পাশের কামরাতেও নিশ্চয়ই কেউ বসতেন! একশো বছর পরেও এই কামরায় কেউ বসবে। পাশের কামরায়? মানুষের মৃত্যু হয় কেন? জন্মইবা কেন হয়? একসময় ভাবনারা এত চেপে ধরে যে নিজেকে এক অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য থেকে উদ্ধার করতে, উচাটন মনকে শান্ত করতে ফাইলপত্র গুটিয়ে রেখে অফিসের অন্য কর্মচারীদের টেবিলে টেবিলে ঘুরে ওদের কাজকর্ম দেখি, পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর নিই।

অবশেষে একদিন তুমি ফিরে এলে জিজ্ঞেস করি, — এতদিন কোথায় ছিলেন?

— অসুস্থ!

— এখন ভাল তো?

— হ্যাঁ, সুস্থ, ধন্যবাদ। বলে তুমি ধীরপায়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ো। আমিও নিজের কামরায় ঢুকে পড়ি। তুমি নিজের কাজ করো, আমিও খুশিমনে নিজের কাজ করতে থাকি।

একবার আমি কয়েকদিন অফিস যেতে পারি নি। একদিন তুমি আমার চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করো, ম্যাডাম অফিসে আসেন না?

— না, উনি অসুস্থ।

— আচ্ছা,... আচ্ছা... বলে তুমি নিজের কামরায় ঢুকে পড়ো।

চাপরাসী নিয়মমাফিক চিঠিপত্র দেখাতে এসে তোমার কথা বলে। পরদিন জ্বর কম থাকায় অফিসে পৌঁছে যাই। তুমি হয়তো জানতে না। দুই-তিনবার তোমাকে সামান্য কারণে চাপরাসীর উপর গর্জে উঠতে শুনি। কয়েকবার কাগজছেঁড়ার শব্দ শুনি, যেন ভুল লেখা হয়েছে। দু-একজন দেখা করতে আসা লোককে অন্যদিন আসতে বলে দিতে শুনি।

কোন কারণে তুমি বারান্দায় বেরিয়ে আসো। আমিও অজান্তেই বারান্দায় বেরিয়ে এলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তুমি জেনেশুনে জিঞ্জেস করো—এতদিন কোথায় ছিলেন?

—অসুস্থ।

— এখন ভাল তো?

— হ্যাঁ, মোটামুটি, ধন্যবাদ। এইটুকু বলেই না জানি কেন ধীরপায়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ি। তুমিও নিজের কামরায় ঢুকে পড়ো। তুমি খুশিমনে নিজের কাজ করো, আমিও নিজের কাজ করি। তবু অতৃপ্তি থেকে যায়। এই কামরা একচুলও ওদিকে যেতে পারে না। ঐ কামরাও এদিকে আসতে পারে না. মাঝখানে দেওয়াল রয়েছে। ওপাশে তুমি। এপাশে আমি।

কখনো ভাবি, এটাই কি কম যে কামরা দু'টো পাশাপাশি রয়েছে। কেবল একটা দেওয়ালই তো মাঝখানে রয়েছে !

রচনাকাল ঃ ১৯৮২

রাজিন্দর কৌর

নিজস্ব শহর

সকাল বেলায় রান্নাঘরে চা ছাঁকার সময়ই শীলা বুঝতে পারে সন্নী আর তন্নু জেগে গেছে। তন্নু জেগেই মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে। তারপর রান্নাঘর থেকে আওয়াজ পেয়ে ও দারুণ খুশী হয়ে বলে, সন্নী, মা আজ আমার কাছে শুয়ে ছিল!

সন্নী রেগে উঠে বলে, না, আমার কাছে!

তন্নু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, মা, তুমি কার কাছে শুয়েছিল?

শীলা মুচকি হেসে বলে, দু'জনের মা-ঝ-খা-নে!

ওরা জানেনা শীলা আসলে সারারাত মুকেশের বাহুপাশেই বন্দী ছিল। ওরা মায়ের জন্য কত আকুল। হয়তো দূরত্বের জন্যে ওদের আকর্ষণ বেড়ে গেছে।

সন্নী বলে, — বোন বোন, কাল রাতে মা যে গল্পটি বলেছিল?

তন্নু বলে, — সেটা কী দারুণ ছিল!

সন্নী বলে, আমাদের মা-ও দারুণ, তাই না রে?

তন্নু মাথা নেড়ে চকচকে চোখে বলে, হ্যাঁ দাদা! তন্নু আজ সন্নীর সব কথায় সায় দিচ্ছে। শীলার খুব ভাল লাগে। এমনিতে পিঠোপিঠি হওয়ায় ওরা ভীষণ লড়াই-ঝগড়া করে। কিন্তু এখন ওদের চর্চার বিষয় হলো মা, আর মা দু'জনেরই ভীষণ প্রিয়।

শীলা চা নিয়ে গেলে মুকেশ ওকে ইশারায় নিজের কাছে লেপের মধ্যে বসতে বলে। শীলা মিষ্টি হেসে বলে, সারা রাত তো বাদশার কাছে ছিলাম, এখন বাচ্চাদের কাছে গিয়ে বসি।

মুকেশ বলে, আজকাল মনের আকাঙ্ক্ষাগুলি সব মনেই থেকে যায়, কখন আসবে, এক সঙ্গে বসবো, চা খাবো আর দু'দন্ড গল্প করবো!

শীলা মনে মনে খুশী হয়, যাক্, এই দূরত্ব তবু মনের মধ্যে আমাকে নিয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা তো সৃষ্টি করেছে। ও জিজ্ঞেস করে, ব্যস, কেবল একসঙ্গে বসার আকাঙ্ক্ষা?

আর বলো না, যতটা সময় অফিসে কাটে ঠিক আছে, বাড়িতে এসে তো মনই লাগে না, ঘরের প্রত্যেক কোণায় তোমার অনুপস্থিতি আমাকে শূন্যতায় ঠেলে দেয়, তবু বাচ্চাদের জন্যে ঘরে তো আসতেই হয়।

ব্যস, ব্যস। এখন আর কিছু বলো না। এসব শুনলে আমার মন খারাপ হয়। শনিবারে এখানে

আসার পথে মনে হয় নিজের শহরে আসছি, আবার সোমবারে ফেরার সময়ও মনে হয় নিজের শহরেই যাচ্ছি! তাই মাঝেমধ্যে কোনটা নিজস্ব তা-ই গুলিয়ে যায়। যেখানে সপ্তাহের সাড়ে পাঁচদিন কাটাই সেটা, নাকি.........? বলতে বলতে শীলার গলা বুজে আসে।

ধুস্ পাগলী। তোমার শহর তো এটাই যেখানে আমরা থাকি, আমাদের বাচ্চারা রয়েছে, আমি রয়েছি। তারপর মুকেশ জোর দিয়ে বলে, চিন্তা করো না, তাড়াতাড়িই তোমার বদলি হয়ে যাবে।

— কবে? এই বদলির অপেক্ষায় আমি ঐ শহর, ঐ শহরের মানুষজনের সঙ্গে কিছুতেই মিশতে পারছি না। মনে হয়, আমি কার? কে আমার? বলতে বলতে শীলার চোখে জল চলে আসে। ওর কথা শুনে মুকেশ বলে, আমারও ভয় হয় যদি এখুনি বদলি করিয়ে না আনতে পারি, ঐ শহর হয়তো তোমাকে গিলে ফেলবে, তখন আমরাই অপরিচিত হয়ে পড়বো!

মুকেশ সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছে, না ব্যঙ্গ করে বলছে তা শীলা বুঝতে পারে না। ও হেসে বলে, আরে এখানেই তো আমার সব কিছু। এই শহরই আমার নিজস্ব, ভয় পাচ্ছো কেন বুদ্ধু, আমি তো শুধু অনুভবের কথা বলেছি।

মুকেশ বিষয় পাল্টানোর জন্যে জিজ্ঞেস করে, মা কী মন্দিরে গেছেন?

হ্যাঁ, আমার তো বিছানা ছাড়তেই ইচ্ছা করছিলো না। ভাবলাম, তুমিই বুঝি দু'দিনের অতিথিকে চা খাওয়াবে, সারা সপ্তাহ তো নিজেই করে খাই; পরে ভাবি, তুমিও তো সাবা সপ্তাহ আমার সেবা পাওনা। মনে মনে কষ্ট পাবে। মুকেশ ওর কথায় হেসে ফেলে।

শীলা যখন এ বাড়িতে নতুন বউ, সাত সকালে উঠে চা বানাতে ওব ভীষণ বিরক্ত লাগতো। এই নিয়ে কয়েকবার মুকেশের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে। ও বলতো, রাতে দস্যিপনা করে ভালমতন ঘুমুতে দাও না, আর সকাল না হতেই—ওঠো, চা বানাও। মুকেশ বলতো, এটাই পত্নীর ধর্ম, আমি তো পতির ধর্মে অবহেলা করি না, এখন অফিসে যেতে হবে, মাথায় অনেক কাজেব বোঝা।

এখন শীলা কত পাল্টে গেছে। যেদিনই এখানে আসে নিজের হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতে ওর ভাল লাগে। মুকেশের জন্যে কষ্ট হয়। ওর মা তো সকালে উঠেই স্নান-টান সেবে মন্দিবে চলে যান। কাজেই তনু আর সন্নীকে সামলানো, দুধ খাওয়ানো, স্কুলের জন্যে তৈরী করা — সব তো মুকেশকেই করতে হয়। ও কয়েকবার বলেছে, আমি কি জানতাম যে বউকে চাকুবী করালে সন্তান প্রতিপালনের পুরো হ্যাপাটা নিজেকেই সামলাতে হবে।

এখন মুকেশ জিজ্ঞেস করে, আজকের প্রোগ্রাম কি?

এই ঘরটর গোছাবো, বাচ্চাদের কিছু জামাকাপড়ের সেলাই খুলে গেছে, সেগুলি সেলাতে হবে, তোমাব শার্টের বোতামও দেখছি.......!

ওহো। এসব তো হতেই থাকবে, চলো আজ কোথাও ঘুরতে যাই।

বাচ্চারাও ঘোরার কথা শুনে লাফিয়ে ওঠে। শীলা শাশুড়ী ফেবার আগেই রান্নাঘবেব বেশীরভাগ কাজ সেরে নিতে চায়, নাহলে উনি হয়তো রাগ করবেন। মুকেশও ওকে টুকটাক সাহায্য করে। তারপর ব্রেকফাস্ট যখন প্রায় তৈরী মুকেশ ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। ওর স্পর্শে শীলার সারা শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। শীলা ভাবে, সপ্তাহান্তে বাড়ি এলে মুকেশ সবসময় রোমান্টিক মুডে থাকে, প্রত্যেক কাজে সাহায্য করে। বাচ্চাদের ঠোঁটেও মা ছাড়া আর কারো নাম নেই। এরা আমাকে চোখে হারায়। এক শাশুড়ীমাই কেবল বাচ্চাদের দুষ্টুমিব ফিরিস্তি শোনান অথবা নিজের হাঁটুর ব্যথার কথা বলেন। ব্যস, শীলা এসেছে, দু'দিন তিনি আরাম করবেন, সারা সপ্তাহ এই দুই মহাবিচ্ছুকে সামলে তিনি মহাক্লান্ত।

বাচ্চারাও এলে প্রত্যেকটি মুহূর্ত ওব সঙ্গে কাটাতে চায়, হাসি, গল্প, গল্প আর গল্প শুনতে চায়, ওদের পরস্পরের প্রতি অভিযোগ, বাবা-ঠাম্মা ও স্কুলের বন্ধুদের উপর যত অভিযোগ সব শোনায়।

শীলা তখন ঠাণ্ডা মাথায় গল্প ও নীতিকথার মাধ্যমে ওদের সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিযোগ ও মান-অভিমানের সুরাহা করে কিছুটা সময় ওদের পড়াশোনার দিকে নজর দেয়।

মুকেশ চায় শীলা সবসময় ওর কথা শুনুক, ওর কাছে বসে গল্প করুক; ওরা পরস্পরকে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে, পরস্পরের মধ্যে হারিয়ে যাবে; ওর পুরো অস্তিত্বই মুকেশ নিজের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ডুবিয়ে রাখতে চায়। ফলতঃ ও সত্যি সত্যি কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। ও টুকরো টুকরো হয়ে পড়েও কারো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না।

ফি সোমবারে বাচ্চাদু'টিকে ঘুমে রেখেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ওদেরকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করে, ভেতরে কান্নার ঢেউ খেলে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর শাশুড়ীমায়ের জন্যেও কষ্ট হয়। মুকেশের স্নিগ্ধ স্পর্শ ও আলিঙ্গন ছেড়ে যেতে মন চায় না। ও ভাবে, এই তো আমার শহর, এখানেই আমার সব কিছু!

ওকে বাসস্ট্যান্ড অব্দি এগিয়ে দিতে মুকেশও সঙ্গে বেরোয়। বারান্দায় বেরিয়েই শীলার চোখমুখে একটা বিশাল প্রশ্নচিহ্ন ফুটে ওঠে। ও জিজ্ঞেস করে, আমার বদলির কী হবে?

চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি, আশা করি এর মধ্যেই —

শীলা করুণ স্বরে বলে, বেচারা বাচ্চাগুলি খুবই কষ্ট পায় গো! ওদের মা থেকেও নেই!

মুকেশ গেট খুলে বেরিয়ে বলে, অফিস থেকে সোজা ঘরে ফিরি, দু'জনকে পড়াই। তবে তোমার মতন এত ধৈর্য আমার নেই। ভুলভাল করে সন্নী মাঝেমধ্যেই আমার পিটন খায়। তারপর কান্না — মা মা করে বিলাপ। তখন ওকে চুপ করানো খুবই কঠিন। তোমার স্পর্শে জাদু রয়েছে শীলা। অবাক হয়ে দেখি কত সহজেই তুমি বিচ্ছু দু'টিকে বশ করে ফেল। ওরা খাওয়া নিয়েও ভীষণ জেদ করে, এটা খাব না, ওটা খাব না, রোজ রোজ নতুন মর্জিমেজাজ। মাঝেমধ্যেই ওদের সামাল দিতে গিয়ে মা আর মন্দির যেতে পারেন না!

শীলা বলে, — অথচ দ্যাখো, মা নিজেই তো আমাকে চাকুরী করাতে চেয়েছিলেন। উঠতে বসতেই কথা শোনাতেন যে লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও কিছু রোজগার না করলে কী লাভ। তুমি নিজেও তাই চাইতে। এখন চাকুরী ছেড়ে দিলে তোমার ভাই এর পড়াশোনার খরচ কে পাঠাবে? আমার যে কী কষ্ট হয়, তা কে বোঝে? বলতে বলতে ওর গলা বুজে আসে। ও আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

তিন বছর নানা অফিসে দৌড়ঝাঁপ, চেষ্টাচরিত্র করে তবেই ও এই চাকুরী পেয়েছে। সে সময় কি আর জানতো যে অন্য শহরে গিয়ে চাকুরী করতে হবে। নিযুক্তিপত্র পেয়ে শীলা মনখারাপ করলে মুকেশ বলে, এখন তো গিয়ে জয়েন করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারো সুপারিশ লাগিয়ে বদলি করিয়ে আনবো। সে চেষ্টা মুকেশ আজও করে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় পথ দেখা যাচ্ছে না। শীতের দাপটে দু'জনে একরকম জড়াজড়ি করেই চলতে থাকে।

বাসের জানালার ধারের একটা সীট পেয়ে শীলা খুশী হয়। মুকেশ বাইরে জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা তখন পরস্পরের নজরবন্দী। কিন্তু অচিরেই বাসটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ওরা চোখ সরাতে পারে না। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাস বড় রাস্তায় উঠে ছুটতে শুরু করে। শীলার মনে হয় মুকেশের চোখ দু'টিও পাল্লা দিয়ে ছুটছে। ও দু'চোখ বন্ধ করে সীটে মাথা এলিয়ে দেয়। বাসের হর্ণ কিম্বা যাত্রীদের কথাবার্তা ছাপিয়ে ঘুমন্ত তনু আর সন্নীর অব্যক্ত জিজ্ঞাসা ওর অস্তিত্বে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, মা, বারবার আমাদেরকে ছেড়ে কেন চলে যাও? শাশুড়ীর অভিযোগ শুনতে পায়, আমি কি জানতাম ছাই যে এত দূরে যেতে হবে, ছাড়ো চাকুরী! আগে যেভাবে সংসার চলছিল, সেভাবেই চলুক। বুড়ো বয়সে এত কাজ আর করতে পারি না বাবা!

মুকেশও একবার আক্ষেপ করেছে, এখন আমার জীবনে শুধু অফিস আর ঘর, আর কোথাও যেতে পারি না। বন্ধুবান্ধব-আড্ডা—সব ভুলে গেছি!

ওদেরকে কে বোঝাবে যে শীলার অন্তঃশীলা মানুষটিও অন্য শহরের একাকীত্বে কত অসহায়। নানারকম উল্টোপাল্টা চিন্তা ও শঙ্কা ওকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে। আবার কখনো ভাবে, এই করেছো ভালো নিঠুর হে! চাকুরী পাওয়ার আগে কথায় কথায় মুকেশ কত মেজাজ করতো। প্রায়ই সামান্য কারণে ঝগড়া হয়ে যেত। এখনও সারা সপ্তাহ অধীর অপেক্ষায় থাকে। শাশুড়ী মায়ের অহেতুক খবরদারীও এখন সইতে হয় না। এই শহরে বদলি হয়ে এলে চাকুরীর পরেও সন্তান প্রতিপালন ও ঘরের সমস্ত কাজের ভার আমার উপর চলে আসবে।

কিন্তু তনু আর সন্নীর কথা মনে পড়লেই সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি অবশ হয়ে পড়ে, অধীর আগ্রহে পরের শনিবারেব প্রতীক্ষা শুরু হয়। ও কাতর স্বরে না জানি কতবার তাই মুকেশকে জিজ্ঞেস করেছে, এ বকম আর কতদিন চলবে?

মুকেশ বলে, খুব শীগগীরই বদলির আশা কবছি।

শীলা কাঁপা আওয়াজে জিজ্ঞেস করে, যদি বদলি না হয?

মুকেশ বলে, তাহলে চাকুরী ছেড়ে দিও। এত আস্তে বলে যে শীলাব মনে হয় ওর কথাগুলি যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

চাকুরী ছেড়ে দিলে..........? এই বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। এই জিজ্ঞাসা অন্তহীন। সেজন্যেই ও নিজেকে বোঝায়, চাকুরী ছাড়ার কী দবকার? এই বেশ আছি, যে শহরে সাড়ে পাঁচদিন থাকি সেটাও তো আমার নিজেবই শহর।

বচনাকাল: ১৯৮০

হরভজন বটালভী

সন্তান

রতন টাঙ্গা চালানো শুরু করতেই মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সকাল থেকেই ঝিমিয়ে ছিলেন, কিন্তু এখন.......!!!

বাড়ির সবাই কাঁদো কাঁদো। কিন্তু টাঙ্গায় বসার সময় তেমন কোন কথা হয়নি। অস্থির ছিলাম। মনে উথালপাতাল চলছিলো। বাচ্চারাও গম্ভীর, চুপচাপ টাঙ্গায় উঠে বসেছিল। ওদের মুঠিতে ঠাকুমার দেওয়া মিষ্টি খাওয়ার টাকা। ঠাকুমা কেন হঠাৎ করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন— তা বুঝতে না পেরে ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মায়ের কান্না আমি সইতে পারি না। রতনকে টাঙ্গা চালানোর ইশারা করি। আমার চোখে পাথর ভরা, জল বেরোয় না!

ছোট ছেলেটা আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে, বাবা, ঠাম্মা কাঁদছে কেন?"

আমি ওকে কী জবাব দেব? দশ ভাই-বোনের মধ্যে আমি চতুর্থ, কিন্তু বাকী নয়জনকে বড় করতে যত কষ্ট করেছেন প্রায় ততটাই আশা নিয়ে মা আমাকে লালন করেছেন। বাবা বিদেশে থাকতেন, গ্রামের বাড়িতে মা ও আমরা ভাই-বোনরা কাকার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। বাবা নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তবু কাকা আমাদেরকে যাতনা দিত। অর্ধভুক্ত রাখতো। একেকদিন গরুমোষ চড়িয়ে সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। ছোট ছোট হাতে কাচি দিয়ে ঘাস ও খড় কাটতে কখনো আঙুল কেটে যেত আবার কখনো হাতের অন্য কোন অংশ। কিন্তু যত কাজই করি না কেন, কাকা একদমই আদর করতো না। ওর মুখ দিয়ে গালি ছাড়া কোন কথাই বেরোতো না। কথায় কথায় ওর হাত উঠতো। মা আমাদের হয়ে বলতে গিয়ে বারবার কাকার কাছে অপমানিত হতেন। আমরা ঘাস-খড় কেটে এনে পশুগুলিকে খাওয়াতাম, কিন্তু দুধ পুরোটাই কাকা সামলে নিতেন। আমাদের ভাগ্যে এক চুমুকও জুটতো না।

একবার বাবা গ্রামে এলে মা জেদ করে আমাদের সম্পত্তি ভাগ করিয়ে নেন। তারপর থেকে মা মুরগী যেমন নিজের শাবকদের চোখে চোখে রাখে তেমনি আমাদের গায়ে কোনরকম আঁচ লাগতে দিতেন না। হাল চালানো, ঘাস-খড় কাটা আর চাষবাসের সমস্ত কাজ সীরীদের দিয়ে করাতেন। আর মা? আমাদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই আটা পিষে, ছানা কেটে, কপালে হাত বুলিয়ে আমাদের জাগাতেন। তারপর হাসিমুখে আমাদের সমস্ত আব্দার শুনতেন আর অক্লান্তভাবে আমাদের চাহিদা অনুসারে কাজ করে যেতেন। দুপুরবেলায় আমাদের স্কুলে টিফিন নিয়ে যেতেন।

আমার এক্সিডেন্ট হলে মা হাসপাতালের মেঝেতে দিনরাত এক করে আমাকে নিয়ে পড়ে থাকতেন। এত দূর থেকে বাসে করে আসতেন আর নিজের গয়নাগাটি সব বিক্রী করে নিজে খেয়ে না খেয়ে আমার জন্যে ঔষধপত্র কিনতেন, ডাক্তারের খরচ দিতেন, ফলমূল পথ্য কিনে আনতেন। এভাবেই যমে মানুষে টানাটানি করে একদিন সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে এনে বিছানায় নিজের হাতে কারুকার্য করা নকশাদার সংরঞ্জি পেতে শুইয়েছেন।

বাবা বিদেশে আরেকটা বিয়ে করে আমাদেরকে টাকা পাঠানো বন্ধ করলে মা-ই ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে দুধ বিক্রীর পয়সা, গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে বিক্রী করে তার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে আমাদের পড়ার খরচ সামলাতেন। চাকুরী পাওয়ার দিন অব্দি মায়ের স্নেহছায়াই আমাকে তিলতিল করে লালন করেছে। আমার প্রতি ওর বিশেষ দুর্বলতার জন্যে অন্য ভাই-বোনদের কাছে প্রায়ই খোটা শুনতে হয়। অথচ সব বোনের বিয়েতেই মা যথাসম্ভব হাত খুলে খবচ করেছেন। কোনরকম কার্পণ্য করেননি।

এখন আমরা সবাই সেয়ানা। বড়দা আর্মির চাকুরী পুরো করে ফিবে এসেছে। একদম ফৌজী, নিজেব বান্নাঘর আলাদা করে নিয়েছে, মাকে একবাব ডাকেও না। আমার থেকে ছোটটাও বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। কখনো বাড়িতে আসে না। তাব থেকে ছোটটা কলেজে পড়ছে কিন্তু কয়েক বছর ধরে ফর্ম ভরে কিন্তু প্রস্তুতি ভাল না থাকায় ফেলের ভয়ে পরীক্ষা দেয় না। আর সবার ছোটটা তিনবার পড়াশোনা ছেড়েছে আবার শুরু করেছে, এখন কুসংসর্গে ফেসে নিঠল্লু ঘরে বসে আছে। আমার বড় ছেলের কাছে একদিন মাকে বলতে শুনেছি, "এক তোব বাবাই মানুষেব মতন মানুষ হয়েছে, দশজনেব মধ্যে একজন!" বলতে বলতে মায়েব বুক গর্বে ফুলে ওঠে, এক মুহূর্তেব জন্যে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু তারপরই কী ভেবে আবাব মুষড়ে পড়েন।

শ-খানেক মেয়ে দেখে তারপর মা আমাব বউ পছন্দ করেছিলেন। তারপব পাবলে ছেলেব বউ-এর প্রতি কদমের নিচে হাত পেতে দিতে তৈরী হয়ে থাকতেন। আমার শ্বশুবের পরিবাব বেশ বড়। ওদের ঘরে সপ্তাহ দু'সপ্তাহে কোন উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। কিন্তু এজন্যে কখনো মায়েব মুখ কালো হতে দেখিনি। হাসিমুখে আমাকে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে জামাই-এর কর্তব্য এবং অন্য বীতিরেওয়াজ শিখিয়ে পাঠাতেন। বউমার পার্সে আলাদা করে কিছু টাকা গুঁজে দিতেন, আমাকেও দিযে বলতেন, "কোনবকম সংকোচ কববি না! দেখিস, শ্বশুববাড়িতে যেন নিজের গৌরব বজায় থাকে! নিজের পাগড়ি সামলে রাখবি!"

আমাব ছেলেদের জন্মের পর মা আনন্দে আত্মহাবা হয়ে অনেক রকমের মিষ্টিব প্যাকেট নিযে আমার শ্বশুরবাড়িতে গিযে সব্বাইকে নিজের হাতে মিষ্টি খাইযেছেন। ওদেরকে আতুড় থেকে এতবড় করে তোলাব পেছনে ওদের মায়ের যত না অবদান, ঠাকুমার পরিশ্রম তাব চাইতে অনেক বেশী। কোনদিন ওদের কাঁথাকানি এমনকি ধাইকেও ধুতে দেননি। নিজের হাতে ধুতেন, তারপর একটা শুকনো লঙ্কা বাচ্চাদের সামনে ঘুবিযে এনে চুলোর আগুনে ফেলতেন। বাথরুম ল্যাট্রিন নিয়মিত অ্যাসিড দিযে পরিষ্কার করাতেন, নিজের হাতে ফিনাইল ঢালতেন। বলতেন, ঘবে বাচ্চা থাকলে সবসময় ঘরদোর মেঝে ঝা চকচকে বাখতে হয়, না হলে কখন কিসের সংক্রমণ হবে কে জানে?

কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। কিছুদিন ধরে মা বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। হাঁটুতে হাত দিয়ে চেপে উঠে দাঁড়ালেও 'কড়াক' করে শব্দ হয়। যন্ত্রণায় ওর সমস্ত শরীর ঝাকিয়ে ওঠে। মা বলেন, "কী রে, আমি অকেজো হয়ে পড়বো নাকি, তার আগে মরে যাওয়া ভাল বাবা!" আমি মায়ের পিঠে হাত দিয়ে বলি, "তোমাকে মরতে দিলে তো!"

পরদিনই ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখাই। ওর কথা মতন এক্স-রে

ইত্যাদি করিয়ে জানতে পারি অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঘষায় ঘষায় হাঁটুর লিগামেন্টগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাড়ে হাড়ে ঘষা লেগে এই চলাফেরার কষ্ট। এর কোন স্থায়ী চিকিৎসা নেই। অথচ মায়ের পেটে আলসার রয়েছে বলে ব্যথার ঔষধও খেতে পারবেন না। দিল্লী নিয়ে গেলে অপারেশান করে কৃত্রিম মালাইচাকি লাগানো যাবে। কিন্তু তা অনেক টাকার ব্যাপার। আমি সেজন্যে আরো ভালো চাকুরীর জন্যে অন্য জায়গায় দরখাস্ত করতে থাকি। ইন্টারভিউ দিই।

এদিকে আমার শ্বশুরবাড়িতে কিসের খিচুড়ি রান্না হচ্ছিলো সে খবর আমরা জানতাম না। কিছুদিন পর প্রায় দ্বিগুণ বেতনের একটা চাকুরীর অফার পেলে সেই খিচুড়ির গন্ধ এ বাড়িতে ভেসে আসে। মা আমাকে যেতে মানা করেন। তিনি বলেন, "তোর কী দরকার বল, আমি সমস্ত গয়না বেচে তা এনে দেব,পাখির দুধ চাইলে তাই পাবি!"

আমি বলি, "তুমি বুঝছো না কেন মা, ওখানে জয়েন করলে আমি অনেক বেশী রোজগার করবো, দিল্লী নিয়ে গিয়ে তোমার হাঁটু দু'টির অপারেশান করে নতুন মালাইচাকি লাগাবো!" মা বলেন, "কিন্তু সেজন্যে তোকে শহরবাসী হয়ে পড়তে হবে, সেখানকার জীবন আলাদা, মানুষ মানুষ থাকে না, দরকার নেই বাবা আমার চিকিৎসার, ক'দিন আর বাঁচবো!"

কিন্তু যতই দিন এগোতে থাকে আমি ততোই কঠোর হতে থাকি। প্রতিদিন তখন আমাকে নতুন চাকুরী সম্পর্কে অনেক আকর্ষক কথা শোনানো হয়। আমার স্ত্রীর স্বপ্নের বেলুন প্রতিদিন আরো ফুলে উঠতে থাকে। বাড়ি-গাড়ি-টেলিফোন চাপরাসী আরো না জানি কত আরাম আর দ্বিগুণ বেতন! মাকে ভালমতন চিকিৎসাও করানো যাবে! ক্রমে মায়েব সেন্টিমেন্টকে বস্তাপচা বলে মনে হয় আর নতুন চাকুরীর পাল্লা ভারী। এভাবেই আমি একদিন সপরিবারে গিয়ে টাঙ্গায় বসে পড়ি। মনে মনে ভাবি, ওখানে একটু গুছিয়ে নিয়েই মাকে এখান থেকে নিয়ে যাব!

কিন্তু মা? মামার মৃত্যুর সময় মাকে প্রথম হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছিলাম, অনেকদিন পর আবার মাকে তেমনি কাঁদতে দেখে আমি রুমালে মুখ গুঁজে উটপাখীব মতন ঝড় থামাব প্রতীক্ষা করতে থাকি। টাঙ্গা দুলতে দুলতে চলতে থাকে।

শহরে পৌঁছে দু'দিন পরই মায়ের মৃত্যুর খবর পাই।

রচনাকাল: ১৯৭৯

বরিয়ম সিংহ সন্ধু

ভাগের মা

মোষটাকে বাইরে বের করে ভুসি এবং কুচি কুচি করে কাটা ঘাস মেশাতে মেশাতে ঘুদ্দু মোষের নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা শ্বাস দেখতে পায়। ও চেঁচিয়ে বলে, বাল্তিটা নিয়ে আয় তো!

তারপর মোষের পিঠে ঢাকা দেওয়া গোবরমাখা ফাটা সৎরঞ্জিটা টেনেটুনে ঠিক করে ঠান্ডায় জমে যাওয়া কম্পিত হাত-পা'কে কাবু করার জন্যে হাতে হাত ঘষে দু-চারবার লাফিয়ে নেয়, কুয়াশা ভেদ করে দূর দিগন্তে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে এইটুকু উত্তাপের জন্যে লালায়িত হয়। কিন্তু কুয়াশা সূর্যকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যেন কোন তাগড়া পালোয়ান অপেক্ষাকৃত দুর্বল পালোয়ানের ঘাড়ে দুই হাঁটুর বজ্রআঁটুনিতে চেপে ধরে ঝিম মেরে থাকে। ঘুদ্দুর হাত দু'টি অজান্তেই নিজের ঘাড়ে চলে যায়। কযেক বছর আগেও নিয়মিত আখড়ায় যেত, অনেকবারই ও ওস্তাদ জিন্দা পাধনীওয়ালা এবং অন্য পালোয়ানদের সাঁড়াশির মতন চেপে বসা হাঁটুর চাপ প্রত্যক্ষ করেছে। এমনিতেও আখড়ায় ও যতজনকে হারিয়েছে তার থেকে অনেক অনেক বেশী হেরেছে। এজন্যেই ওদের গ্রামের ঝর্লবুড়ো মজা করে বলতো, হ্যাঁরে ধর্মে, কত বড় শরীর তোর, প্রতিদিন যদি উল্টে পড়ার কাজই তোর পছন্দ তাহলে কুস্তি ছাড়! শরীরটাকে কেটে দু'টো মানুষ হয়ে যা—একটা হাল চালাবে, অন্যটা গরু-মোষের জন্যে ঘাস কাটবে, শালা ভগবান তোকে এক টাকারও বুদ্ধি দেয়নি!

এভাবে তিনভাই-এর মধ্যে কেবল ধর্মাই ঘুদ্দু হয়ে থেকে গেছে, অসফল মানুষ! এখন আর পালোয়ানী করে না বলে ঘাড়ে কারো হাঁটুর চাপও সহ্য করতে হয় না। তবু এ মুহূর্তে ওর ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা! এখন ওর ঘাড় কার হাঁটুর চাপে অবশ?

তখন একটা গামলায় আটা আর একটা খালি বালতি নিয়ে ওর বোন বচনো আসে, মায়ের মৃত্যুর খবব পেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, সেই থেকে এখনো আছে। ও ঘুদ্দুকে বালতি ধরিয়ে দিয়ে মোষের খাবারে আটা মেশায়।

ঘুদ্দু মোষের পিঠ চাপড়ে আদর করে নিচে বসে দুধ দোয়ানো শুরু করে। বচনো বলে, ভাই দ্যাখো, দুই দাদাই আজ আসবে,... বড়দা তো রাতেই বাসস্ট্যান্ডে নেমে কর্মসিংহের ঘরে রাত কাটিয়েছে হবে! দ্যাখো ভাই, যা হিসেব নিকেশ হবে তা ভালমতন বুঝে নিও,.. দ্যাখো, শ্রাদ্ধের খরচটাও মাথায় রেখ, ... মায়ের অস্থিও হরিদ্বারে নিয়ে যেতে হবে! .... দ্যাখো, মায়ের জন্য

মেয়ের মনই সবচাইতে বেশী কাঁদে........ কথাগুলি মনে রেখ।

ঘুদ্‌দুর রাগ ওঠে, কোত্থেকে ঠাকুমা এসছেন, আমাকে বুদ্ধি দিচ্ছেন! মুখের ভিতর উঠে আসা বিষাক্ত থুতু গিলে নিয়ে ও মনে মনে বলে, সেদিনের ভূতনী! বচনো নিজের কথা বলে যায়, ভাই দ্যাখো,..... জানি তোমার কাছে টাকা নেই......... কিন্তু কাজটাও তো সামলাতে হবে! আমি তো দাদাদেরকেও বলবো, তোমাদের সামর্থ রয়েছে, তোমরা হাত খুললে এটা কোন ব্যাপারই নয়। ওরা অবশ্য স্বভাব মতন বলতে পারে, আমরা তো কেবল খাওয়ার জন্যে গম নিয়ে যাই। ভাই তো পুরো জমিজিরেত ভোগ করছে। কিন্তু দ্যাখো, সবাই তো আর তোমার দাদাদের মতন স্বার্থপর নয়, সারা দেশে বোনরাও নিজের নিজের ভাগ নিচ্ছে, আমি তো একথা একবারও উচ্চারণ করিনি।

ঘুদ্‌দু ঠান্ডায় জমে যাওয়া ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে চেঁচিয়ে ওঠে, তো তুইও নিয়ে যাস্‌, ওরাও নিয়ে যাক্‌, কে মানা করেছে, শালার জমি কি আমাকে বাদশা বানিয়ে দিয়েছে?

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠায় আর অজান্তেই বাটে জোরে আঙুলের চাপ পড়ায় মোষটা লাফিয়ে ওঠে। ঘুদ্‌দু পেছনে চিৎ হয়ে পড়ে। বাঁচাতে বাঁচাতেও কিছুটা দুধ ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়। ও উঠে হাতের কাছে কোদাল পেয়ে তার হাতল দিয়ে মোষটাকে দু'ঘা মারে।

দ্যাখো তো, সোজা কথা বললে সবাই উল্টো বোঝে! বিড়বিড় করতে করতে বচনো বালতি নিয়ে চলে যায়। তখনই ঘর থেকে ঘুদ্‌দুর স্ত্রী বেরিয়ে এসে চেঁচায়, এই বোবা পশু তোমার কি ক্ষতি করেছে? অন্যের উপর রাগ ঠান্ডা করতে তুমি একে মারছো কেন?

ওর কথায় নিজেকে সামলে মোষটার দিকে তাকিয়ে দেখে ওটা গোবরের স্তূপের দিকে কান উঁচু করে ঘাবড়ানো চোখে ক্ষমা প্রার্থনার মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থিরথির করে কাঁপছে। ঘুদ্‌দুর ভীষণ কষ্ট হয়। কাছে গিয়ে ওর গলা ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে ওর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

তখনই দূর থেকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা যায়। ঘুদ্‌দু এগিয়ে গিয়ে গোবরের স্তূপকে গুছিয়ে একটা গম্বুজের আকার দিতে থাকে। কয়েকটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করে। কুকুরের ডাকের মধ্য দিয়ে মোটর সাইকেলের আওয়াজ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় ওদের সদর দরজার সামনে এসে থেমে যায়। ঘুদ্‌দুর স্ত্রী রত্নী মুখমাথা ওড়না দিয়ে ঢেকে গিয়ে দরজা খুলে দেখে দুই ভাসুর স্বর্ণসিংহ আর কর্মসিংহ। ওরা মোটর সাইকেলটাকে ধাক্কা দিয়ে সদরের চৌকাঠ পার করে কাঁচা উঠোনে এনে দাঁড় করায়। স্বর্ণসিংহ চশমা খুলে রুমাল দিয়ে এর কাঁচ মুছে কুয়াশা সাফ করে। তারপর গ্লাভস পরা হাতেই ওভারকোট ঝেড়ে কুচি কুচি বরফের মতন কুয়াশাবিন্দুগুলিকে সাফ করে। তারপর উঠোনে সদ্যপাতা বাবা বিশনসিংহের খাটিয়ার দিকে পা বাড়ায়। কর্মসিংহ দামী শালটাকে ঝেড়ে আবার গায়ে জড়িয়ে চৌকাঠে ঘষে ঘষে নাগরাই জুতোর নিচে লাগা গোবর সাফ করতে করতে ঘর থেকে বচনোকে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করে, ঘুদ্‌দু কোথায়?

বচনো আঙুল তুলে গোয়ালের দিকে ইশারা করে। মোটর সাইকেলের শেষ গর্জনে চমকে খুঁটি উপড়ে ছুটতে থাকা বাছুরটাকে কাবু করে ঘুদ্‌দু এখন আবার খুঁটি গাড়ছে। কর্মসিংহ ডাকে, ও ভাই পালোয়ান, এদিকে আয়, কিছু জরুরী কথাবার্তা সারি, দাদা তো আর রোজ রোজ ছুটি পাবে না।... আমারও হাজার কাজ থাকে!

আসছি! বলে ঘুদ্‌দু কী ভেবে বাছুরটার গলা থেকে দড়িটা খুলে দেয়। নিজের ছেলেকে ডেকে বলে, যা বাবা, একটা খাটিয়া বের করে ঠাকুর্দার খাটিয়ার কাছে বিছিয়ে দে।

ছেলে চারপাই বের করার আগেই বুড়ো বিশনসিংহ বলেন, দাদুভাই, চেয়ার নিয়ে আয় তো! তিনি সোজা হয়ে একপাশে সরে বসে ততক্ষণের জন্যে স্বর্ণসিংহকে বসার জায়গা করে দেন।

কিন্তু স্বর্ণসিংহ পাগড়ি ঠিক করতে করতে খাটিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আলতো হাতে নিজের দাড়িতে হাত বোলায়।

ভাইদের মধ্যে স্বর্ণসিংহই সবার বড় আর শিক্ষিত। নিজের পরিশ্রমে ও ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা করে এখন ওভারশীয়র। দু'হাতে রোজগার। শহরেই বাড়ি করেছে। একমাত্র কন্যাকে ও ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে, দুই ছেলেই চাকরিতে ঢুকে গেছে। বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর পরিবারের মেলামেশা, দহরম মহরম। গ্রামে খুবই কম আসে। যে দুই একর জমি ওর ভাগে রয়েছে ঘুদ্দুই তার দেখাশোনা ও চাষবাস করে। ও কেবল খাবার জন্যে গম নিয়ে যায়। সারা বছর ওকে বাজার থেকে গম কিনতে হয় না। তবু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বলে বেড়ায়—আমার জমি ছোটভাইকে মাগনাই দিয়ে রেখেছি।

ছেলেটা বহু বছরের পুরনো একমাত্র লোহার চেয়ারটা এনে ঠাকুর্দার খাটিয়ার কাছে পেতে দেয়। বিশনসিংহ বলেন, দাদুভাই, একটা ন্যাকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে দে। তিনি নিজের রঙচটা খাদির কাপড়ে মোড়া লেপটাকে ঠিক করে সামলান। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে পাগড়িটাকে মাথায় প্যাঁচাতে থাকেন। না জানি কেন বড়ছেলে সামনে এলে তিনি তটস্থ হয়ে পড়েন, তহশীলদার সামনে এসে দাঁড়ালে জাট কৃষকের যেরকম অবস্থা হয়। মনে হয় বড় ছেলে অন্য মাটি দিয়ে গড়া, ঝকঝকে আর মিহি, অনেকটা পুতুল বানানোর মাটির মতন। ওর হাবভাব, চলাফেরার শহরেপনার সামনে নিজেকে মলিন লাগে বলে তিনি কখনো শহরে গিয়ে ওর বাড়িতে দু'দিনের বেশী থাকেননি। ওর বাড়ি গেলেই পা ভারী হয়ে যায়, বউমা আর নাতিনাতনিরা ওকে দূর থেকে চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ওর মনে হয় মাটি খুঁড়ে গর্ত বানিয়ে থাকা খরগোশকে যেন কেউ মার্বেলপাথরের গুহায় এনে ছেড়েছে।

নাতিটা চেয়ার মুছে দিলে বিশনসিংহ বড় ছেলেকে কী বলে সম্বোধন করবে বুঝে ওঠতে পারে না। স্বর্ণসিংহ নিজেই চেয়ারে বসে পড়লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ও ভাবে, নিজের ছেলের সামনে আমার এত কুণ্ঠা কেন? ততক্ষণে কর্মসিংহ নিজেই ঘর থেকে একটা খাটিয়া তুলে এনে উঠোনে পেতে জুত করে বসে। ও ঘুদ্দু থেকে দুই বছরের বড়। লেখাপড়ায় লবডঙ্কা কিন্তু বদমাইশের শিরোমনি। স্কুলের দপ্তরী সন্তী ঝিওরীর মদতে ও নিজের স্কুলব্যাগ লুকিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে বেরিয়ে পড়তো আর ছুটির পর চুপচাপ এসে স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরতো। ঘুদ্দু ছিল ওর প্রধান শাগরেদ, সবসময় কর্মার পেছন পেছন ছায়ার মতো ঘুরতো। এক সঙ্গেই স্কুলে যেত আর কয়েকবছর না পেরোতেই স্কুলের পাট চুকিয়ে ঘর-সংসারে হাত লাগায়।

কর্মা চোরাপথে পাকিস্তানের সঙ্গে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা করে অল্পবয়সেই অনেক রোজগার করে, আর ঘুদ্দু আখড়ায় গিয়ে নিয়মিত পালোয়ানির অভ্যাস করতে থাকে।

কর্মা এখন পাশের গ্রামেই বড়রাস্তার চৌমাথার কাছে বড় বাড়ি করে বেশ রোয়াবে বসবাস করে। বাড়ির পাশেই একটা ডেয়ারিফার্ম আর একটা পোল্ট্রি খুলেছে: এগুলি ওর সাদা রোজগার। কখনো কখনো বর্ডার টাইট থাকলে এগুলির আয় থেকেই হেসে খেলে চলে যায়।

শুধু পালোয়ান ঘুদ্দু কুস্তি লড়তে লড়তে কেবল ঘুদ্দুই থেকে গেছে। কিছুদিন পর বাবার হাতের হাল ওর হাতে চলে আসে। ঝর্লবুড়ো ওকে মজা করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে হাল চালানো ও ঘাস কাটার কাজ করতে বলেছিল। এখন ঘুদ্দু সত্যি সত্যিই চাষবাসের কাজে দু'জন মানুষ থেকেও বেশী পরিশ্রম করে।

বাছুরের খোঁটাকে ভাল করে মাটিতে পোতার জন্যে ও মুগুরের আঘাত করলে মাথা ঝনঝনিয়ে ওঠে। যেন ওর মাথাতেও কেউ মুগুর মারছে আর ও খোঁটার মতন মাটির গভীরে ধসে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবে, ওদের সঙ্গে কী কথা বলবো? ওরা এক একজন ধূর্তের শিরোমণি!.... ওফ্!

নিজেরই ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলতে আমাকে ভাবতে হচ্ছে!

বড়দার উপর ওর রাগ সবার কাছে ঘুদ্‌দুকে অনাথের মতন পেশ করে বলে। সারা বছরের ফসল নিয়ে গিয়েও এমন ভাব করে যেন ঘুদ্‌দুকেই সমস্ত জমিজিরেত দান করে দিয়েছে। কর্মসিংহও ভাগের ফসল সব গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যায় আবার বলে, ঘুদ্‌দুর হাতে বরকত নেই, অভাগা বেচারা, নিজের জন্যেও তেমন কিছু বাঁচাতে পারে না।

গতকালই ও মায়ের অস্থি উঠানোর সময় ভগ্নীপতিকে বলছিল, বুঝলে ভাই, এবার ভাবছি নিজেই ট্রাক্টর চালিয়ে ভাগের দুই একরে ঘাসের আর নাইল্যার চাষ করবো। ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করে কী লাভ?

বচনোর বর বলে, তা মন্দ নয়...... ভালই হবে, ঘুদ্‌দুকে কম পরিশ্রম করতে হবে। এসব ঠেস মারা কথা শুনে ঘুদ্‌দুর মনখারাপ লাগে। ও চুপ থাকে। জমি তো এমনিতেই কম, এই দুই একরও যদি হালের নীচ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে খাবে কি? ওদের সারা বছরের প্রয়োজন ফুরোলে যে সামান্য ফসল বাঁচে তারই লোভে ঘুদ্‌দু এত পরিশ্রম করে।

কিন্তু দাদাদের মুখের উপর ও কিছু বলতে পারে না। বাবা কিম্বা বোন-ভগ্নীপতিদের কাছেই নিজের দুঃখের কথা বলে, ওদেরই শলাপরামর্শ নেয়। সেই ভগ্নীপতিই কর্মসিংহের অদ্ভুত প্রস্তাবে সায় দিলে ওর খুব খারাপ লাগে। তাহলে বচনো ওকে আর কী ছাই সাহায্য করবে! এমনিতেই ওর অভিযোগ, বড় দাদা-বৌদিরা মাঝেমধ্যেই আমার শ্বশুরবাড়ি ঘুরতে যায়, দুঃখ-সুখে পাশে দাঁড়ায়, বছরে দু-এক জোড়া স্যুটও উপহার দেয়। কিন্তু ঘুদ্‌দুর বিপদে পাশে দাঁড়ানো দূরের কথা — আমার ছেলে হলে চারটে চিথ্‌ড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনদিন হাত খোলেনি, মিথ্যে বললে আমার জিহ্বা পচে যাবে! কোনদিন ভাগ্নেকে একজোড়া জামাকাপড়ও ছোঁয়ায়নি, মামার বাড়ি ঘুরতে এলে দু'টো টাকাও ওর হাতে গুঁজে দেয়নি! দ্যাখো না... আমাদেরকে তো আর ভরণপোষণ দিতে হয় না......... কিন্তু ভাইবোনের একটা যে মিষ্টি সম্পর্ক রয়েছে, বাপের বাড়িতে মেয়ের যা আদর তা আমার কপালে নেই! বলতে বলতে ও উড়নার খুঁট দিয়ে চোখ মোছে।

তাই বচনোর প্রতি তিক্ততা ঘুদ্‌দুর মনে ছেয়ে থাকে, সেদিন মায়ের সৎকারের আগে মায়ের কাণের দুলগুলি খুলে বচনো মেজবৌদির হাতে দিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও মায়ের উপরও রেগে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মায়ের বলিরেখাপূর্ণ চেহারা আর স্নেহময় দৃষ্টি স্মৃতিপটে ভেসে উঠলে ও নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। এক মা-ই ওকে বুঝতেন, ভালবাসতেন। তাই সবসময় ওর পক্ষ নিয়ে বলতেন। যে কথা যাকে যে ভাষায় যত জোরে বলা উচিত মা তার থেকেও বেশী জোরদার আওয়াজে কথাগুলি বলতেন। তিনিই কেবল ঘুদ্‌দুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন এ আমার সাদাসিধে ভোলেভালা শিব...... তোরা তো খালি সবসময় কাঁটার মতন খোঁচা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

ঘুদ্‌দুর আফসোস ও সারাজীবন মায়ের কাছে থেকে কেবল মরার সময় কাছে ছিল না। দু'মাস আগে হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বড়দা ফসল নিতে গ্রামে এলে জোর করে মাকেও চিকিৎসার জন্যে শহরে নিয়ে গিয়ে বড় হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বুড়ো শরীরে রোগ ও চিকিৎসার ধকল সইতে পারেন নি।

এখন বাকী বিশন সিংহ, ঘুদ্‌দুর কষ্ট বোঝেন। ওর কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে ভাবেন। কেননা তিনি নিজে সারাজীবন চাষের কাজ করেছেন। কিন্তু বেচারা বড় দুই ছেলের টাকা-পয়সা ধনদৌলতের চাপে তটস্থ। ওদের সামনে মনের কথা খুলে বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

কর্মসিংহ আবার ঘুদ্‌দুকে ডাকে, কিরে, মায়ের শিবঠাকুর, আয় ভাই...... তখন থেকে গোয়ালে কী করছিস? আমাদের আরো অনেক কাজ রয়েছে যে!

ঘুদ্‌দু মাটিমাখা হাত দু'টি কোমরে জড়ানো চাদরে মোছে। তারপর ধীরে ধীরে উঠোনে এসে

ওদের পাশে দাঁড়ায়।

বসে পড়! কর্মসিংহ ঘুদ্দুকে খাটিয়ায় বসার ইশারা করে। বচনোও নিজের ওড়না সামলে বাবার কাছ ঘেঁষে বসে।

কর্মসিংহ বলে, বাবা, দাদা কাল রাতেই আমার ওখানে এসেছে, আমরা আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

বিশন সিংহ দাড়ি চুলকে বলেন, বলো তোমরা, কী বলবে?

দেখুন, আমরা সবাই শান্তিতে শলাপরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত নেব, সেটাই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে!

ও একবার থেমে সবাব মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে। তারপর গলা ঝেড়ে বলে, প্রথম কথা মায়ের শ্রাদ্ধ ধুমধাম করে করবো.... সমস্ত আত্মীয়বন্ধুরা আসবে। বুড়ি ভাগ্যবতী, নাতিপুতি দেখে নিজের বয়স পাব করে গেছেন, ... ধুমধাম তো করতেই হবে তাই না? কী বলেন?

না বাবা! বিশনসিংহ কাঁপা কাঁপা ভাঙ্গা আওয়াজে বলেন, আমি বলি কি, আমাদের মতন সাধারণ ঘরে আবার ধুমধাম কিসের?

স্বর্ণসিংহ বলে, আমিও কর্মাকে বলেছি বাবা, ফালতু টাকার শ্রাদ্ধ হবে.... আমার মত নেই!

কী যে বলো দাদা, আত্মীয়রা বলবে, ছেলেরা ভাল রোজগার করে, মায়ের জন্য এইটুকুও করবে না? তুমি উচ্চশিক্ষিত বলে তোমার কাছে টাকার শ্রাদ্ধ মনে হতে পারে কিন্তু এখানে লোকেরা ঠাবে ঠোরে আমাদেবকে শোনাবে।

বচনো আরো উঁচু আওয়াজে বলে, কী যে বলো বড়দা, মেজদাই তো ঠিক বলেছে..... ওদিকে আমার শ্বশুববাড়িব লোকেরা তো প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে! নাহলে ছোট বড় জায়েদের সামনে আমার মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না!

ঘুদ্দু বুঝতে পারে, ওরা বিশনসিংহ মারফৎ ওর সঙ্গেই কথা বলছে। ওর এই মুহূর্তে বচনোকে কষে এক থাপ্পড় মাবার ইচ্ছে করে। বড়দা তো ঠিকই বলেছে, টাকার শ্রাদ্ধ. ঘুদ্দু নিজের ভাঙ্গা ঘরেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্বর্ণসিংহ বলে, তাই বলে আমি পিছিয়ে যাব না, যতটা খরচ আমাব ভাগে আসবে বলো, কিন্তু আমার........!

ঘুদ্দু আশা কবেছিল বড়দা যখন একবাব বলেছে, নিশ্চয়ই বাজে খরচের বিরোধিতা করে যাবে। কিন্তু অবলম্বনের একমাত্র দড়িটি হাত থেকে ছুটে গেলে ও সোজা কুয়োর ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে।

নিদেনপক্ষে পাঁচ-সাত হাজার তো লাগবেই! আর দাদা বলছিল, মায়ের চিকিৎসার পেছনে সাতাশ-শো টাকা খরচ করেছে। আমাদের তিনজনের ভাগে ন'শো কবে আসে। কর্মসিংহ জলের মতন হিসেব বুঝিয়ে দেয়। চিকিৎসার খরচ ভাগ করার কথা শুনে ঘুদ্দু পরবর্তী আঘাত পায়। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটে। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না!

বিশন সিংহ হিম্মত করে বলেন, মায়ের চিকিৎসার জন্য খরচ করেছে তো কী হয়েছে? ঘুদ্দু যে সারাজীবন মাকে রুটি খাইয়েছে!

বাবার কথা শুনে বচনো এবার চাদরের ভেতর থেকে দুই হাত বের করে ঝগড়ুটে মহিলাদের মতন হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে, দ্যাখো বাবা, একথা ঠিক নয়। .... ও রুটি খাইয়েছে ঠিকই কিন্তু মা সারাজীবন ওর সংসারেরই ঘানি টেনেছে, ওবই ছেলেপিলে সামলেছে, গু-মুত সাফ করেছে! তাছাড়া মা-বাবার ভাগের জমিও —

তুই চুপ করবি? বড় এসেছে উকালতি করতে!

বোনকে শাসিয়ে এই শীতল সকালেও ঘুদ্দুর মাথা গরম হয়ে ওঠে। বচনোও ওর শাসানিতে রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে, আমি এখানে বসবোই না, আমাকে ও শত্রু ভাবে।

উত্তপ্ত পরিবেশকে শান্ত করতে কর্মসিংহ দু'জনকেই হাত নেড়ে ইশারায় শান্ত হতে বলে। কিন্তু বচনো অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, দ্যাখো বাবা, এই জমিতে আমারও ভাগ রয়েছে। উকিলনী তো উকিলনীই সই, আমি আমার ভাগ ছাড়ছি না।

কর্মসিংহ পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে বচনোকে বলে, রাগের কথা ছাড়, এসব পরে আলোচনা করা যাবে!

তারপর ও ঘুদ্দুকে বলে, দাদার সময় কম, ... এখন বল, বুড়ির অস্থি তুই গঙ্গায় নিয়ে যাবি না আমাকে যেতে হবে?

দু'মিনিট ঘুদ্দু থম মেরে বসে থাকে। ওর মনে অনেক ভাবনা পরস্পরকে দাঁত খিচিয়ে কামড়াতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের কুয়াশা ভেতরে ছেয়ে যায়। ও বোবা হয়ে পড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে। ও একদম উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দ্যাখো দাদা, ... তুমি তো সবই জানো। আমরা এমনিতেই মরে আছি—গঙ্গায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না!

ও একটু থেমে থুতু গিলে বলে, যদি এখানেও ভাগের প্রশ্ন আসে তাহলে মায়ের অস্থি তুমি গঙ্গায় বিসর্জন করে এসো, বাবা মারা গেলে আমি একাই গঙ্গায় নিয়ে যাবো!

ওর কথা শুনে বাবা ও দুই বড় ছেলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কিন্তু ঘুদ্দু বলতে থাকে, তোমরা জানো আমি সত্যি কথা বলছি, এখন আমার ক্ষমতা নেই!... এই চুক্তিতেও যদি কোন আপত্তি থাকে তো সর্দারজী, ওই খুঁটিতে আমার ভাগের অস্থি লটকে দাও,..... যেদিন আমার ক্ষমতা হবে সেদিনই যাবো!

এটুকু বলে চোখ মুছতে মুছতে ও ঘরে ঢুকে পড়ে।

তখনো কুয়াশার বজ্রআঁটুনি থেকে সূর্য নিজের ঘাড়টাকে মুক্ত করতে পারেনি।

রচনাকাল : ১৯৮৩

স্যুট : পাঞ্জাবে কোট-প্যান্টের মতন মেয়েদের সালোয়ার কামিজকেও একত্রে স্যুট বলে
চিথড়ে : পুরনো কিম্বা ছেঁড়া কাপড়, এখানে কমদামী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

গুরুমেল মডাহড়

পূরবিয়ে

কাকীমার বড়ছেলে বিদেশ গেছে। সারাদিন তার গল্প ফুরায় না। কখনো পাড়ার সমস্ত মহিলাদের মাঝে বসে গলির মধ্যে বেপরোয়া হাত-পা নেড়ে গল্প করতে থাকে। পথচারীদের বেশ কষ্ট করে আসা-যাওয়া করতে হয়। ছুটির দিনে কখনো কখনো আমিও সময় কাটানোর জন্যে ওর কাছে গিয়ে বসি। জিজ্ঞেস করি, — দাদার চিঠি এসেছে?

— হ্যাঁ বাবা, কালই এসেছে, সঙ্গে দু'হাজার টাকা, আমার জন্যে গরম শাল আর ছোটুর জন্যে টি-শার্ট পাঠিয়েছে!

কাকীমা দ্রুত ঘরে ঢুকে শাল আর টি-শার্ট এনে দেখায়। আমি আঙ্গুল ছুঁইয়ে দেখি। — হ্যাঁ কাকীমা,........ বেশ ভাল কাপড়!

— শালটা কী গরম, আর টি-শার্টটা ছোটু বলছিল খাঁটি নাইলনের!

— আহো, শালটায় তুমি ডাল রেখে গরম করে নিতে পারবে!

— মারবো এক চড়, তুই কি আমাকে শাল পেয়েছিস? ওর ভালবাসামাখা বকুনি ভাল লাগে। সেজন্যে সময় পেলেই ওর কাছে গিয়ে বসি, ওর মুখে বড়ছেলের বিদেশ থেকে লেখা নানা অভিজ্ঞতা শুনি। হাসি মজা চলতে থাকে। দেখতে দেখতে সপ্তাহ-মাস-বছর পেরিয়ে যায়।

একদিন ঐরকমই মহিলাদের আড্ডায় ওকে বলতে শুনি, — ও গাড়ি কিনেছে, একটা বাঙলোও নাকি কিনবে!

এক মহিলা বলে, — খুব ভাল কাকী, ওদেশে করিৎকর্মা লোকের বাঙলো কিনতে আর কতদিন!

— আমার ছেলে বেতনও ভাল পায়। দু'মাসও হয়নি এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিল, গতকাল আরো দু'হাজার এসেছে। একেবারে চমকে দিয়েছে। এসময় কাকীমার অঙ্গভঙ্গী দেখার মতন!

— আপনারাও তো ছেলের লেখাপড়ায় কম খরচ করেননি,..... তারপর বিদেশে পাঠাতেও তো অনেক —

— হ্যাঁ বেটি, বিদেশ পাঠাতে আর পাসপোর্ট বানাতে জমি বন্ধক রাখতে হয়েছে! কাকীমার চোখে জল চলে আসে।

— ছেলে মানুষ হলে, লায়েক হলে সমস্ত জমি জিরেত অনায়াসে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়!

— সে তো বটেই, অনেক মেম ওর পেছন পেছন ঘোরে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ছেলে বলে যতক্ষণ মা না বলবে আমি বিয়ে করছি না!

মানো নামে বউটি নিজের দোপাট্টা সামলাতে সামলাতে বলে,

— তোমারই উচিত কাকী ছেলেকে এবার বিয়ে দেওয়া। প্রতিদিন বয়সটা তো কমছে, তাই না?

— তা তো দেবই, আগামী মাসে দেশে ফিরছে, আমরা মেয়ে দেখে রেখেছি, কলেজে পড়ায়!

কিছুদিন পরই ওদের বাড়িতে চুনকাম শুরু হয়ে যায়। কোথাও কোথাও দেওয়াল ভেঙ্গে নতুন করে দেওয়াল গড়ে বাড়িটাকে সুবিধামতন সাজানোর চেষ্টা চলতে থাকে। জানালাগুলির ভাঙ্গা ও পুরনো কাচ পাল্টে নতুন ঘষা কাচ লাগানো হয়। বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে পাশের পাড়ার এক মহিলা কাকীমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, — কী ব্যাপার, খুব সাজগোজ চলছে? কাকীমা মহাউল্লাসে জবাব দেয়, — বড়ছেলে আসছে, ওর বিয়ে দেব, ঘরদোর তো একটু গোছাতেই হবে, ও-তো আর আগের মতন নেই, তার উপর বড়ঘরের বেটিকে বউ করে আনবো! ওখানে তো ও নিজস্ব বাঙলোয় থাকে, নিজের গাড়ি চালিয়ে কাজে যায় আর নরম নরম কী যেন বলে......? কাকীমা নিজের কপাল চাপড়ে বলে, — আরে কী যেন নাম ওটার, মাথার ঘিলু শুকিয়ে যাচ্ছে — বুড়ো হয়ে যাচ্ছি মা..... স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে নাকি আমার?

কাকীমার এই দশা দেখে আমার হাসি পায় আবার কষ্টও হয়। তাই চেঁচিয়ে বলি, — স্পঞ্জ, কাকীমা!

— আহো, সপন্‌জ, সপন্‌জের গদীওয়ালা বিছানায় শোয়। ওর কথা তো আমাদের ভাবতেই হবে। কী বলো মা?

— তা তো ঠিকই! বলতে বলতে বউটি এগিয়ে যায়। কাকীমা পেছন থেকে বলে, — দাঁড়াও মা, চা খেয়ে যাও! কিন্তু বউটি ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

দেখতে দেখতে সেই দিনটিও চলে আসে। কাকীমার সোনাছেলে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে ফেরে। মা-কাকীমাদের ভালমন্দ রান্নার ধুম গ্রামের বাতাসে খুশীর সুরভি ছড়িয়ে দেয। ছোটু নিজেদের সবচাইতে তাগড়া মুর্গার গলা কাটে। কাকু তো আগে থেকেই এক ফৌজি বন্ধুর মারফতে পাঁচ-সাত বোতল রাম জোগাড় করে রেখেছে।

এখন বাড়ির সবাই ওকে ঘিরে আছে। প্রতিবেশীরা ভিড় করে আছে। গ্রামের অনেকে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসে দূর থেকে দেখেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আমিও ওর কাছে বিদেশের গল্প শোনার জন্যে বসে আছি। কিন্তু কাকীমা ওকে নিজের মত করে কথা বলতেই দিচ্ছে না। আমার, কাকীমার ওপর রাগ হয়। এতদিন পর ছেলেকে পেয়ে কোথায় ওর কথা শুনবে, না বড়লোকের বেটি প্রফেসর বউকে ঘরে আনার স্বপ্নে মশগুল হয়ে ছেলেকে খালি মেয়ের বাড়ির বর্ণনা শোনায়, ধনসম্পত্তির কথা বলে।

ওর ছেলে কিন্তু কোনমতেই বিয়ে করতে রাজী হয় না। বারবার অন্য প্রসঙ্গে যেতে চায়। আমরা উৎকর্ণ থাকি। কিন্তু কাকীমার মুহুর্মুহু বিয়ের প্রস্তাবে উত্তক্ত হয়ে একসময় বলে, — আরে মা, চুপ করো না, অন্য কথা বলো, বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে!

— মানে! আমরা স্তম্ভিত। ঘরে ঝড়ের আগের নীরবতা। সবাই থ। কাকীমা এবার ফেটে পড়ে, — কী বললি? তোর আক্কেল তো মন্দ নয়, শিখের ছেলে হয়ে সোনালী চুলের মেমকে বিয়ে? এখানকার মেয়েরা কি মেমদের থেকে কোন অংশে কম? তুই লিখে তো দেখতিস্! আমরা একটাব থেকে আরেকটা পরীর মতন বউ আনতাম!

— আমার কথা শোন মা,...... বিয়ে আমি শখ করে করিনি!

— তাহলে? আমাকে কাঁদানোর জন্যে করেছিস্? বলতে বলতে কাকীমা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

— মেয়েটা ভাল মা, ভারতীয়দের পছন্দ করে, ভাল রোজগার করে, ওকে বিয়ে করেছি আমাদের দারিদ্র্যকে ধুয়ে মুছে ফেলার জন্যে!

— ছাই ধুবি তুই দারিদ্র্য! মুখ দেখানোর উপায় রাখিস্ নি তুই !

কাকীমার কান্না এবার বিলাপের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সবাই একে একে উঠে পড়ে। ঘর খালি হয়ে যায়। মা ও প্রতিবেশীনীবা কোনকিছু বলে কাকীমাকে শান্ত করতে পারে না। কাকু বাইরের খাটিয়ায় থম হয়ে বসে থাকে। তখন অনেকদিন পর দেশে ফেরা মানুষটির মুখে নানা রেখা খেলা করতে থাকে। একসময় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও আমাকে বলে, — চল্ তো বাইরে ঘুরে আসি।

আমি নিঃশব্দে ওর সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসি। অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটি। চলতে চলতে নিজেদের পাড়া ছাড়িয়ে দিগন্তবিস্তৃত গমক্ষেতের বুক চিরে বড়রাস্তার কাছে চলে আসি। নৈঃশব্দ কাটাতে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, — ওখানে ভারতীয়দের অবস্থা কেমন? আমাব প্রশ্ন শুনে ও আরো গম্ভীব হয়ে যায়। ওর চেহারায় আবার ভাঙচুর লক্ষ্য করি। চোখ ছলছল করে। তখনই ও জিজ্ঞেস করে, — এখানে আবার কারা থাকে?

ওর ইশারা একটা ছোট্ট ঝুপড়ির দিকে। বড়রাস্তার পাশে পলিথিনের একচালা ঘরটার ভেতরে একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে। তার আলোতে ছ'সাতজন মানুষকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখা যায। আব বাইরে তিন ইটের খড়কুটো আর শুকনো ডালপাতা গুঁজে দু'জন মোটা মোটা রুটি সেঁকছে।

— ওরা পূরবিয়ে, বিহাব-উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিক!

ও করুণ হেসে বলে, — ব্যস, পাঞ্জাবের স্থিতি অনুযায়ী এখানে ওদের যেরকম অবস্থা — পশ্চিমদেশের স্থিতি অনুযায়ী ওখানে পূর্বদেশীদের অনেকটা এরকমই বেঁচেবর্তে থাকা!

বচনাকাল : ১৯৮৩

দেব ভরদ্বাজ

দ্রোণাচার্য হাজির হো!

আজ আমি খুব ভোরে জেগেছি। কোনদিনই এত সকালে উঠি না। আজ বাধ্য হয়েছি। অথবা বলা যায় কাল রাতে ভালমতন ঘুমুই-ইনি। যখন কারো দরজায় বিপত্তির করাঘাত বাজে আমরা সব আরাম আয়েসকে ভুলতে বাধ্য হই।

আজ আদালতে হাজির হতে হবে। যদিও এই হাজির হওয়ার ব্যাপারটা আমারই আর্জির প্রতিফল। আমি নিজেই আইন প্রক্রিয়াকে আমার জীবনে আহ্বান করেছি। এখন আদালতের কথা ভাবতেই ভেতরে কাঁপুনি হয়। সমস্ত সত্তায় বিরক্তি ছেয়ে যায়।

এই দরখাস্তটা অনেকদিন আগেই জমা দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমার প্রতি হওয়া অন্যায়ের রাগ রক্তে লালন করে অসংখ্যবার আমি নগর আদালতে ধর্ণা দিয়েছি । বারবার হতাশ হয়ে শুনানির জন্যে ধার্য নতুন তারিখ নিয়ে ফিরেছি।

এই একের পর এক নতুন শুনানির তারিখ পাওয়ার প্রক্রিয়া অন্তহীন। বারবার আদালতে গেলে না জানি কেন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। যদিও আমার আদালত যাওয়া আর কোন অপরাধীর যাওয়া এক নয়, তবুও মনের কোন এক অজানা কোণায় এক অপরাধবোধ জেগে ওঠে। আমি আইনের কাছে সুবিচার চেয়ে দরখাস্ত লিখেছি। আইনের দরবারে প্রত্যেক দরখাস্তই প্রার্থনা মাত্র। এই 'প্রার্থনা' শব্দের আর কোন সম্মানজনক প্রতিশব্দ নেই কি? এই শব্দটাই হয়তো আমার মনে অপরাধবোধের জন্ম দেয়। তুমি আদালতে সুবিচারের জন্যে যাও অথবা কোন অন্যায়ের শাস্তি নিতে তোমাকে লিখতেই হবে, হুজুরের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে,...... ইত্যাদি। তার ফলস্বরূপ এই সাতসকালে শয্যাত্যাগ। যদিও এখন অব্দি একতিলও অগ্রসর হতে পারিনি, অন্তহীন তারিখ প্রাপ্তি প্রক্রিয়ার শিকার হয়েছি, তবুও আদালতের তারিখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়াই উচিত মনে করি। কেননা, আদালত খুলতেই আমাকে হাজিরা দিতে হবে। গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে পড়তে হবে। কে জানে কখন ডাক আসে। আদালতে সময়ের মা-বাপ নেই। নিজের নামটি শোনার জন্যে দারোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। মাঝেমধ্যে তো সারাদিন তটস্থ থেকেও কোন লাভ হয় না। তখন মনে হয় আদালত পুরো দিনটাকেই খেয়ে নিলো। আমি আবার পরের তারিখের অপেক্ষায় থাকি। সেই বিশেষ দিনের আগের রাতে ভালমতন ঘুম হয় না। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে যথারীতি তৈরী হয়ে আদালত পৌঁছে যাই। কিছুদিন পর এটা আমার অভ্যাসে

দাঁড়িয়ে যায়। মাঝেমধ্যে তো অপেক্ষাও করি না। অপেক্ষার চাপে আগের মতন আর কষ্ট পাই না। কয়েকঘন্টার অপেক্ষা অথবা হয়তো পুরো দিনটাই দাঁড়িয়ে কাটালাম — সব আমার সহ্যের সীমানায় এসে গেছে। বরঞ্চ কোনদিন যেতে না যেতেই পরবর্তী তারিখ পেয়ে গেলে হতভম্ব হয়ে পড়ি। সেদিন আর কী করবো বুঝে উঠতে পারি না। এমন একটা মানসিক স্থিতি হয় যেন সেদিন আদালত আমাকে প্রতারণা করেছে। দিনের বাকী সময়টা কাটানো আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ে।

এরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা তিনবার কি চারবার হয়েছে। সেদিন যেতেই দারোয়ান আমাকে ডাকে। পেশকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার সই নিয়ে বলে দেয়, আজ হুজুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারে বসবেন বলে আজকের সমস্ত কেসের শুনানি পরে হবে, এরপর অমুক তারিখে আসবেন!

যাদের তারিখ ছিলো কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না আজ হুজুর এমন কী বিচারে ব্যস্ত যে সবারই তারিখ পাল্টাতে হলো। আইনের দরবারে উকিলদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুনে বুঝেছি, কোন এক দ্রোণাচার্যের বিচার হবে! ওরা বলে, তিনি নাকি বিরাট তীরন্দাজ! চোখে কাপড় বেঁধে দিলেও যে কোন লক্ষ্যবস্তু অনায়াসে ভেদ করতে পারেন! একবার নাকি কোন এক রাজকুমারের আংটি কুয়োয় পড়ে গেলে তিনি তীর ছুঁড়ে তুলে ফেলেছিলেন! একটার পেছনে আরেকটা, তার পেছনে আরেকটা এমনি নির্ভুল উৎক্ষেপণে একটি লম্বা কাঠির মতন বানিয়ে তারপর তিনি আংটিটা তুলেছিলেন। সেই থেকে ওর খ্যাতি দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে যায়।

যে কোন বিদ্যায় পারদর্শী হলে সুখ্যাতি ছড়াবেই। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েও ধনুর্বাণে পারদর্শিতা দ্রোণাচার্যের জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। দারিদ্র্যের কোপে পড়ে একদিন যিনি নিজের ছেলে দুধ খাওয়ার আব্দার করলে পিটুলি গোলা খাওয়াতেন তিনি হলেন রাজপুত্তুরদের অস্ত্রগুরু। রাজপুত্র ছাড়া কতিপয় উচ্চবর্ণের ধনী-সন্তানরাই শুধু ওর কাছে অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ পায়।

কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার স্বপ্ন তো অন্যরাও দেখতে পারে! আর যে কোন বিদ্যায় পারদর্শি মানুষ চায় একই বিদ্যায় আরো পণ্ডিত কারো সঙ্গ পেতে। দ্রোণাচার্যের জীবনেও এমনি দিন আসে। একদিন অরণ্যে দেখা হয় এক আশ্চর্য তরুণের সঙ্গে। তাঁর অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দ্রোণাচার্যকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। সেই মহাধনুর্ধর একলব্যের সঙ্গে কথা বলে তিনি শোনেন যে তাঁরই মূর্তি বানিয়ে তাঁর সামনে অস্ত্রসাধনা করতে করতে এত ভাল তীর চালানো শিখেছে! এই তরুণ কোন রাজবংশ বা উচ্চবর্ণের সন্তান নয়। অস্পৃশ্য জাতের ছেলে একলব্য কোনভাবেই দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব পেতে পারে না। দ্রোণাচার্যের প্রিয়তম ধনী শিষ্যরা গুরুর কাছে প্রতিবাদ করে। দ্রোণাচার্য তখন একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা হিসেবে ওর ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল চায়। এক ধনুর্বীরের কাছে তার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল চায়! এক ধনুর্বীরেব কাছে ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলই তো মূল অঙ্গ। কিন্তু একলব্য গুরুর এই অন্যায় আব্দারে সায় দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয়। তার দুঃখে সমস্ত অরণ্য কাঁদতে থাকে। সমস্ত জীবজন্তুরা দ্রোণাচার্যকে ধিক্কার দেয়। একলব্য আর কী করবে! বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া তাঁর সমস্ত স্বোপার্জিত বিদ্যা, সমস্ত পরিশ্রম ও সাধনা বিফল হয়ে পড়ে। তার ধনুর্বাণ কুড়েঘরের এক কোণায় অসহায় ঝুলতে থাকে।

দুঃখী যুবক তখন তীর ধনুক ভুলে অন্য বিষয়ের পুঁথি পড়তে শুরু করে। পড়তে পড়তে জানতে পারে, কলম নাকি তলোয়ারের থেকেও বেশী ক্ষমতাবান। পড়তে পড়তে ও বিজ্ঞদের মধ্যেও বিজ্ঞতম হয়ে পড়ে। আইনের চর্চায় সফলতা লাভ করে। এক সুযোগ্য বিচারকের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের নগর আদালতে বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পর একলব্য একদিন দ্রোণাচার্যের নামে শমন জারি করে। দ্রোণাচার্য সেই শমনকে অগ্রাহ্য করে। সাধারণ মানুষ বলে, ... দ্রোণাচার্য আদালতে আসবে না, দ্রোণাচার্য আসতেই পারে না! এখন যেদিনই দ্রোণাচার্যের তারিখে আমার

বা অন্য কারো তারিখ ভুল করে পড়ে যায় তাদেরকেই নতুন তারিখ দেওয়া হয় আর আদালত ও হাকিম সাহেব সারাদিন দ্রোণাচার্যের অপেক্ষা করতে থাকে। আমাকে পেশকার তাড়াতাড়ি পরবর্তী তারিখ জানিয়ে দিলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভেবে পাইনা বাকী সারাদিন আমি কী করবো!

আমার দুঃখের কথা শুনে আর বারবার প্রতারিত হওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে একদিন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে দিয়ে আর একটা দরখাস্ত লিখিয়ে তার নিচে এক উচ্চপদস্থ আমলার মুসাবিদা লিখিয়ে হাকিমকে জানায় যাতে আমার কেসটার দ্রুত নিষ্পত্তি করে। এই মুসাবিদা লেখাতেও অবশ্য আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। অনেক জরুরী কাজ মুলতবি রেখে আমি বন্ধুর সাহায্য ও মুসাবিদা পেতে উঠে পড়ে লেগে একদিন সফল হই।

এই চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি বুকভরে শ্বাস নিই। এবার আদালতে গেলে চোখের পলক পড়ার আগেই হয়তো আমার কেসটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে! আর দারোয়ানের সোনামুখ থেকে একটিবার আমার নাম শোনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন আদালতের সামনে হত্যে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না!

আজ সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ঐ চিঠিটা বুকপকেটে নিয়ে আমি বেশ আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। আজ গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আদালতে ঢুকে পড়বো আর হাকিম আসতেই সরাসরি গিয়ে ওকে চিঠিটা দেব। আজ নিশ্চয়ই খালি হাতে ফিরবো না।

কিন্তু আদালতে পৌঁছেই দেখি—এ কী? এ যে লোকে লোকারণ্য! ঐ ভিড় ঠেলে হাকিমের কাছে পৌঁছানো হিমালয় পর্বতকে স্কেল দিয়ে মাপার মতনই কঠিন কাজ। এত লোক কোত্থেকে এল? এত ভিড়, এত মানুষের গাদাগাদি আমি কোনদিন দেখিনি! ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বলি, এত ভিড় কিসের বলতে পারেন?

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ধমকে বলে—চুপ করুন, আমাদের দাবী একলব্যের মৃতদেহ!

মুসাবিদা লেখা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিচে পড়ার আগেই ওটাকে আবার বুকপকেটে রাখি। অনেক কষ্টে এই মুসাবিদা অর্জন করেছি! ওরা এটাকে নষ্ট করে দিলে আমি বিপদে পড়ে যাবো! ওরা একলব্যের রক্ত চায়!

আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন আমার তারিখে দ্রোণাচার্যের তারিখ ছিল সেদিন মাত্র কয়েকজন সমর্থক ওর হয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলো। দ্বিতীয় দিনে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল। পরবর্তী তারিখগুলিতে কয়েকশো থেকে বেড়ে আজ কয়েক হাজার লোক এই আদালতে গিজগিজ করছে। ওরা শ্লোগান দিচ্ছে, — দ্রোণাচার্য জিন্দাবাদ, — একলব্য মুর্দাবাদ, — মহান গুরু দ্রোণাচার্য দীর্ঘজীবী হউন, অস্পৃশ্য একলব্য নিপাত যাক! ইত্যাদি। ওদের গর্জনে আকাশ কাঁপে। পাখিরা ঐ অঞ্চল ছেড়ে পালায়।

ভিড় ঠেলে আদালতে পৌঁছুতে আমি ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে পড়ি। তবু তাগড়া দারোয়ানরা আমাকে ঢুকতে দেয় না। আমার আর্জি শুনে ওরা বলে, — এখনও হাকিমসাহেব কাউকে ডাকেননি, পেছনে দাঁড়ান, আপনার নাম ডাকা হবে।

আমি মরিয়া হয়ে বলি, — আমার কাছে অমুক সাহেবের মুসাবিদা লেখা চিঠি রয়েছে।

— তাতে কী, কারোর ভেতরে যাওয়ার হুকুম নেই।

— আপনি একবার হাকিমকে বলে দেখুন না।

— এতে আপনার লাভ হবে না, আরো বিপদে পড়বেন!

— এরকম বিপদেও তো কোনদিন পড়িনি!

— আরো বেশী বিপদ হতে পারে।

— অন্ততঃপক্ষে চিঠিটা নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিন!

— দুঃখিত, সেটা সম্ভব নয়।

— কেন?

— কেন আবার, এটা আমাদের ডিউটি নয়।

— তাহলে আপনাদের ডিউটি কী?

— গেট পাহারা, কাউকে ঢুকতে না দেওয়া।

— কাউকে না?

— তা নয়, যার ভেতর থেকে ডাক আসবে শুধু তাকেই —

— তাহলে আমি এখন কী করবো?

— সরে দাঁড়াও, আর অপেক্ষা করো! গোঁফঅলা দারোয়ান ভ্রূ কুঁচকে বলে।

ভীষণ মুস্কিল হলো তো ! আমার সঙ্গে কথোপকথনে না জানি কেন দারোয়ানরা ভীষণ রেগে গেছে। তাগড়া-গোঁফ দারোয়ান চিৎকার করে বলে, — ভাগো এখান থেকে!

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি। ভিড়ের শ্লোগান ও চিৎকার, জিন্দাবাদ ও মুর্দাবাদ সমুদ্রগর্জনের মত শোনা যায়। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে হাকিমের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকি। সুযোগ পেলেই দৌড়ে ওর কাছে পৌঁছুবো।

অবশেষে ভেতর থেকে আর্দালি এসে চিৎকার করে বলে, — দ্রোণাচার্য হাজির হো, দ্রো-ণা-চা-র্য-হা-জি-র-হো-ও-ও-ও!

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের গর্জন জবাব দেয় — দ্রোণাচার্য জিন্দাবাদ—জি-ন্দা-বা-দ! — একলব্য মুর্দাবাদ — মু-র্দা-বা-দ—মুর্দাবাদ.....! মহান দেশের মহান গুরু দ্রোণাচার্যকে আদালতে আনা চলবে না, চলছে না, চলবে না!

তারপর হৈ হট্টগোল এত বেড়ে যায় আর কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। উত্তেজিত ভিড় আদালতে ঢুকতে চায়। এখন দারোয়ানরাও সন্ত্রস্ত। ওদের চোখে মুখে ভয়। ওদের পা কাঁপতে দেখে মজা পাই। একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি হাকিম এক বুলেটপ্রুফ কাঁচের কিউবিকলে বসে আছেন। আমি সুরুৎ করে ঢুকে পড়ি। কয়েকজন পাহারাদার ছুটে আসে। আমার গলা শুকিয়ে যায়। একজন বলে, — এ দ্রোণাচার্যের গুপ্তচর!

অন্যজন বলে, — শুট হিম, গুলি মেরে উড়িয়ে দাও!

আমি চিৎকার করে বলি, — আমি বড় আমলার চিঠি নিয়ে এসেছি, হাকিমকে দেখাবো!

কিন্তু আমার আওয়াজ বাইরের শোরগোল ও পাহারাদারদের চিৎকারে চাপা পড়ে যায়। ওরা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এত সামনে থেকে গুলি ছুঁড়তে আমি কখনো দেখিনি। এত কাছে থেকে গুলির আওযাজ কখনো শুনিনি। ওদের কাঁপা হাতেব গুলি অন্য কারো গাযে লাগে। কয়েকজন দ্রোণাচার্যভক্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে— রক্তাক্ত!

দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়।

প্রতিবাদে ভিড় থেকে পাথর ও ইটের টুকরো এসে প্রহরীদের গায়ে লাগে। আদালতের দরজায় লাগে। দারোয়ানরা ভয়ে পালায়। আমি সুযোগ পেয়ে হাকিমের সামনে পৌঁছে যাই।

হাকিম ভয়ে দু'হাত উপরে তুলে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পড়েন' আমি পকেট থেকে চিঠিটা বের করে হাকিমের কাছে পৌঁছে যাই। হাকিম লাফাতে থাকেন। আমি ওর পা ধরে ফেলি। এ সুযোগ আমি কোনমতেই ছাড়বো না। আমি ওর পা জাপটে ধরি। হাকিম তাঁর দুই হাত উপরে তুলে ছাদে একটা বোতাম টেপেন আর ঠিক যেমনি বিপদগ্রস্ত পাইলট ককপিট থেকে ইজেক্ট করে

তেমনি ছাদ ভেদ করে আকাশে উঠে পড়েন। আমিও ওর পা.জড়িয়ে ধরে ঝুলতে থাকি।

হাকিম বলেন, আমাকে ছাড়ো নাহলে তোমার শরীর ফুটো ফুটো করে দেব।

আমি বলি, আপনাকে ছাড়লে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

— তুমি আমার কাছে কী চাও?

— সাহায্য, আমার কাছে অমুক আমলার মুসাবিদা আছে, আপনি ফিরে চলুন, আমার কেসটার নিষ্পত্তি করুন!

— কিসের নিষ্পত্তি, আমার নিজেরই ভীষণ বিপদ !

— আপনি হাকিম, আপনি আইন, আপনার নিজের পদ নিয়ে এরকম ভাবা উচিত নয়!

— কিসের আইন, কিসের কানুন, আমি এই পদে পৌঁছুনোর জন্যে কত পরিশ্রমই না করেছি! আমার অস্ত্রসাধনা বিফলে গেলেও দিনরাত এক করে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি! আমি দ্রোণাচার্যের কোন ক্ষতি চাইনি। ওর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, ওকে তো স্বেচ্ছায় গুরুদক্ষিণা দিয়েছি! এখন শমন পাঠিয়েছিলাম যাতে এইটুকু ভাবেন যে উনি যা করেছেন ঠিক করেননি। যাতে উনি বা ওর মতন প্রতিষ্ঠিত কেউ ভবিষ্যতে এহেন অবিচার না করেন।

এইটুকু বলে হাকিম সাহেব পা-টাকে একটা ঝাঁকুনি দেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় আমার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে আর আমি পপাত ধরণীতলে। অনেক চেষ্টা করেও মুসাবিদা লেখা চিঠিটা আর সামলাতে পারি না। ওটা যে কোথায় উড়ে যায়।

তার আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে আমার শরীর দলা পাকিয়ে যায়। হাড়গোড় বুঝি চুরমার হয়ে গেছে। একলব্য কোথায় হারিয়ে যায়! আমি দুপুরবেলায় আকাশে তারা দেখতে থাকি!

তবু একসময় উঠে বুকে হেঁচড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পোড়া ঘাস রক্ত আর কাগজপত্রের মধ্যে আমার দরখাস্তটা খুঁজতে থাকি। কে জানে, আমার সুবিচারের মুসাবিদাটা নষ্ট হয়ে গেছে, নাকি এখনো কোন ধ্বংসস্তূপে অক্ষত রয়েছে !

রচনাকাল ঃ ১৯৯৪

কাশ্মীর সিংহ পন্নু

শো পিস

এবার গ্রাম থেকে ফেরার সময় মা আমাকে তুলোয় ঢাকা একটা শো পিস দিয়ে বলেন, "নে বাবা, এই চুমকি লাগানো কালো কুকুরটা তোর ঘরে সাজিয়ে রাখবি, এটা সঙ্গে থাকলে কোন আপদ বিপদ তোর ধারে-কাছে ঘেষবে না।"

মায়ের মনে কোনরকম কষ্ট না দিয়ে মুচকি হেসে ওটাকে নিই আর বাসের সীটে বসে বসে ভাবতে থাকি, কবে আমাদের সমাজ এসব কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে? কালো কাপড় দেখে নাকি ভূত-প্রেত দূরে পালায়। হা-হা-হা! এসব ভাবতে ভাবতেই শহরে চলে আসি। আধুনিক শহর। এটা কি সত্যি আধুনিক শহর?

ভাড়াবাড়িতে পৌঁছেই আমার মাথায় কি ভূত চাপে যে বাড়ির মালিকের বউকে কুকুরটা দেখাই। ভদ্র মহিলা আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরটাকে তুলে বুকের কাছে নিয়ে এর পিঠে হাত বোলান — যেন জ্যান্ত কুকুরকেই আদর করছেন, ওর প্রসন্ন দৃষ্টি স্নেহময়। নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি আমাকে কুকুরটা ফিরিয়ে দেন।

সন্ধ্যায় ওর স্বামী একথা জানতে পেরে রাগ করেন। ভদ্রলোকও বউকে কিছু বলেন, আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই। কিন্তু ঐ অস্পষ্ট শব্দাবলীই পরে আমার কাছে চোখে দেখা সত্যি আর কানে শোনা কথার মতন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

ঐ বাড়ি আর এই বাড়ির ঘরগুলি একদমই অন্যরকম। আকাশ-পাতাল তফাৎ। এখানে অনেক বেশী হাওয়া ও আলো, অনেক খোলামেলা। সামনে ঘাসের লন, বারান্দায় টবের সারি। টবে নানা জাতের ক্যাকটাস, লনের কিনারে সারি সারি নানা রঙের গোলাপের সংসার। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটে ছুটে আসে। নানারঙের চুমকি লাগানো কুকুরটাকে হাতে নিয়ে আদর করে। আমার খুব ভাল লাগে। রঙিন চুমকিগুলিতে ঘুলঘুলি দিয়ে আসা রোদ প্রতিফলিত হয়ে সারা ঘরে নানারঙের আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দেয়।

একটা ছোট বাচ্চার পেছন পেছন তিন্দ নামে একটি মেয়ে এসে বাচ্চাগুলিকে বকুনি দেয়। তারপর বাচ্চাদের হাত থেকে কুকুরটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় ওদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে। আমার কামরাটা এক অজানা সুরভিতে ভরে ওঠে। আমি বিভোর হয়ে ওর মিষ্টি হাসি ও রিনরিনে আওয়াজকে বন্দী করে ফেলতে চাই। কিন্তু সাহস জোটাতে পারি না। কেবল বারবার বলতে থাকি,

" কোন ব্যাপার নয়, নিয়ে যাক্ না, বাচ্চাদেরই তো খেলার জিনিস্! ওরাই তো খেলবে!"

ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। ওর চোখে খুশীর ঝিলিক। ফেরার সময় আলতো হাতে আমার বই এর র্যাক এর উপর খেলনাটাকে রেখে বলে, "ভীষণ দুষ্টু!" আমি ভাবি, কে দুষ্টু? বাচ্চাগুলি? আমি? নাকি ও নিজেই! নিশ্চয়ই খেলনা কুকুরটাকে দুষ্টু বলেনি!

তারপর ও বলে, "মানা করলেও ও আপনার ঘরে চলে আসে!" 'মানা' শব্দটার উপর জোর দিয়ে ও একবার আমাকে ভাল করে দেখে। ওর পিঙ্গল চোখে একটা সাতরঙা ছটা খেলা করে।

একবার ভাবি, ওর চোখের মধ্যে ডুবে যাই, ডুব লাগাতে থাকি, এতো মাতাল চোখ! তৌবা তৌবা! অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে দুষ্টু হেসে বলি, "ভালই তো করে। ঠিকই করে!"

"হ্যাঁ, আপনি তো তাই বলবেন!" বলেই ও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। তারপর ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে একবার ঘুরে তাকায়। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। আমি ওর দৃষ্টি থেকে রেশমী ছটাগুলিকে ধরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকি। ও নিজের ভাইপোকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে চুমু খায়। তারপর চুমু খেতে খেতেই চলে যায়। তারপরও অনেকক্ষণ ওর হাসি, কথা বলা এবং অদ্ভুৎ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আমার অস্তিত্বে ছেয়ে থাকে।

পরদিনই আবার বাচ্চাটা এসে শোপিসটা নিয়ে ছুট দেয় আর একটু পরেই তিন্দ সেটা ফিবিয়ে দিয়ে যায়। একটা বাহানা, বাহানার বাহানা, এক অটুট ক্রম জারী থাকে। এই ঘর আর আগের বাড়ির ঘরের মধ্যে কত পার্থক্য। ওখানে বাড়ির মালিকের বউ মাত্র একবাবই আলতো হাতে খেলনা কুকুরটাকে বুকে নিয়ে ওর পিঠে হাত বুলিয়েছিলেন। আর তার ফলস্বরূপ আমাকে ঐ বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। বিশ্বাস হচ্ছে না? না হলে আর কী করা যাবে!

সেই দিনগুলিতে কুকুরটা আমাকে ভীষণরকম তাড়িয়ে বেড়াতো। রাতের অন্ধকারে এই নিষ্প্রাণ কুকুরটা ভয়ানক আকার ধারণ করতো। তখন আমার ঘব একা সুনসান, বরফের মতন ঠান্ডা। র্যাকে থরে থরে সাজানো বইগুলি আমার উপর পাথরের চাঁইযের মতন এসে পড়তে শুরু করলে আমি চাপা পড়ে হাঁসফাস করতে থাকতাম। দমবন্ধ প্রায় অবস্থা।

ঘেমে নেয়ে একসার হযে ভাবতাম এমনি একাকীত্ব বজায় থাকলে আমি দমবন্ধ হয়েই মারা যাব! এই বইগুলির চাপে শ্বাস নেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে।

ঐ বাড়ির মালিক নিঃসন্তান ছিলেন। সেদিন ওর স্ত্রী না জানি কেন আমার খেলনা কুকুরটাকে বুকে নিয়ে নিজের স্বভাববিরুদ্ধ প্রসন্ন স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

কিন্তু ওর পতিদেব, না জানি কোন্ ধাতু দিয়ে তৈবী, যখনই মুষলধাবে বৃষ্টি নামে, দেওয়াল ভিজে স্যাঁতস্যাতে ফাপসে পড়লে তা থেকে টপকে পড়া প্রতিটি ফোঁটার দিকে এমনভাবে রেগেমেগে তাকায় যেন ফোঁটাগুলি ওর অনুমতি ছাড়া নিচে পড়ছে।

ও থেকে থেকে দেওয়ালে টুকি মেরে মেরে দেখে। পাকা মজবুত দেওয়ালটাকেও ওর কাঁচা বলে মনে হয়। না জানি কখন ভেঙ্গে পড়ে। ও ভীষণ সন্দেহপ্রবণ আর খুঁতখুঁতে। নিজের স্ত্রীব দিকেও সন্দেহের গাঢ় রঙেব অদৃশ্য চশমা পরেই তাকায।

আর এজন্যেই হয়তো বিরক্ত হয়ে ওর স্ত্রী কখনো অন্য কারো জীবনে বঙ চড়াতে চায়, অন্যতর সুরভি ও আপনত্ব চায। কোন ইচ্ছা পূরণের সম্ভাবনা ওর জীবনে নেই বলে মনে হওযায আমি নিজেকে ভদ্রমহিলার ইচ্ছানুসারে তৈরী করে নিতে চেয়েছিলাম।

কখনো ভয় করতো এ কেমন স্বামী-স্ত্রী-রে বাবা। ওরা পরস্পরের থেকে অনেক বেশী ভালবাসে বাড়ির দেওয়াল, ছাদ, মেঝে এবং কোথাও কোথাও চিপ্স রাঙা মেঝেগুলিকে। ওবা ভালবাসে বাড়িভাড়া এবং চুপ থাকা, নিঠক্কু চুপ থাকা, কোন হাসি-ঠাট্টা গল্প-টল্পের উচ্চরোল আমি কোনদিন শুনিনি।

সকাল সকাল লালার গলায় পৈতে ঝুলতো যেন পৈতের উপর ওর অটুট বিশ্বাস! কতক্ষণ ধরে ভদ্রলোক ঘটি থেকে ধীরে ধীরে জল ছিটাতে থাকতো। ওর বিশাল ভুড়ি থলথল করতো। ওর স্ত্রী সিল্কের কামীজ পরে ঘুরতো, অপ্সরা ঢঙে কোমর দুলিয়ে চলাফেরা করতো। আমি নিজের কামরা থেকেই দরজার ফাঁক দিয়ে ওদেরকে দেখতাম। পর্দা তো আর ছিল না। একজন ভুড়িওয়ালা আধ ন্যাংটো লালা, আর অন্যজন....!

পার্থক্য আর কতটুকু? একটা সিল্কের কামিজের পর্দা সে-ও শুধু অর্ধেক। আমি সংকোচে ওদের সঙ্গে যত কম সম্ভব কথা বলতাম।

মা কুকুরটা ঘর সাজানোর জন্যে দিয়েছিল। এখন এটাকে আমি কখনো আশীর্বাদ আবার কখনো অভিশাপ বলে ভাবি। কোনরকম কুসংস্কার না মানলেও একে অভিশাপ ভাবার পর মুহূর্তে নিজেই প্রবোধ দিই, কালো জিনিস তো নজরবট্টুর কাজ করে। কখনো ভাবি, এই কুকুরটা তো মৃত পশুদেব হাড্ডি চোষে। নিজেরই ক্ষত চেটে রক্তের স্বাদ নেয়। এরই জন্যে আমাকে বাড়িটা ছাড়তে হয়েছে। বাড়ি না, কামরা!

তখন আমার একে আরো অভিশপ্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে এটাকে সঙ্গে নিয়ে আসি। তারপর ভাবি, না অভিশপ্ত হবে কেন, ঐ অসহজ দমবন্ধ পরিবেশ ছেড়ে ভালই হয়েছে, ওটা ছাড়াতেই এই খোলামেলা বাড়িটায় এসেছি, আমার একাকীত্বের সাথী এই কুকুরটাই আমার জীবনে তিন্দের সুরভি এনে দিয়েছে। সূর্যের কিরণ এর চুমকিগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে আমার কামরাটিকে আলোকছটায় ভরিয়ে দেয়। একেকটা চুমকি যেন ঝিকিমিকি তারা। ইস্, সারাজীবন যদি এমনি সবসময় রোদ খেলা করতো, কি মজাটাই না হতো।

আগের বাড়িটার দু'পাশে খালি প্লট থাকায় দু'পাশেই বড় বড় ঘাস আর জংলী ঝোপ। রাতে তো বটেই, দিনের বেলাতেও মশা ভনভন করে। প্রতিবেশীরা কেউ ওই বাড়িতে উঁকি দেয় না বলে কথা বলারও কেউ নেই। অথচ ওখানেও পথের পাশে একটা সুদৃশ্য সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে — "এই শহর দারুণ সুন্দর, আবার আসবেন!" সুন্দর শহর কোথায়? আমার মনে হতো জঙ্গলে আছি।

বাড়ির মালিকের বউ একদিন স্বামীর আদেশ অনুযায়ী আমার কামরাটা দেখতে আসেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভদ্রমহিলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাদটাকে দেখেন কোথাও চুঁইয়ে জল পড়ছে কিনা। আমি কুকুরটার লেজে হাত বোলাই। ভদ্রমহিলা ভ্রু কুঁচকে তাকালে ওর কপালের ভাঁজগুলি দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। এতগুলি ভাজ! এতো জীবন নিয়ে পস্তানোর পরিচায়ক, হতাশা ও বিরক্তির প্রকাশমাত্র।

মহিলা বলেন, "দেখো, কুকুরটাকে এখানে রেখ না!" আমি অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাই। কিন্তু কিছুই বলি না। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ জবাবের প্রতীক্ষায় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বলেন, "আমার স্বামী কালো কাপড় একদমই পছন্দ করেন না, আমিও ঘেন্না করি!"

আমার চোখ যায় আগের দিনই বাজার থেকে কিনে আনা নকশাদার কালো পাঞ্জাবীটার উপরে। কালো কুকুরটার কাছেই হুকে তখন ঐ পাঞ্জাবীটাই ঝুলছে। আমি ওর কেন কথার জবাব দিই না। খালি কুকুর আর পাঞ্জাবীটাকে দেখতে থাকি।

সেদিন রাতের আঁধারে ওরা কিছু শলাপরামর্শ করে। হয়তো ওরা দিনের আলোতে কথা বলতে ভয় পায়। সে রাতেই ভদ্রমহিলা এসে আমাকে আগামী এক তারিখের মধ্যে ঘর খালি করতে বলে যান। আমি ভাবি, হয়তো কোন মহান সাধুবাবা ওদেরকে সন্তানপ্রাপ্তির জন্যে কালো কাপড় দেখতে মানা করেছেন। অথবা আমাকে বের করার কোন বাহানা! কোন না কোন বাহানা ছাড়া তো আর কাউকে কামরা ছাড়তে,বলা যায় না।

এখন ভাবি, ভালই হয়েছে। নতুন বাড়িতে আসার পর থেকেই একটা বাচ্চা 'ডগী, ডগী' বলতে বলতে আমার কামরায় চলে আসে। দুজনেই পাঞ্জাবী তবু বাচ্চাটার বাবা-মা পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলেন। তাতে আমার কি? বাচ্চাটা এলে আমার খুব ভাল লাগে। বাইরে সারি সারি টবে লাগানো নানারকম ক্যাকটাস, লনে পুরু ঘাসের আস্তরণ আর নানা রঙের গোলাপের সারি, অস্ফুট-অর্ধস্ফুট গোলাপের কুঁড়িগুলি আমাকে মোহিত করে। লনে বসতে দারুণ লাগে। একটা মিষ্টি সুরভি প্রতিটি বায়ুকণাকে সম্পৃক্ত করে রাখে, আশপাশের বাংলোর মতন বাড়িগুলি আর বিকেল হতেই দারুণ দারুণ সব রূপসী কন্যা আর তাদের বৌদিদের প্রস্ফুটিত চেহারা আমাকে বিভো'র করে।

ছোট ছোট শিশুরা আমার ঘরে এসে 'আঙ্কল আঙ্কল' করে কত না সত্যি ও কল্পনার গল্প শোনায়। ওদের পেছন পেছন কোন মেয়ে বা মহিলাও চলে আসে। ওদের নানারঙের জামাকাপড়ে প্রতিফলিত হয়ে কালো ঘোড়ার চুমকিগুলি থেকে সবুজ -হলুদ-নীল-খয়েরি-না জানি কত রঙের আলোকছটা সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। তিন্দের ভাইপো প্রথমদিন এসেই কুকুরটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে ওটা নিয়ে ছুট দেয়। তিন্দ কুকুর ফেরাতে এলে ওর হাত আমার হাতে ছুঁয়ে যায়, পুরো নয়, আঙুলের পিঠগুলি ছুঁয়ে যায় আর না জানি কেন আমার সারা শরীরে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়।

তারপর ডগী অনুঘটক মাত্র। ডগী নয়, চুমকি লাগানো কালো কুকুর। ছুটির দিনে আমি বাইরের লনে গিয়ে গোলাপ গাছগুলির যত্ন করি। গুড়ি খুঁড়ে জলটল দিই। তিন্দ কাছে এসে আমার চারপাশকে সুগন্ধে ভরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী করছো?

আমি প্রতিদিনের মতন মুচকি হাসি। আমার চোখ কিছু বলে। ওর দৃষ্টি আমার ভাষা বুঝতে পারে, আমার অব্যক্ত আবেগকে নিমেষে চুম্বকের মতন শুষে নিয়ে বলে, "একটা কাজ করো, আমাদের লনের ক্যাকটাসগুলিও তোমার লনে লাগিয়ে নাও, লাগাবে তো?"

চুপ থাকি। কে কাঁটা নিয়ে খেলা করতে চায়, সে-ও ক্যাকটাস নিয়ে? আমি গ্রাম থেকে আসা এক ভাড়াটে ছাত্র, এই ক'দিন আগে একটা চাকুরী পেলেও পড়াশোনা এখনও ছাড়িনি। না জানি কি থেকে কোন্ বদনামের ভাগী হই, আর ফলস্বরূপ এত সুখের কামরাটিও ছাড়তে হয়!

দুই বাংলোর মাঝের নীচু দেওয়াল টপকে ও আমার বারান্দায় আসে। ঐ নীচু দেওয়াল আমি কখনো টপকাতে পারিনি কিন্তু ও অনায়াসে টপকে এসেছে একটা সিদ্ধান্তের মতন। একদিন ঐ মাঝের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আমি বই পড়ছিলাম। ও সামনের দিকে ঝুঁকে বলে, "সারাদিন শুধু পড়া আর পড়া!" আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ও মিটিমিটি হাসছে। ঐ হাসি আমার অস্তিত্বে ছড়িয়ে যায়, গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। আর ও তখন আমার পিঠে আলতো চিমটি কেটে ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়।

ওর ঢেউ খেলানো চুল আর শক্ত করে বাঁধা লম্বা বিনুনি আমার দারুণ লাগে। এক সন্ধ্যায় ও আমাকে খেলনা কুকুর ফেরৎ দিতে এসে দুষ্টুমি শুরু করলে আমিও ছোটবেলায় রাবারের পুতুল খেলার মতন ওকে নিয়ে খেলতে শুরু করি। আদর করি, চুমু খাই। রাবারের পুতুল টিপলে পুঁই পুঁই আওয়াজ হতো। আব তিন্দকে টিপলে ও খিলখিলিয়ে হাসে, আমাকে কাতুকুতু দিয়ে পালায়। আমি অনুভব করি, আমার জীবনে সুদিন এসেছে! এই কুকুরটা আমার জীবনে তিন্দ নামে একটি জীবন্ত পুতুল এনে দিয়েছে। আমরা পাশাপাশি চলতে শুরু করেছি যদিও গন্তব্য এখনো অনেক দূর!

কয়েকদিন পর গ্রাম থেকে বাবা আমাকে দেখতে আসেন। পাঞ্জাবী ঘি, হালুয়া আরো কত কি সঙ্গে আনেন। বাড়ির গল্প করেন। আমার ভাই হওয়ার সুখবর শোনান। তিনি বলেন, "সন্তান নিয়ে

আমরা খুশী, এখন তোর মায়ের আর আমার ইচ্ছা তোকে বিয়ে করাবো।" তারপর হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলেন, তোর শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে দেখছি, চোখের কোলে কালি পড়েছে, কী ব্যাপার! রাত জেগে পড়াশোনা করিস নাকি?"

তখুনি তিন্দের ভাইপো এসে 'ডগী ডগী' করে পুতুলটা নিয়ে চলে যায়। বাবা ওর দিকে হা করে তাকিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখেন। আমি বলি, "পাশের বাড়ির বাচ্চা!"

বাবা বলেন, "একটা ছেলে পাওয়ার ইচ্ছে ছিল, বাহে গুরুর কৃপায় তা পেয়ে গেছি, ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন তোদের জোড়া সম্পূর্ণ হলো, একা ছেলে পৃথিবীতে একা পড়ে যায়। এই আশায় আশায় তো তোর এতগুলি বোন......।"

আমার চোখ তখন দরজার দিকে। সেখানে পর্দার পেছনে রঙিন ছায়া। তিন্দ কুকুর ফেরৎ দেওয়ার বাহানায় এসে পর্দা সরিয়ে বাবাকে দেখতে পেয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হয়েছে। ভাগ্যিস, বাবা দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছেন। না হলে....!!! ও আজ শাড়ি পরেছে, ঠোঁটে লিপস্টিক। কিছুক্ষণ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে। তারপর একবার পর্দা সরিয়ে আমাকে মুখ ভেংচে চলে যায়।

বাবা বলতে থাকেন, "এখন তোর দায়িত্ব, প্রথমে নিজে বিয়ে কর, তারপর এক এক করে বোনদের বিয়ে দিবি, ধীরে ধীরে আমরা দু'জনে মিলে ওদের বোঝা হাল্কা করবো। এখন তো তুইও রোজগেরে হয়ে পড়েছিস!"

আমি সারারাত তিন্দের কথা ভাবতে থাকি। শুধু ভাবতে থাকি। আজ অনেকদিন পর ও এসেছিল। আজকাল ও এলে আমরা কোনদিন রোজ গার্ডেন, আবার কোনদিন শুখনা লেক এ ঘুরতে যাই। পরস্পরের হাত ধরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ডুবন্ত সূর্যের লালিমাকে লেকের জলে সাঁতার কাটতে দেখি, অসংখ্য বিদেশী পাখির ডানাঝাপটানো, জলকেলি দেখতে দেখতে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে গেলে হঠাৎ কখনো পথের শেষ কোথায় ভেবে আকুপাকু তিন্দকে বলি, "দেখো কী সুন্দর সন্ধ্যা!"

কোন কোনদিন রাত-দিনের আলো আঁধারিতে আমরা নৌকাবিহার করি, ছোট্ট একটা কিস্তিতে কেবল আমরা দু'জন জল ও প্রকৃতিকে দেখি, নিজেদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে পরস্পরকে দেখি, লেকের কিনারের ঝোপগুলি জলের মধ্যে ঝুঁকে থাকে, কিস্তির লঙ্গর সেইসব ঝোপে লাগিয়ে লাগিয়ে হুল্লোড় করতে করতে কখন আমরা নৌকা ছেড়ে চোরকাঁটা ভরা ঘাসের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ি, চোরকাঁটায় গড়াই, তারপর কাঁটা ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের নাক ধরি!

আজও আমরা কোথাও বেড়াতে যেতাম। কিন্তু মাঝখানে বাবা আসায় সব পন্ড হয়ে গেল। বাড়ির নানা সমস্যা আর ভাই হওয়ার সুখবর থেকে অনেক বেশী তিন্দের দরজা থেকে ফিরে যাওয়া আমার চিন্তায় ছেয়ে থাকে। আমি বাবার নাকের ডাকের আওয়াজ শুনতে শুনতে তিন্দের সঙ্গে কাটানো সোনালী সন্ধ্যাগুলির কথা ভাবি। ওকে বিয়ে করে সংসার পাতার কথা ভাবি। তখুনি হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা বাবা আমাকে বিয়ে করানোর কথা বললেন কেন? ক'দিন আগেই তো চিঠিতে লিখেছিলেন, "চাকুরীর পাশাপাশি রাতের কলেজে পড়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে যা। তাহলে চাকুরীতেও উন্নতি হবে।" আমি তো কেবল এম এ পাশ করেছি, এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছি, এভাবে তিন্দকে কাছে পাওয়ার প্রস্তুতিও চলছে। আমি কি বাবাকে তিন্দের কথা বলবো? বাবা কি মেনে নেবেন? তিন্দের দাদা-বৌদি ও বাড়ির অন্যরা আপত্তি করবে না তো? এইসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

সকালে উঠে দেখি রোদ উঠেছে। বাবা কখন উঠে গেছেন। আমি বাথরুম ঘুরে এসে দেখি

তিনি জামাকাপড় পরে তৈরী। আমাকে বলেন, "দ্যাখ্ বাবা, বিদেশ বিভুঁয়ে চোখ কান খোলা রেখে চলবি, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবি।"

আমি রিক্সা ডেকে আনলে বাবা সাবধানে উঠে বসেন। তারপরই বলেন, "আরে আরে তোর ঐ কুকুরটা কোথায় রে? তোর মা তোকে দিয়েছিল!"

"ওটা তো পাশের বাড়ির বাচ্চাটা খেলতে গিয়ে গেছে, কেন কী ব্যাপার?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

বাবা স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন, "যা, ওটা নিয়ে আয়!"

"কিন্তু কেন? আপনি ওটা দিয়ে কী করবেন?" আমি একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি। বাবার এরকম অদ্ভুৎ ইচ্ছে হবে কেন? তিনি কুকুর দিয়ে কী করবেন?

"এখানে পড়ে থেকে কী হবে? ঘরে ছোটভাই এসেছে, কদিন পর ও এটা নিয়ে খেলা করবে, ওই ডগীটার সঙ্গে।" বাবার মুখে 'ডগী' শুনে আমি অবাক। বাবা জেনেশুনেই এই শব্দটা একদম তিন্দের ভাইপোর মত করে উচ্চারণ করেন। আমি বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখি বাবার চোখে দুস্টুমি খেলা করছে। তিনি বলেন, "তুই এখন আর বাচ্চা নেই, বড় হয়ে গেছিস!"

রচনাকাল : ১৯৯৬

নজরবটুু : কারো যাতে নজর না লাগে সেজন্যে ঝুলিয়ে রাখা বিকৃত চেহারা, ছেঁড়া জুতো কিম্বা যেকোন কালো জিনিস।

জস্‌বীর ভুল্লর

মরণ মাটি

মুষলধাবে বৃষ্টি।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত। ঘপলাৎ!......... ঘপলাৎ! জঙ্গল বুটের ভেতরে জল ভরে গিয়ে চলাকে দুষ্কর করে দিয়েছে। স্টীলের হেলমেট থেকে বৃষ্টির ধারা সশব্দে ঘাড়ে গড়িয়ে আমার ইউনিফর্ম চুপচুপে করে দিয়েছে। আসলে এত বৃষ্টিতে রেনকোট যথেষ্ট নয়। তবু আমি রেনকোট জড়িয়ে রাইফেলটাকে বাঁচিয়ে রাখছি। এটা ভিজে গেলে সর্বনাশ। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের অস্ত্র থেকে প্রিয়তম আব কে আছে?

উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া পায়ে-চলা রাস্তা দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছি। বাঁদিকে পাহাড়ের দেওয়াল আর ডানপাশে বারুদী সুড়ঙ্গ ভরা খাদ। আমরা শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে বেরিয়েছি। মেঘের গর্জন আর থেকে থেকে আকাশফাটানো বিদ্যুতের চমক। কোন পাহাড়ী ঝর্ণার সশব্দ কোলাহলও গর্জনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এইসব শব্দের তাণ্ডবে সঙ্গী সৈনিকের কোন কথা শোনা যায় না, কারো আর্তনাদও কানে ঢোকে না। এ হেন সময়ে যে কোন অভিজ্ঞ সৈনিক প্রমাদ গোণে। যুদ্ধক্ষেত্রে একাকীত্বের অনুভূতি মারাত্মক। তারপর কেউ যখন নিজস্ব 'উফ্-আহ্'ও শুনতে পায় না, তখনই মৃত্যু দরজায় করাঘাত করে।

আমরা ঠিক সময়েই পথে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এখন সময়ের ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে চলেছি। এই আতঙ্ক বর্ষার জন্যে নয়, অন্ধকার রাতের জন্যেও নয়। এমনকি ওই জঙ্গলকেও আমরা ভয় পাই না, যার ঝোপে ঝোপে হিংস্র সব শ্বাপদরা চামড়া কুঁচকে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। এই ভয়াবহতা কেবল যুদ্ধের, এই মুষলধার বৃষ্টিতেও যে যুদ্ধ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই নীরবতার ভয়াবহতা এই নিকষ অন্ধকারে নিজস্ব সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে।

বৃষ্টি কমলে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা আসে। আগুনের সশস্ত্র প্রেতরা এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে। সশব্দ আগুনের ফুলকিগুলি দ্রুত বাতাসকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে। প্রেতদের মাথা নেই, তবু মানুষের মতন দেখতে। আমি চেনার চেষ্টা করি। কিন্তু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি যখনই চেনার মুহূর্ত আসে, কবন্ধের বুকে সারিবদ্ধ মেডেল ঝুলতে থাকে। মেডেলে প্রতিফলিত আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় আর ঐ প্রতিফলনের প্রভাব পাল্টে যায়।

আমিও ঝড়ো হাওয়ার অংশ হয়ে পড়ি। এ যুদ্ধ আমার নয় তবুও আমি যুদ্ধরত। পরদিন আমরা মুহাজের পথে কুচ করবো। অবশ্য কালকের কী ভরসা? আজ নিয়েই আমাদের কারবার; আমরা সৈনিক। আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। শুধু বর্তমান! এই মুহূর্তে আমি শুধু নীরুর স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চাই। কে জানে জীবনে আগামীকালটাই আসবে কি না!

সেদিন ওয়াশবেসিনে রাখা এঁটো বাসনে এক টুকরো রোদ আটকে ছিল। কেঁদে কেঁদে ভেঙ্গে যাওয়া গলার আওয়াজে ও কী যেন বলে আমি বুঝতে পারি না, আমি ওকে জড়িয়ে ধরে দেখি ওর বিষণ্ণ চেহারায় ঐ রোদের টুকরোটা জুড়ে গেছে। আমি বলি, — নীরু, তোমার জন্যে আমি এই অশ্লীল যুদ্ধটাকেই হারিয়ে দিতে চাই।

অবোধ শঙ্কায় ওর চোখের বাদামী মণিদু'টো সরু সরু লাল রেখার জালে ভাসমান। ও নখ দিয়ে আমার শার্টের একটি বোতামে অদৃশ্য সব রেখা টানতে টানতে বলে, — তোমাকে পেলে যুদ্ধ চাই না, মানুষের জীবনে যুদ্ধ থেকেও অনেক জরুরী সব কাজ রয়েছে। আমার কাছে আমার সংসার, তুমি ও আমাদের ভাবী সন্তান অনেক বেশী জরুরী। ওর কথা শুনে আমার সমস্ত চিন্তা ও উদ্যম রক্তাক্ত হয়। এই যুদ্ধের ঝড় আমার উপর দিয়ে যাবে আর বিধ্বংসের ছাপ নীরুর মুখে বলিরেখা এঁকে দেবে! আগামী কোন লড়াইয়ে আমি গুলিবিদ্ধ হবো আর হাজার ক্রোশ দূরে অপেক্ষারত নীরু ঘায়েল হবে!

মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমক ও মেঘগর্জনের পর আবাব মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সরু পায়ে চলার পথটি এবার মোড় নেয়।

আমার হাত পা থরথর করে কাঁপে, দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠকি হয়। পা এত নিঃসাড় যেন পৃথিবীতে কখনো উষ্ণতাই ছিল না। যদিও আমার কাছে বাচ্চাদের খেলনার মতন কিছু উষ্ণ স্মৃতি বয়েছে। আমি ঐ স্মৃতিগুলি আঁকড়ে ধরে নিজেকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করি, গতিশীল থাকি।

সেদিন নীরুর সংসর্গে সময়ের পিঠে যেন পরীর মতন ডানা লাগানো, ফুলের মতন মুহূর্তগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু এই অতীত হয়ে যাওয়া মুহূর্তের ফুলগুলিকে আমি অতীত হতে দিই নি। বারবার স্মৃতিচারণা করে সেগুলিকে তরতাজা রাখি। সেগুলি ছুঁয়ে আমি এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে উষ্ণ রাখি, বাঁচিয়ে রাখি।

সেই বিদায়ের সন্ধ্যায় আমি আগুনের হলকায় গলে যাওয়া রাবারের মতন নিজের ভিতরেই কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম সৈনিকদের ভীড় ও কথাবার্তায় সরগরম, বীজতলার চারাগাছের মতন গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য সৈনিক ও তাদের পরিবার-পরিজন।

নীরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে যেতে হচ্ছে, যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। যুদ্ধে যাওয়াই সৈনিকের নিয়তি। সৈনিকের কাছে গর্ব কবার মতন যদি কিছু থাকে— তা হলো যুদ্ধ! যুদ্ধই সৈনিকের শক্তি এবং মর্যাদা, যুদ্ধই গর্ব, যুদ্ধই মৃত্যু!

নীরু বলে, আমাদের দু'জনের মাঝে এই ময়লা কিটব্যাগটা কেন রেখেছ? আমি তাড়াতাড়ি কিটব্যাগটা উঠিয়ে একপাশে রাখি। নীরু বলে, এই, ট্রেনে ওঠার আগে আমাকে একবার জাপটে ধরে আদর করো প্লিজ, আজ আমার কোন লজ্জা নেই। ও ভরা গলায় বলে, কী জানি কবে ফিববে!

— চিন্তা করো না। অবশ্যই ফিরে আসবো!

— সান্ত্বনা দিচ্ছ? নীরু সজল চোখে হেসে বলে, আমি জানি যুদ্ধে গেলে ফিরে আসাটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার, অনেকেই আবার আমার বাবার মতন পঙ্গু হয়ে ফেরে! সেটা আরো বেশী কষ্টের!

সে মুহূর্তে ওর কথার মানে বুঝতে পারি নি। এমনিতেও সৈনিকদের বেশী বুঝে ওঠার প্রয়োজন নেই। যত কম বুঝবো তত ভাল সৈনিক হতে পারবো!

ট্রেন হুইশল দেয়। নীরু আমার আলিঙ্গনে নিবিড় হয়। আমি ওর অশ্রুতে দ্রবীভূত। ওর অব্যক্ত কষ্ট আমাকেও অশ্রুসজল করে তোলে। সবুজ সিগন্যাল পেয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে আমি আলতোভাবে ওর বাহুপাশ ছাড়িয়ে কামরার হাতল ধরে দরজায় উঠে দাঁড়াই। আমার পাশে আরো কয়েকজন সৈনিক দাঁড়িয়ে ওদের প্রিয়জনদের দিকে হাত নাড়তে থাকে। অশ্রুসজল অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমি নীরু ছাড়াও আরো অনেককে হাত নাড়াতে দেখি। তারপর প্ল্যাটফর্মে কেবল অসংখ্য হাত দেখা যায়। তীব্র বাতাসে অসংখ্য হাতের ফসল গমের শীষের মতন দুলতে থাকে। ট্রেন এখন জোরে ছুটছে। হাতগুলি সমুদ্রে ডুবতে থাকা হাতের মতন আর্তনাদ করছে। আমি চোখ কচলাই। আসলে হাতগুলি নড়ছে না। প্রার্থনায় প্রসারিত। ভিখিরির মতন মেলে দেওয়া হাতের আকুতি কে শোনে?

এখন তো দিন ও মাস ভুলে বসে আছি, কতজন সহ-সৈনিক মারা গেছে, তা-ও বলতে পারবো না ! যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে আমরা মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছি ঐ পথের কোন প্রান্ত জীবনের দিকে গেছে কিনা জানিনা। অবশ্য আমি জানি আমার বেঁচে থাকা আর না থাকার মাঝের ব্যবধান সমুদ্রের মতন ব্যাপ্ত। সে জন্যেই আমি পা টিপে টিপে চলি, পিছলে না যাই! ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে অন্ধকার আরো চেপে ধরে, পথ দেখতে পাই না!

হঠাৎ আমার সামনের সিপাহী হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর খাদে গড়িয়ে যায়। ক্রমাগত বর্ষণে জলের তোড়ে পায়ে-চলা পথের টুকরোটি খাদে গড়িয়ে গেছে। ওকে সামলাতে গিয়ে আমার পায়ের তলার মাটিও সরে যায়। সামনের সিপাহীর পেছন পেছন আমিও খাদে গড়িয়ে পড়ি। আমার পেছনের সিপাহীটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, হয়তো পাহাড়ের দেওয়াল বা কোন খাঁজ আঁকড়ে ধরে।

আমার পায়ে লেগে কয়েকটা ছোট ছোট পাথরের চাঁই খাদের দিকে গড়াতে থাকে। ঐ চাঁইগুলির আঘাতে একের পর এক বারুদী সুড়ঙ্গ ফাটতে শুরু করে। মানুষ আমার জন্যে মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছিল। কিন্তু পাথরের টুকরোগুলি আগে গড়িয়ে পড়ায় এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই। কিন্তু একটু পরেই আমার সামনে একটি আলোর গম্বুজ ফাটে আর আমাকে অতল অন্ধকারে তলিয়ে নিয়ে যায়।

ঐ মুহূর্তের আগে আমি জানতাম না যে কোন ঔজ্জ্বল্য এতটা অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে! এই অন্ধকার যেন সমুদ্র! তলিয়ে যেতে থাকি, অন্ধকার গিলে খেতে থাকে সমুদ্রের গভীর অতলে। প্রথমে একটা ছোট মাছ আসে, তারপর এক ঝাঁক, ধীরে ধীরে মাছেরা আমাকে ঘিরে ফেলে। আমি চিৎকার করি, কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় না। প্রতি মুহূর্তে মাছের সংখ্যা বাড়ে। ওরা আমাকে কুরে কুরে খায়। ওদের দাঁত করাতের মতন তীক্ষ্ণ। করাত দিয়ে আমার অঙ্গ কাটা হতে থাকে। খেতে খেতে মাছেরা আমাকে আরো অতলে নিয়ে চলে — ভারী, অন্ধকার জলে, আমার কবরের কাছাকাছি। অন্ধকারের কবর ! তারপর না জানি কতক্ষণ ঐ কবরে পড়ে আছি। আমি কি মরে গেছি? তাহলে ভাবছি কেমন করে? যে ভাবতে পারে সে তো জীবিত!

অন্ধকারের মাটি বুদবুদের মতন আমাকে উপরে তুলতে থাকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। আমি কি আবার আলোর দিকে ফিরছি? আমি কি এই নারকীয় ভয়াবহতা পার হয়েছি? শরীরের প্রতি অঙ্গে ব্যথা। বৃশ্চিক দংশনের মতন যন্ত্রণা। ব্যথার ফসল এভাবে সারা শরীরে গজিয়ে ওঠার আগে একটা সিগারেট খেতে চাই। চোখ বন্ধ করে—অনেকটা বয়স খাওয়ার মতন, ধীরে ধীরে।

সিগারেটের কথা ভাবতেই ধুমপানের ইচ্ছা প্রবল হয়। কিন্তু আমি নড়তে পারি না। হয়তো আমার পকেটেই সিগারেটের প্যাকেট রয়েছে। সমস্ত জোর লাগিয়ে আমি একটা হাত মুক্ত করার

চেষ্টা করি, কিন্তু আমার হাত কোথায়? আমি কি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছি? এবার অন্য হাত বাড়িয়ে পকেটে খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার হাত.......? শরীরের সমস্ত জোর লাগিয়ে আমি আর্তনাদ করে উঠি, আমার হাত দু'টো কই?

ঐ চিৎকারে আমার চোখ খুলে যায়। তাকিয়ে দেখি সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ। ওরা কি আমার হাত দু'টো কেটে ফেলেছে? এখানে কি কোন আইনকানুন নেই? কোন মানুষের হাত কাটার আগে তাঁর অনুমতি নেবে না? হাতের মালিক তো মানুষ নিজে। হাত ছাড়া ওর চলবে কেমন করে?

নীরু দেখ, ওরা আমার দু'টো হাতই কেটে নিয়েছে। এখন তোমাকে ধরবো কী দিয়ে? তুমি কাছে থাকলে এ মুহূর্তে আমার ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তুমি কত দূরে! প্রার্থনার জন্যে দু'হাত উপরে তুলতে হবে, কিন্তু প্রার্থনার জন্যে হাত দু'টোই নেই! ঠুটো জগন্নাথ হয়ে পড়েছি!

আমি ছটফট করি। পাশ পাল্টানোর অসফল চেষ্টায় দাঁতের চাপে নিচের ঠোঁট কেটে যায়। যন্ত্রণার জোয়ার আমার মাথা থেকে পা অব্দি সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়, আমি জ্ঞান হারাই।

কিন্তু না জানি কোথা থেকে একটা মোটা ধেড়ে ইঁদুর আমার শরীরে উঠে আসে। তারপর তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আমার ব্যাণ্ডেজ কেটে মাংস খেতে থাকে। সীমান্তের লড়াইয়ে আমাদের ছাউনিতে এরকম ইঁদুর দেখা যায়। এরা সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা ছেঁড়া পুরিগুলিকে ছিঁড়ে খায়। জ্যাম-জেলীর ডাব্বা শেষ করে দেয়। আমাদের আধসেদ্ধ ভাত কিম্বা আধপোড়া রুটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তারপরও ওদের শান্তি হয় না। সুযোগ পেলেই আমাদেরকে খেতে আসে।

এই ইঁদুরটা তাজা রক্তের গন্ধ পেয়েছে। শুরুতে কয়েকবার ও ঘাড় উঁচু করে শরীরের নানা জায়গায় শোঁকে আর চলে যায়। তারপর দু'হাতের কাঁটা অংশের ব্যাণ্ডেজ চুঁইয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত শোঁকে। ওর তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত দিয়ে ব্যাণ্ডেজ কাটতে থাকে। ওকে তাড়াই কেমন করে?

আমি চিৎকার করি, কিন্তু কেউ শুনতে পায় না, নিজেই শুনতে পাই না। বালিশে মাথা আছড়ে পাশের বিছানায় শুয়ে থাকা আহত লোকটিকে ডাকার চেষ্টা করি। ঐ লোকটি শত্রুপক্ষের সৈনিক না আমাদের, সেটা জানা এখন অর্থহীন। সে-ও এক আহত সিপাহী। তাকে শত্রু ভাবাই যায় না। আমাদের দু'জনেরই শত্রু এখন এই মোটা ইঁদুরটি। ইঁদুরের আবার দেশ কি? আমার রক্ত-মাংস কুরে কুরে খাওয়ার পর হয়তো ইঁদুর ওর রক্ত-মাংস খাবে। ওকে আমরা নিজেদের ইঁদুর বলতে পারি, আমাদের মাংস ও রক্তে লালিত ইঁদুর!

হয়তো আমার জোরে জোরে মাথা আছড়ানো কেউ দেখেছে, অথবা আর্ত গোঙানি শুনতে পেয়েছে। সেজন্যে পুরো ওয়ার্ডে শোরগোল ওঠে। ইঁদুরটা দু'কান খাড়া করে। তারপর ছুটে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। ওরা জীবিত মানুষকে কুরে কুরে খেতে পায় না, হৈচৈ ভয় পায়, খুব সেয়ানা! চারপাশ শান্ত হলে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় আহতদের কুরে কুরে খাবে।

তখুনি একজন ডাক্তার ও একজন নার্স ছুটে আসেন। আমি ঘেমে নেয়ে একসা। ডাক্তার হাঁপান, নার্সও ঘাবড়ে গেছেন। ইঁদুরে কাটা ব্যাণ্ডেজ খুলে সেলাই করা অংশ ও চারপাশের ক্ষত দেখে বলেন, আই সী! তিনি তাড়াতাড়ি নার্সের হাতে ধরা ট্রে থেকে সিরিঞ্জ উঠিয়ে বলেন, যুদ্ধে না জানি কতদিন লাগাতর জেগেছিল, এখন ঘুমোনো দরকার!

আমার কোমরে ইঞ্জেকশান পুশ্ করে বলেন, চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, ঘা শুকিয়ে গেলে কাঠের হাত লাগিয়ে দেব! আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। একটু থেমে আবার বলেন, হ্যাঁ, কাঠের হাত, একদম আসল হাতের মতন!

ওর কথায় আমার আকাঙ্ক্ষা পল্লবিত হয়। নীরুর সুন্দর মুখটাকে কি এই কাঠের হাত দিয়ে তুলে ধরতে পারবো? আমার ভালবাসার স্পন্দন, আমার রক্তের উষ্মা কেমন করে ওকে শিহরিত করবে? কাঠের হাত দিয়ে কি সত্যি সত্যি নীরুকে ছোঁয়া যাবে?

আমার প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব এখন ঘুম। ইঞ্জেকশানের প্রভাবে অসহায় শরীর অবশ করে ঘুম আমাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ডাক্তারের ঠোঁট নড়তে দেখি। হয়তো আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন বড় কারখানা স্থাপনের স্বপ্ন দেখাতে চান। ঐ কারখানায় একসঙ্গে হাজার হাজার কাঠের হাত, কাঠের পা এবং কাঠের তৈরী অনান্য অঙ্গ উৎপন্ন হবে। হয়তো কাঠের মানুষও তৈরী হবে। তাই বলে মানুষের হাড়মাংস কোনদিন মূল্যহীন হয়ে পড়বে না।

না জানি ডাক্তারবাবু কী কী বলছেন! হয়তো কিছুই বলছেন না। আমার একমাত্র চোখের পাতা বুজে আসছে। কিন্তু ঘুমের প্রভাব অদ্ভুৎ! এখনও স্পষ্ট দেখছি, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, বায়া! .....দায়া!......বায়া!

বায়া!.....দায়া!......বায়া! খোলা মাঠে সৈনিকরা প্যারেড করছে। অসংখ্য হাত আর পা একসঙ্গে সামনে পিছনে আন্দোলিত হচ্ছে, — বায়া!.....দায়া!......বায়া!

বায়া!.....দায়া!......বায়া! .... এ কী! আন্দোলিত হাত-পাগুলিও দেখছি কাঠের তৈরী। আমি শিউরে উঠি। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ওদের শরীর থেকে কাঠের টুকরোগুলি ছিটকে ছিটকে এসে আমাকে নির্ঘাত অন্ধ করে দেবে। আমি পালাতে চাই, কিন্তু ওখান থেকে একচুলও নড়ার ক্ষমতা নেই। কর্ণভেদী আওয়াজে অসহায়ের মতন ভাবি কেমন করে এই বিকট শব্দের চক্রব্যূহ ভেঙ্গে বেরোবো! তখন চারপাশে উঁচু উঁচু দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। কঁরর......ছঁক! ....কঁরর......ছঁক!.......কঁরর.....! এই বিকট শব্দ ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে আসছে।

তখনই আমার সামনে একটা ইট খসে পড়লে তার ফাঁক দিয়ে দেখি একটি দৈত্য-করাত মোটা মোটা কড়িববগা কাটছে। র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠের টুকরোগুলি পালিশ হচ্ছে, ধীরে ধীরে মানুষের নানা প্রত্যঙ্গের আকার ধারণ করছে। নানা ভাজে স্প্রিং ও কব্জা লাগিয়ে হাত ও পাগুলিকে জঙ্গম করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

তারপর দু'হাত সামনে মেলে ধরে কাঠের মানুষেরা এক এক করে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। এক মহিলা উন্মাদের মতন এদিক-ওদিক ছুটছেন। তিনি কাঠের মানুষগুলিকে থামিয়ে থামিয়ে চেনার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ তিনি একটি কাঠের হাত জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন চুমু খেতে থাকেন। তিনি ওর মুখ হাতে নিয়ে আদর করতে গেলেও কাঠের মানুষটা থামে না, চলতেই থাকে। মহিলা কাঠের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে, চলমান কাষ্ঠপ্রতিমার সঙ্গে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে চলেন।

হঠাৎ অন্যদিক থেকে এক লৌহমানব এসে উরু থপ্থপান। তারপর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। লড়তে লড়তে কাষ্ঠমানব ভাঙ্গতে থাকেন, লৌহমানব এখানে-ওখানে চ্যাপ্টা ও বিকৃত হন। তবু ওরা লড়তে থাকেন। লড়তে লড়তে ওরা আমার উপর এসে পড়েন। যন্ত্রণায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। আর্তনাদ করে উঠি।

ছটফট করতে করতে হয়তো একটা বা দু'টো সেলাই ছিঁড়ে গিয়ে আমার ক্ষতস্থান ও বিছানা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। হয়তো এখুনি নার্স আবার দৌড়ে আসবেন, ডাক্তারবাবু আবার ঘুম পাড়ানোর ইঞ্জেকশান দেবেন, হয়তো ক্ষতস্থানে আবার সেলাই পড়বে! না জানি কত রক্ত বয়ে গেছে, চেহারা হয়তো হলুদ হয়ে পড়েছে। ধূসরপ্রায় মাংস ও মাটিকে সতেজ রাখার জন্যে এখুনি হয়তো ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আসবে, কোন সৈনিক ভাইয়েরই দান করা রক্ত!

মনে হয় যুদ্ধে আসার সময় একটি বৃশ্চিক ঠোঁটে করে এনেছিলাম। এখন ওর দংশনে নীল হয়ে থাকা শরীর থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ি। এইসময় আমার স্বয়ংনির্মিত একান্ত নিজস্ব সময় যা এখন অমোঘ হয়ে নিস্তব্ধ।

শস্যের পোকার মতন ভেজা কিলবিলে একটি গলিতে আমার পা, যার প্রান্ত থরথর কম্পিত

অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে গেছে। এই গলিকে চেনার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার পরিচিতিই ডগমগিয়ে ওঠে। এই আমার শৈশবের গলি, কৈশোরের গলি, আকাঙ্ক্ষার গলি, যার কাছে মুখ লুকিয়ে থাকার যন্ত্রণা এতদিন সহ্য করেছি। এখন কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে পা ঝেড়ে এগিয়ে যাই। আমার ঢিলে ফৌজী বুট জোড়া ভীতসন্ত্রস্ত নিস্তব্ধতার বুকে গটগট করে এগিয়ে যায়, নাকি পিছিয়ে চলে? এর প্রান্তে কি নীরু নামে কেউ থাকে?

— দেখ, কিছুই তো পাল্টায়নি! আমি চমকে উঠি। কে কথা বলে? চারপাশে কাউকে দেখছি না, শুধু অন্ধকার!

এ মুহূর্তে আমারও মনে হয়, আসলে কিছুই পাল্টায় নি। শুধু সময়ের একটি টুকরো লুট হয়ে গেছে। যদি কিছু পাল্টে থাকে তা হলো যেখানে কিশোররা খিদ্দো খুন্তি খেলতো সেই মাঠের সবুজ ঝলসে গেছে। শহরের শ্মশানে ধ্বংসাবশেষের ছায়া-যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে আর কী দিতে পারে?

অনেক কষ্টে নিজেকে হ্যাঁচড়ে বন্ধ দরজা অব্দি পৌঁছেও কলিংবেল বাজাতে পারি না। এখনো ওরা কাঠের হাত দেয়নি। আমি মাথা দিয়ে দরজায় ঠোকর মারি। দরজায় লাগানো পেরেকের পেছনের অংশে আঘাত লেগে লেগে আমার কপাল ফুলে ওঠে। বন্ধ দরজার ওপাশে না জানি কত দুশ্চিন্তার বোঝা, যে খুলতে এত দেরী হচ্ছে! অবশেষে যখন দরজা খুলল আমার মুখে থেমে থাকা বাতাসের ভাপ লাগে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়।

আমার ফিরে আসা অর্থহীন। নীরু চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আর আমি এই পারে। এখন সামনে মা থাকলে টেনে নিজের আঁচলে জড়িয়ে নিতেন। প্রেমিকা হলে তাঁর মোহে আমি গলে যেতাম। সন্তান হলে তাঁর আধো আধো বোল শুনে আমিও তোতলাতে শুরু কবতাম। কিন্তু এ এক অসময়ের আত্মা, অনেকক্ষণ বরফের মূর্তির মতন থেকে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে, এসে গেছ?

আমি চমকে উঠি। ওর দৃষ্টি, ওর প্রতীক্ষাও কি বরফ হযে গেছে? এই বরফ আমার উষ্ণতায় গলতে পারতো! কিন্তু আমি তো আর আসিনি! আমি তো এখনো সেই অন্ধকারে, যেখানে কবন্ধ ও দুষ্টু আত্মারা কেবল উপদ্রব করে!

— যুদ্ধ শেষ?

— যুদ্ধ!!!

আমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে। এক বিচিত্র সমুদ্রে হাবুড়বু খাই, যার কিনারায বালুতটে অনেক দূব অব্দি কেবল মানুষের মাথার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে, যেন কাটা মুখঅলা বিশাল সব শামুক কিম্বা ঝিনুকের খোল উল্টে আছে, ডাবের খোসার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

— যুদ্ধ শেষ?

এবার নিজের ভয়ানক সব ভাবনার বৃন্ত ছিঁড়ে, সম্পূর্ণ আবেগে বলি — আমার লড়াই তো সবে শুরু হয়েছে নীরু!

কোথায় হারিয়ে যাওয়া একটি পায়রার সামলে ওঠা বকবকুম চমকে উঠে পাখা নেড়ে ঝটপটায়। ঝটপটাতে থাকে।

বচনাকাল : ১৯৯৩

খিদ্দো খুন্তি : অনেকটা হকির মতন, লাঠি হাতে পাঞ্জাবে প্রাচীনকাল থেকে কিশোর-যুবকরা এই খেলা খেলে

কৃষণলাল গর্গ

হাতের ময়লা

মঘ্‌ঘর সিংহের দুর্ঘটনার খবর শুনে রতিরামের হাতের টিয়া উড়ে যায়। মঘ্‌ঘরের বাড়ি থেকে রতিরামের আড়তে ফসল পৌঁছুতে আসা লোকটি বলে, কর্তার খুব খারাপ অবস্থা শেঠজী। এই গতকালই তো নতুন ট্র্যাক্টর কিনে এনেছে। তারপরই হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে গভীর নলকূপে গিয়ে ওটাকে চালু করার জন্যে হাত বাড়াতেই এত জোরে কারেন্ট লাগে যে তিনি মেশিনেব গায়েই মুখ থুবড়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে উঠিয়ে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনো জ্ঞান ফেরেনি। শালার মানুষের জীবন! মুহূর্তের মধ্যে কী থেকে কী হয়ে যায়!

লোকটা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ রতিরাম থম মেরে বসে থাকে। লোকটা যেন ওকে উত্তপ্ত তাওয়ার উপর বসিয়ে গেছে। ও পাগলের মতন মাথার চুল টানতে থাকে। এতই উতলা হয়ে পড়ে যে ছেলে এক প্রশ্ন করলে ও অন্য জবাব দেয়। ছেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে আপনার?

রতিরাম নিজের কপাল চাপড়ে বলে, আরে শ্বশুর আমার, আমার মাথায় বাজ পড়েছে, কারো সই না নিয়ে কিম্বা টিপসই না লাগিয়ে দুই টাকাও ধার দিই না,কাল মঘ্‌ঘরকে এককথায় ট্রাক্টর কেনার জন্যে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছি। ও বললো, এই যাব আর ট্রাক্টর চালিয়ে ফিরবো। বেশীক্ষণ দেরী করলে অন্য কেউ না আবার হাত মেরে দেয়। লোকটা বিপদে পড়ে বেঁচেছে, ট্রাক্টরের অবস্থা এত ভাল যে কেউ ষাট হাজার দিয়ে কিনে নেবে। তবু আমি খাতাটা বের কবেছিলাম। কিন্তু ও বলে, এসব ফিবে করছি শেঠ, মিঠাই এর ডাব্বা হাতে নিয়ে এসে সই করবো, শুভকাজ খালিমুখে করা উচিত না। তারপর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদুয়ারা ও মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে আসবো! খুব মিঠাই খাওয়ালো ও আমাকে। আমার মুখের লালা অব্দি এখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। হায় হায়! দুঃসময় কারো অনুমতি নিয়ে আসে না।

ছেলে তখন বাবার কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলে, সব ব্যবসাতেই লাভ-লোকসান হয় বাবা, আমাদের ব্যবসায় লোকসানের সম্ভাবনা কম কিন্তু............., এরকম মনখারাপ করলে কি টাকা ফিবে আসবে? শুধু শুধু মাথা খারাপ করবেন না, আপনার ভাগ্যে থাকলে সব ফিরে আসবে, বরঞ্চ লোকটার আরোগ্য কামনা করুন।

মঘ্‌ঘর সিংহের পরিবারের সঙ্গে রতিরামের পরিবারের দীর্ঘদিনের মেলামেশা। মঘ্‌ঘরের ঠাকুর্দা

বা তাঁর ঠাকুর্দার আমল থেকে রতিরামের ঠাকুর্দা বা তাঁর ঠাকুর্দারই আড়তে যুগ যুগ ধরে সাম্বৎসরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল গুদামজাত হচ্ছে। যখনই টাকার প্রয়োজন পড়ে, নিয়ে যায়। অবশেষে ফসল গুদামজাত হলে প্রতি বছর হিসেব পরিষ্কার হয়। মঘ্ঘরের কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও যখন যা দরকার রতিরামের কাছে এসে জেঠু এটা দিন, ওটা দিন বলে নিয়ে যায়। মঘ্ঘরও বাপ-ঠাকুর্দার মতন হিসেবে পাকা, মনটাও পরিষ্কার। একবার কিছু বলে দিলে নিজের কথায় অবিচল থাকে। লিখিত হিসেবেই নিষ্ঠা বেশী। ও বলে, মঘ্ঘর, এমনিতেই তোর জন্যে আমার জান হাজির, কিন্তু হিসেব ঠিক না থাকলে মা-মেয়ের মধ্যেই ঝগড়া হয়ে যায়। হিসেব ঠিক থাকলে যেকোন সম্পর্কই বরাবর থাকে, নাহলেই যত বিপত্তি! কত পরম বন্ধুকে পরস্পরের চরম শত্রুতে পরিণত হতে দেখেছি।

এহেন রতিরামেরই কাল বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল। মানুষের দুঃসময় বুঝি এরকমভাবেই আসে। এসব ভেবে ভেবে ওর শরীর কেমন করে, বমি বমি লাগে। এই উদ্‌গারভাব ওকে নত্তি গ্রামের বিহারীর কথা মনে করিয়ে দেয়। পরশু সকালে একবার বমি করেই ও মরে যায়। ডাক্তার আসার আগেই পাখি উড়ে যায়। ওর কথা মনে পড়তেই রতিরামের বুকের ধুকপুকানি বাড়ে। ও হঠাৎ বসে বসেই গদিতে শুয়ে পড়ে। তাই দেখে ছেলে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে বাবাকে খাওয়ায়, তারপর রুমাল ভিজিয়ে কপাল, ঘাড় ও গলা মুছে দেয়। এতক্ষণে রতিরামের একটু ভাল লাগে। তবুও লম্বা টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বাবা, ধৈর্য হারাবেন না, চলুন হাসপাতালে গিয়ে অবস্থা দেখে আসি। ছেলের কথা শুনে রতিরামের ভাল লাগে। সত্যিই তো, না মরতেই ভূত দেখার কোন মানে নেই। আমিও এখানে শুয়ে মন খারাপ করলে তো আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ফিরে আসবে না। ঠাণ্ডা জল খেয়ে আর সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসে কিছুটা ঠিক লাগলেও হিম্মত করে উঠে আসে। জুতোজোড়া ন্যাকড়া দিয়ে মুছে পায়ে গলিয়ে ছেলেকে বলে, চল্ বাবা, তাহলে দেখেই আসি। ছেলে আলো-পাখা বন্ধ করে শাটার নামায়। তারপর স্কুটার বের করে বাবাকে পেছনে বসিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মঘ্ঘরকে খুঁজতে খুঁজতে জেনারেল ওয়ার্ডে পাওয়া যায়। ওর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে আশপাশের বেডগুলিতে চুপচাপ ঘাবড়ানো চেহারা নিয়ে বসে রয়েছে। মঘ্ঘরের মাথা ব্যান্ডেজে মোড়া, হাত দুটিতে প্লাস্টার চড়ানো, দুই পায়েই এখানে ওখানে গজ ও অ্যাডহেসিভ প্লাস্টারের আবরণ দেখে বোঝা যায় আঘাত কত গুরুতর। রতিরামকে দেখে মঘ্ঘরের স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে। ছেলেমেয়েরাও চোখ মোছে। রতিরাম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, মেয়েদের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মঘ্ঘরের স্ত্রীকে বলে, ভাই বসন্ত কৌর, কী থেকে কী হয়ে গেল? গতকালই তো এই শহর থেকে ট্রাক্টর কিনে নিয়ে গেছে!

হ্যাঁ দাদা, কী করলো? না জানি কেমন লোহা ঘরে এনেছে! মাঝপথে কারো খারাপ পয়সায় হাত দিয়েছে কিনা কে জানে! অনেক স্বপ্ন ছিল নিজস্ব ট্রাক্টরের, কিন্তু সব জিনিস সবাইকে সয় না! বসন্ত কৌর ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে বের করে দেওয়া কড়কড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাকে খারাপ পয়সা বলায় রতিরামের বুকে জ্বলন শুরু হয়। ও আর থাকতে না পেরে বলে, আমি থাকতে মঘ্ঘর কোন খারাপ পয়সায় হাত দিতে যাবে কেন? গতকাল ও আমার থেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছিল! কিন্তু দুঃসময় .... !

—টাকার ব্যাপারে তিনিই সব জানেন, কাকে কি দিয়েছেন, কার থেকে কী নিয়েছেন, আমাদের কখনো বলেননি! পুরুষমানুষের এই তো মহাগুণ ...., যাইহোক, তাড়াতাড়ি সেরে উঠলে বাঁচি!

এরকম মহিলাদের রতিরাম দু'চোখে দেখতে পারে না। এখনই কী সুন্দর চোখ উল্টে দিচ্ছে, মঘ্‌ঘর মারা গেলে এই মহিলাকে কে বাগে আনবে? কিন্তু রতিরাম ওর ভেতরের রাগকে কোনমতেই প্রকাশ করে না। ও চুপচাপ মঘ্‌ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় হঠাৎ মঘ্‌ঘরকে বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠতে শোনে। রতিরাম মঘ্‌ঘরের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে বলে,

—মঘঘর সিংহ......মঘ্‌ঘর !

—মঘঘর সিংহ......মঘ্‌ঘর ! ....দেখ তো আমি কে?

ওর প্রশ্ন শুনে ...... মঘ্‌ঘরের ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে, — যম..... দূত...! একথা শুনে রতিরামের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। বসন্ত কৌর বলে, — ব্যস, এইরকমই ভুল বকছে, কখনো কখনো কাউকে চিনতে পারছে, আবার কখনো কাউকেই চিনতে পারছে না।

রতিরাম মনে মনে বলে, টাকা নেওয়ার সময় শেঠজী, শাহজী আরো কত কী, আর এখন যমদূত বলা হচ্ছে? তবু ও মুখে বলে, — কোন ব্যাপার নয়, — ঈশ্বর নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন, এই বেচারা তো কখনো একটা পিঁপড়েও মারেনি। সহজ সরল মানুষ....... বাহেগুরু পরমেশ্বর সব ঠিক করে দেবেন, স-ব তারই হাতে! তোমরা চিন্তা করো না, আমি গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি, খাবার এখান থেকেই যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি। টাকা-পয়সার দরকার পড়লে যখন খুশী আমাদের ওখান থেকে নিয়ে নিও! ওর কথা শুনে কৌর ওর সামনে হাতজোড় করে বলে, ঠিক আছে দাদা, আগেও আপনিই করেছেন, এখনো আপনাকেই করতে হবে! ব্যস, ও উঠে দাঁড়াক!

— আঘাত কি খুব বেশী?

মাথায় ত্রিশটা সেলাই পড়েছে। হাতের হাড্ডিও টুকরো হয়ে গেছে, এক্সরেওয়ালা বলেছে। এছাড়া হাতে পায়ে কিছু ক্ষত রয়েছে।

রতিরাম ছেলেকে সঙ্কেতে কিছু বোঝালে ও তখনই হাসপাতাল থেকে চলে যায়। রতিরাম তখন মঘ্‌ঘরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। দু-একজনকে ও আগে থেকেই জানে। এর মধ্যেই একজনকে ডিউটি রুমে পেয়ে ও মঘ্‌ঘরের ব্যাপারে জানতে চায়। ডাক্তারবাবু বলেন, এখনো সিরিয়াস, গ্লুকোজ চলছে, পরে আবার রক্তও দিতে হতে পারে। এমনিতে বেঁচে তো গেছেই, তবু বলা যায় না, দু-তিনজন লোককে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে তৈরী রাখুন। রক্ত দিতে হবে। রক্তের কথা শুনে রতিরামের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুতলয়ে বইতে থাকে। পয়সাও গেছে এখন রক্তও দিতে হবে? শালার খবরটা শোনার পর থেকে শরীরের রক্ত তো এমনিই শুকিয়ে গেছে। রতিরাম মঘ্‌ঘরের ছেলের সাহস বাড়াতে ওর পিঠে হাত রেখে বলে, কোন ব্যাপার নয় বাবা, এরকম চোট আঘাত তো মানুষের জীবনে আসতেই থাকে। বেঁচে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গ্রাম থেকে দুই-চারজনকে রক্তের জন্যে চলে আসতে বলো, তেমন প্রয়োজনে আমিও রক্ত দেব। ওদেরকে ওয়ার্ডে ফিরতে দেখে বসন্ত কৌর জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার কী বললো? তেমন কিছু নয়, চিন্তা করো না, হয়তো রক্ত দিতে হবে; যাও বাবা, গ্রাম থেকে দু-চারজন ... ঠাণ্ডা মাথায় যেও বাবা।

মঘ্‌ঘরের ছেলে বোনদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে চলে যায়। তাড়াহুড়োয় ঘরদোরে কোথাও তালা না লাগিয়েই কাল সবাই চলে এসেছে। সেই থেকে সারারাত সবার এমনি কেটেছে। বসন্ত কৌর-এর চোখ লাল।

ওরা চলে গেলে বসন্ত কৌর রতিরামকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কী মনে হয়, দুশ্চিন্তার কিছু নেই তো?

ওর নির্ভরতাপূর্ণ আওয়াজে রতিরামের মন কেমন করে। ও বলে, তুমি একদমই চিন্তা করো না, পুরো শক্তি লাগিয়ে দেব, মঘ্ঘর তো আর পর নয়। একথা বলতে বলতে রতিরাম ওর কাছে এগিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দেয়। বসন্ত কৌর লজ্জায় না শঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে স্থির বসে থাকে। তখনই রতিরামের ছেলে ফিরে আসে। ও পঞ্চাশ টাকার একটা বাণ্ডিল পকেট থেকে বের করে রতিরামের হাতে দেয়। রতিরাম বাণ্ডিলটা বসন্ত কৌর-এর হাতে দিয়ে বলে, দরকার পড়তে পারে। আরো লাগলে আরো পাঠিয়ে দেব, বিপদের সময়ই বোঝা যায় কে আপন আর কে পর।

নোট নেওয়ার সময় রতিরামের হাত বসন্ত কৌর-এর হাত ছুঁয়ে যায়। দু'জনের শরীরেই এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে যায়। বসন্ত কৌর আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

একটু পরেই রতিরামের স্ত্রীও ওখানে পৌঁছে যায়। ও এক প্রতিবেশী যুবকের স্কুটারে এসেছে। ও বসন্ত কৌরকে বলে, আজ চলো আমাদের বাড়িতেই স্নান-টান করে দু'টো খেয়ে নেবে। জামাকাপড় কিছু ধোয়ার থাকলে তা-ও রেখে যাবে। কিন্তু বসন্ত কৌর এক মুহূর্তের জন্যেও মঘ্ঘরকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হয় না। দুপুর নাগাদ গ্রাম থেকে কয়েকজন এসে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত জমা করে। রতিরাম অন্যদের সামনে বারবার ডাক্তারবাবুকে বলে, সাহেব, প্রয়োজনে আমারও রক্ত নেবেন। ডাক্তার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়। রতিরাম অন্য দাতাদেরকে সাহস দেয়, চলো ভাই বাহাদুর বাঘেরা........ হ্যাঁ ভাই, শাবাস্, এমনিতেও বছরে এক -দুবার রক্ত দিলে শরীর ভাল থাকে। কাউকে বাঁচানোর চাইতে বড় পুণ্য আর কি আছে ভাই?

রক্তদানের সঙ্গে শাস্ত্রের বিধান খুঁজে বের করতে দেখে ডাক্তারবাবু মুচকি হেসে বলেন, আসুন লালাজী, আপনি দেবেন তো চলুন!

রতিরাম চাপাস্বরে বলে, দরকার হলে তো দেবই!

— তাহলে চলুন।

রতিরাম রক্তদান কক্ষে ঢোকার আগে গ্রামবাসীদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন ও শহীদ হতে যাচ্ছে। যেন মনে মনে বলছে, দ্যাখো আমাকে শুধু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ভেব না, খদ্দেরের দুর্দিনে রক্তদান করতেও পিছপা হই না!

ও ভেতরে গেলে সবাই ওর প্রশংসা করে। বাইরে বেরোতেই শোনে একজন আরেকজনকে বলছে, ভাই শেঠজী স্রেফ আড়তিয়া নয়, আত্মীয় থেকেও অনেক বেশী, আমরা তো এমনি মাটি খামচে পড়ে আছি!

একথা শুনে রতিরামের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। সামান্য রক্ত দিতে আর কী, কিন্তু আজ গ্রামীণ সমাজে ওর স্থান অনেক উপরে উঠেছে। ও অনুভব করে সামনের ঋতুতে এই রক্ত ওকে অনেক বেশী মুনাফা এনে দেবে!

এক-দু বোতল রক্ত পাওয়ার পরই রতিরামের জ্ঞান ফিরে আসে। ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করে। ডাক্তারবাবু বলেন, হাতের হাড্ডি দু'টি এত বাজেভাবে ভেঙ্গেছে যে দু'হাতেই এখন চামড়ার ভেতরে স্টীলের প্লেট লাগাতে হবে। খরচ হবে হাজার পাঁচেক।

বসন্ত কৌর এতে সায় দেয়। রতিরাম থাকতে চিন্তা কিসের।

দু'দিন পর মঘ্ঘরের হাতে স্টীলের প্লেট লাগানো হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মঘ্ঘর স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া শুরু করে। ডাক্তারবাবু বলেন, আর এক সপ্তাহ পরই আপনারা ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। ড্রেসিং করাতে থাকবেন। আরো সপ্তাহ খানেক পর সেলাই কাটতে হবে। ডাক্তারবাবুর কথায় পুরো পরিবার বুক ভরে স্বস্তির বাতাস নেয়। হাসপাতালে আরো বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। রতিরাম খোলা হাতে সব টাকা দিয়েছে। উপরন্তু মঘ্ঘরকে বাড়ি নিয়ে এলেও ডেয়ারি

থেকে একটা দুই কিলো ওজনের ঘি এর কৌটো নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যায়। বসন্ত কৌর জিজ্ঞেস করে, এটা কি দাদা?

আরে বোকা, ওর এত রক্ত গেছে, পুরো ঘিটা ওকে খাইয়ে দাও — তবেই তো আবার শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে।

— ঘরেই তো অনেক ঘি, ঈশ্বরের কৃপায় এতগুলি মোষ আর গরু রয়েছে।

— তা তো বটেই, তবু, আমি তো আর বাইরের লোক নই।

মঘ্ঘর হেসে বলে, শেঠজী, টাকা পয়সা তো জলের মতন খরচ হলো, ঈশ্বর একবারে দ্বিগুণ পিটন দিলো!

— টাকাপয়সা কি সঙ্গে যাবে মঘ্ঘর? সব এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। পয়সা তো মানুষের হাতের ময়লামাত্র। জীবন অমূল্য, ঈশ্বরের অসীম কৃপায় এযাত্রায় তুমি বেঁচে গেছ, তোমার কোন দান পুণ্য মাঝপথে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তোমাকে রক্ষা করেছে, নাহলে যা খুশী হতে পারতো।

— আর সব তো ঠিক আছে, মনে হচ্ছে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। কোন কিছুই মনে থাকছে না। এক মিনিট আগে বলা কথাটাই ভুলে যাচ্ছি; স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যাবে না তো শেঠ?

একথা শুনে রতিরামের মাথাখারাপ হওয়ার মতন অবস্থা। ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। শরীর ঘাম দেয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলে, সুস্থ মানুষই অনেক কিছু ভুলে যায় মঘ্ঘর, হিসেব নিকেশেও ভুল-ভ্রান্তি হয়। তোমার ট্রাক্টরটা আশা করি অনেকদিন চলবে, ফাঁড়া কেটে গেছে, ওটা আনার পথে কিছু দান পুণ্য করে আসোনি কেন?

মঘ্ঘর মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। ওকে হাসতে দেখে রতিরামের শরীরে প্রাণ ফিরে আসে। ঝট্ করে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা স্টাম্প পেপার বের করে মঘ্ঘর সিংহের হাতে ধরিয়ে কলমটা দিতে দিতে বলে, এমনিতে মঘ্ঘর সিংহ তোর কিছু হলে আমার জান হাজির। কিন্তু হিসেবপত্র ঠিক না থাকলে মা-মেয়ের মধ্যেও কলহ বাঁধে, হিসেব ঠিক থাকলে মানুষের মনও সাফ থাকে — সব সম্পর্ক!

ওকে শেষ করতে না দিয়ে বসন্ত কৌর বলে, আপনার ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না দাদা, সব টাকা ফেরৎ দিলেও আপনার ভালবাসার ঋণে ডুবে থাকবো!

মঘ্ঘর সিংহ রতিরামের হিসেবটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে তার নিচে হাসিমুখে সই করতে করতে বলে, সত্যি সত্যি যদি কিছু হয়ে যেত শেঠজী?

কাগজটা ফেরৎ নিয়ে পকেটে ঠুসতে ঠুসতে রতিরাম বলে, তাহলেই বা তুমি কোথায় টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে? সব এখানেই থেকে যেত। যেমন আলেকজেন্ডারও তাঁর জয় করা ধন-সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি!

স্টাম্প পেপারটা পকেটে পুরে গদীতে ফেরার সময় ওর মনে হয় যেন মঘ্ঘর সিংহ-এর বদলে আজ ওরই হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হয়েছে।

রচনাকাল ঃ ১৯৯৩

হাতের টিয়া উড়ে যায় ঃ পাঞ্জাবী লোকোক্তি অর্থাৎ নিঃস্ব হওয়া বা মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া। এই লোকোক্তির উৎস সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদার বংশজদের টিয়াপাখি উড়ানো, পায়রা উড়ানো, ঈগল পোষা ইত্যাদির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

জোগিন্দর সিংহ নিরালা

উটপাখী

ঘরে ঢোকার আগেই জানালার কাচ দিয়ে আমার ছোটভাই বলবীরকে ড্রয়িংরুমে বসে অধীর অপেক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখি। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছে। ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। না জানি সবাই কেমন আছে। বাবা মা প্রীতো আর নসীবো ভাল আছে তো? কিন্তু নিজেকে সামলাই। এরকম করা ঠিক হবে না। বেশী উষ্ণতা দেখালে উল্টো ফল হবে । গতবার জড়িয়ে ধরেছিলাম । আমি পড়াশোনা করে বড় অফিসার হয়েছি অনেকটা ওর জন্যেই। বাবা যদি আমাকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিতেন আর ওকে পড়াতেন তাহলে হয়তো আমার জায়গায় ও হতো আর আমি বাবা-মায়ের কাছে গ্রামে থাকতাম। বলবীরের কাছে আরো অনেক কারণে ঋণী আমি। আমার অনুপস্থিতিতে ও কেবল বাবা-মাকেই দেখছে না, প্রীতো এবং নসীবোরও কোন অভাব রাখেনি।

অবশ্য আমি খরচের টাকা নিয়মিত পাঠাই। কিন্তু টাকাই তো সব কিছু নয়। দেখাশোনা কবার জন্য চাই বড় মন। সে জন্যেই গতবার এত উষ্ণতা সহ জড়িয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু সামান্য কথাবার্তার পরই যখন ও অতিরিক্ত এক হাজার টাকা চায়, আমার মন বিষিয়ে ওঠে। ও কি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে? সেদিন এক হাজার টাকা দেওয়ার সময়ই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে আর কোনদিন এত উষ্ণতা দেখাবো না।

হয়তো আজও তেমনি কোন মতলব নিয়ে এসেছে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় শক্ত করি। আমাকে দেখেই ও উঠে দাঁড়ায়। ছুটে কাছে চলে আসে। এতো কাছে, হয়তো আশা করেছিল আমার বাহুবন্ধন। কিন্তু আমার ব্যবহার ওকে চমকে দেয়। আমি কঠিন আওয়াজে বলি, তুই বস্, এখুনি জামা-কাপড় পাল্টে আসছি এটুকু শুনেই ও ঝিমিয়ে সোফায় বসে পড়ে। দু'জনের মাঝে এক ভারী আবহাওয়া জন্ম নেয়। চাকরকে আদেশ দিই, বাহাদুর চা নিয়ে আয়। তারপর বেডরুমে ঢুকে পড়ি। জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে ভাবি, বলবীরের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। এতে শিষ্টাচার নামক শব্দটারও অপমান করা হয়। কেউ দু'শো কিলোমিটার দূর থেকে এসেছে আর তুমি ভদ্রব্যবহারের অভিনয়ও করতে পারো নি?

আবার ভাবি, উষ্ণতা প্রদর্শন, শোবার ঘরে টেনে আনা, দু'পেগ ডিপ্লোমেট হুইস্কির আপ্যায়ন;

সবই করা যেত যদি ও আমার ভাই না হতো আর গ্রাম থেকে না আসতো। অন্যদের সঙ্গে যাই করো না কেন, ভাই কিম্বা আত্মীয়ের সঙ্গে সতর্ক হয়ে কথা বলা উচিত।

বলবীর যখনই আসে মনে হয় পুরো গ্রামটাই উঠে চলে এসেছে। সেই গ্রাম যার থেকে আমি মুক্তি চাই — অনেক দূরে পালাতে চাই বাবা-মা-প্রীতো-নসীবোর থেকে অনেক দূর। আবার ভাবি, মা জন্ম দিয়েছে, লালন-পালন করেছে, বাবা জমি বন্ধক রেখে পড়িয়েছে, প্রীতো এবং নসীবো অশিক্ষিত গ্রামীণ হলেও আমার সব কিছু! পত্নী এবং কন্যা থেকে কেউ কেমন করে দূরে থাকে? লোকে পড়াশোনা করে নিজের কেরিয়ার পাল্টাতে পারে কিন্তু নিজের মানুষজন তো আর বদলানো যায় না!

আমি চেষ্টা করেছি। শহরে আবার বিয়ে করেছি। রতি কত আধুনিকা! রতি আর ওর বাবা মেজর সাহেব আমাকে বড় হতে সাহায্য করেছে। সোসাইটিতে থাকার জন্যে, অফিসে প্রোমোশানের জন্যে একজনকে কত কিছুই না করতে হয়!

ভালোই হলো, ওরা এখন ক্লাবে, নয়তো বলবীরকে দেখেই রতি গজগজ করতো। গ্রাম থেকে কেউ এসে ওদের চকমকে বাংলোকে নোংরা করে রতি এটা পছন্দ করে না। পোশাক পাল্টে সোফায় ওর পাশেই গিয়ে বসি। হয়তো এতক্ষণেও আমার মানসিক স্থিতি বুঝে গেছে, তাই আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, বাবা খুবই অসুস্থ।

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ভাবি, বাবা সত্যিই অসুস্থ হবেন। শ্বাসকষ্ট আগেই ছিল। এখন বয়সের সাথে আরো নুয়ে পড়া, রোগা ধুকপুকে শরীরটা আমার চোখে ভাসছে। সারাজীবন জুতো পরেননি। আমি চাকরি পেয়ে এক জোড়া পায়জামা-কামিজ বানিয়ে দিয়েছিলাম। কতো বছর ধরে পরছেন! হয়তো আজও পরছেন। বাবার পাশাপাশি হাঁটতে আমার ভাল লাগে। তিনি আমার কাছে বরাবরই আকর্ষণীয়। এজন্যেই ফ্রয়েডের ইডিয়স থিওরি আমার ভুল বলে মনে হয়। কিন্তু আজ বলবীরের মুখে "বাবা অসুস্থ" কথাটা শুনে মনে হয় অন্তিম সময় নিকটবর্তী। ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতে বাবা ক্ষেতে জলসেচের জন্যে কোদাল হাতে জলের খাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষটাকে তপস্বী বলে মনে হতো। তাঁর ঐ ফাটা খসখসে হাতের আদর কেমন করে ভুলবো?

কিন্তু এখন সব ভুলতে হবে। নতুন দুনিয়া বসাতে পুরনোকে মিটিয়ে দিতে হয়। আমি বলবীরের পিঠে হাত রেখে বলি, বলবীর, চেক কেটে দিচ্ছি — বাবাকে কোন ভাল ডাক্তার দেখাও। যেন চেক কাটলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর আমি দায়িত্বমুক্ত হবো।

— কিন্তু এবার হয়তো বাবা বাঁচবেন না, একবার তোমাকে দেখতে চান, মা ও বলছিলেন, যদি একবার আসে নসীবোর সম্বন্ধও ঠিক করে যাবে!

নসীবোর কথা শুনে মনে হয় আমি কতো কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। প্রীতো বেচারী তো কষ্ট ভুগছেই পাশাপাশি নসীবোকে কোন্ পাপের সাজা দিচ্ছি? আমাদের সন্ততি হওয়াটাই কি ওর দোষ? আমার স্বার্থের জনাই তো ওর পড়াশুনো হয়নি অশিক্ষিত গেঁয়ো হয়ে রয়ে গেছে। এরকম মেয়ের বরও এরকমই অশিক্ষিত, দিন আনে, দিন খায় ঘরের হবে! আমি গ্রাম থেকে কেন চলে এলাম? ওখানে দুঃখ-দারিদ্র্য যাই থাকুক না কেন সবাই কতো আপন! এই পলায়ন ঠিক নয়। ঝড় দেখে যদি আমরা নিজেদের মাথা বালিতে ঢুকিয়ে দিই তাহলে কি ঝড় থেমে যাবে? আজই আমার গ্রামে ফেরা উচিত।

কিন্তু এখানে আমি যে দুনিয়া বানিয়েছি তার কী হবে? আমার অফিসারী ঠাটবাট, রতি এবং মেজর সাহেব?

টেবিলে রাখা চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, তবু আমি ওকে চা খেতে বলছি না কেন? আমার ভেতরে ঝড় উঠেছে— তুফান; এই তুফান থেকে কেমন করে বাঁচবো? গতি আরো বাড়তে থাকলে এই

বাংলোর সব কাচ ভেঙ্গে যাবে। আমার কী হবে? নিজেকে কোনমতে সামলে আবার ওর কাঁধে হাত রাখি। শান্ত আওয়াজে বলি, বলবীর আমি অবশ্যই যাবো। আপাততঃ তুই পাঁচশো টাকা নিয়ে যা, দরকার পড়বে। আমি যেন পাখীর মতন ওড়ার জন্যে ছটফট করছিলাম। পাঁচশো টাকা ও যেন ছিনিয়ে নেয়। আমার ভাল লাগে না কিন্তু খুশী হই। পাঁচশো টাকা দিয়েই আপাততঃ গ্রাম থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি।

রতির সঙ্গে আমার সম্পর্কও আজকাল ভাল নেই। প্রতিদিন দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। এখন তো কাছাকাছি থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের কোন ভাষা খুঁজে পাই না। সময় ভারী হয়ে কোথাও থেমে থাকে। মেজর সাহেবের সঙ্গে হুটহাট যখন তখন বেরিয়ে যাওয়া আমার ভাল লাগে না। সেদিন মাঝরাতে ক্লাব থেকে ফিরলে বলি, রতি এতো রাতের ক্লাব আমার পছন্দ নয়, তাড়াতাড়ি ফেরার অভ্যাস বানাও!

একথায় ও তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, ও বুঝেছি, আমার আর ড্যাডির বন্ধুত্বে তোমার হিংসে হচ্ছে, তোমাদের গ্রাম্য মন ভীষণ সঙ্কীর্ণ, কোনো কিছুই সহজভাবে নিতে জানো না! এটুকু বলেই ও বাথরুম চলে যায়। মেজর সাহেব আমার কাছে বসে ফুকফুক সিগারেট খেতে থাকে। কিন্তু কিছুই বলে না। আমি বলি, আজকাল রতির যেন কী হয়েছে, সবসময় ঋণাত্মক কথা বলে! আগেও কয়েকবার এরকমই অসামঞ্জস স্থিতি জন্ম নিয়েছে কিন্তু আমিই প্রসঙ্গের সংবেদনশীলতা ভেবে সবসময় এড়িয়ে গেছি। আমরা তো আর ইংরেজ নই, ভারতীয় সংস্কৃতি —

আমার কথা শেষ করার আগেই মেজর সাহেব গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বলে, ইন্ডিয়ার লোক দু'শো বছর পিছিয়ে আছে, ছাগল-ভেড়ার জীবন নির্বাহ করছে! যদি এখানে থামতো হয়তো কিছুই বলতাম না, কিন্তু যখন সিগারেটে লম্বা সুখটান দিয়ে বলে, বিশেষ করে গ্রামবাসীরা এতো জঙ্গলী আর অসভ্য, ব্লাডি বাস্টার্ডস!

আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি টিপে ধরি, আজ মেরেই ফেলবো শালা! তখনই রতি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে। ওর মুখে বিলিতি মদের গন্ধ। আমার ঘেন্না করে। আমি ওর বাবাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে কষে একটা থাপ্পড় দিই। ও-ও আমাকে থাপ্পড় মারে। তারপর আমাকে গালি দিতে দিতে বাবাকে টেনে নিয়ে অন্যঘরে চলে যায়। আমাকে পরদিন অন্য কোথাও চলে যেতে বলে। তখন আমার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। অনুভব করি, এ আমার স্থান নয়, আমি ঐ গ্রামেই মা-বাবা-প্রীতো আর নসীবোর মাঝে ফিরে যাব! সেদিন থেকেই আমাদের মাঝে এক অদৃশ্য দেওয়াল দাঁড়িয়ে পড়ে। লেখাপড়া করে মানুষ নিজের বেশভুষা পাল্টাতে পারে, পরিশ্রম করে দুনিয়ার পথে চলতে চলতে ভালো পদবী পেতে পারে কিন্তু নিজস্ব সংস্কার থেকে নিজের গ্রাম থেকে কেমন করে মুক্তি পাবে? আমি তো কৃষক সন্তানই। পুরুষানুক্রমে চলে আসা সংস্কারের উর্ধ্বে কেমন করে উঠবো?

— বাবা, বাড়িতে আসো না কেন? অফিসে আমার সামনের চেয়ারে বসা নসীবোর এই সাধারণ প্রশ্ন আমার বুকে ঝাঁঝরের মতন বাজে। বুঝতে পারি না, আমি ত্রিশঙ্কুর মতন কেন ঝুলছি! রতি ও মেজর সাহেবের কাছে আমার প্রয়োজন অনেকটা টমির মতন। আমার আর ওর মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে ও কুকুর শরীরধারী আর আমার শরীরটা মানুষের!

নসীবোর প্রশ্ন শুনে ওকে ভালমতন দেখি। সাধারণের চাইতেও নিম্নমানের পোশাকে ওকে কতো ভাল লাগছে! ওর মাথার কালো ওড়না আমাকে প্রীতোর কথা মনে করিয়ে দেয়। নসীবোর জন্মের পরই প্রীতো আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ছিল। ওকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে এলে এমনি কালো ওড়নায় মাথা ঢেকে এসেছিল। গর্ভপাতে ওর আপত্তি ছিল, বাচ্চা তো ভালো কর্ম করলেই

তবে ভাগ্যে আসে!

ওর আপত্তি আর কান্নাকে আমি পাত্তা দিই না। কোন মূল্যেই আর বাচ্চা নিতে প্রস্তুত ছিলাম না। গর্ভপাতের পর ওকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে ফেরার সময় সারা রাস্তা ওর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সেদিন আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।

এদিকে আমার সঙ্গে সাত বছর কাটিয়ে রতির কোল এখনো শূন্য। ও আমার বাচ্চার জন্ম দিতে চায় না। এ রহস্য আমি হালেই জানতে পেরেছি যেদিন সন্ধ্যায় ও একা বিছানায় শুয়েছিল। আমি অফিস থেকে ফিরে ওকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে ওর পাশে বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে ডার্লিং?

— তেমন কিছু না, ডি এন সি করিয়েছি তো। তাই দুর্বল লাগছে!

নসীবোকে সামনে বসিয়ে এসব আকাশপাতাল ভাবছি তখনই আমার পি এ মিষ্টার শর্মা নসীবোর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, সাহেব চা বলবো?

এরকম মলিনবেশী একটি মেয়েকে এভাবে বসে থাকতে দেখে ও হয়তো আশ্চর্য হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বলি, হ্যাঁ শর্মাজী চা পাঠান, গ্রাম থেকে আমাদের সার্ভেন্টের মেয়ে এসেছে। শর্মা বেরিয়ে যেতেই নসীবো জিজ্ঞেস করে, সারভেন্ট কে বাবা, আমি তো তোমার মেয়ে! ওর কথা শুনে আমি বোকার মতন হেসে বলি, ঐ একই কথা!

এরপরই নিজের উপর গ্লানি হয়। ছিঃ, নিজের মেয়েকে আমি চাকরের মেয়ে বললাম! কত স্বার্থপর হয়ে গেছি, এ আমার কী হলো, ওর জামাকাপড় মলিন তো কী হয়েছে, আমার নিজেরই তো রক্ত, ওর ভালখারাপ সব কিছুর জন্যে তো আমিই দায়ী, নসীবোই আমার বাস্তব, আর কতদিন এই বাস্তব থেকে পালিয়ে বেড়াবো?

এই বাস্তব যদি শর্মা কিম্বা অফিসের অন্য কেউ জানতে পারে তাহলে আমার প্রতিষ্ঠায় আঘাত আসতে পারে। আমি ফাইলের কাগজপত্র উল্টাতে উল্টাতে বলি, না বাবা, তোর এখানে আসা উচিত হয়নি। এটা অফিস; তুই চিনলি কি করে?

— কাকুর সঙ্গে এসেছি, জান বাবা, কাকী তোমার কথা ভেবে ভেবে মনখারাপ করে, প্রায়ই কাঁদে। তুমি আসো না কেন?

আমি জানি নসীবো ওর মাকে কাকী বলে, ওর বাবা ডাকে আমার মন কেমন করে, আবার একটা অস্বস্তিও হয়। যদি মেয়েটা লেখাপড়া জানতো তাহলে হয়তো ড্যাডি অথবা পাপা বলতো, আমি বুক ফুলিয়ে বলতাম — আমার মেয়ে! তখন ওর নামও হয়তো নসীবোর বদলে লক্ষী হতো, আবার ভাবি, এসব আমার ভ্রম—বাস্তব থেকে দূরে থাকার বাহানা মাত্র।

বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর বলবীরের ইচ্ছা ওরা আমার কাছে চলে আসুক। কিন্তু আমি চাই প্রীতো ও নসীবো গ্রামের বাড়িতেই থাক। আমার ভাগের জমিজিরেত বলবীরই দেখাশোনা করে। ইস্, ওর সঙ্গে যদি প্রীতোর প্রেম হয়ে যেত! ও যদি প্রীতোকে বিয়ে করে নিত তাহলে আমি সবচাইতে সুখী হতাম। কিন্তু কোনদিনও তা হবার নয়। লক্ষ্মণের মতন বৌদিকে শ্রদ্ধা করে বলবীর।

সেদিন অনেক কষ্টে নসীবোকে বিদেয় করি। ওর ছলছল চোখ দু'টি আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকে। শান্ত জলে দু'টো ঢিল মেরে কেউ তুলে দিয়ে গেছে, সেই ঢেউ আমার মনে এখন ঝড়ের তান্ডব শুরু করে। অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বাংলোয় পৌঁছে দেখি মেজর সাহেব আমাদের বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আর রতি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছে। ওরা হয়তো আমাকে নিয়েই কিছু বলছিলো, কেননা আমি ঢুকতেই ওরা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। শুধু টমি ছুটে এসে আমার পা শুঁকতে শুঁকতে কুঁই কুঁই শব্দ করে লেজ নাড়তে থাকে। রতি একবার

গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় তারপর আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেজর সাহেব একবার উঠে বসে আবারও কী ভেবে শুয়ে পড়ে। আগে কখনো ওকে আমাদের বিছানায় শুতে দেখিনি। মনে একটা অদ্ভুত শঙ্কা জাগে। ধ্যাৎ, কী সব ভাবছি! বাবা ও মেয়ের সম্পর্কে এরকম ভাবাও ঘোর অন্যায়! নিজের উপর গ্লানি হয়। নিজেকে হাল্কা করার জন্যে বলি, বুঝলে আজ নসীবো এসেছিল, আমি গ্রামে যাব ঠিক করেছি!

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, এ কথায় কারো কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তবু যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বলি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজ রাতেই যাব। তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে এখানে আমার থাকা না থাকা নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যথা নেই। এহেন পরিস্থিতিতে এখানে থেকেই কী লাভ? আমার অবশ্যই গ্রামে ফেরা উচিত। স্ত্রী কন্যা পরিবারের নির্ভরতা ও আপনত্ব আমাকে সেখানে নিজের মতন বাঁচিয়ে রাখবে। এ মুহূর্তে আমার অহং তীক্ষ্ণ, শিরা ও ধমনীগুলি টানটান হয়ে ওঠে। আর সমঝোতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ভাবি কী কী সঙ্গে নিয়ে আমি গ্রামে যাব।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গ্রামের দারিদ্র্যের কথা ভেবে আমার বুক কেঁপে ওঠে। ঝড় থেমে যায়। ভেতরটা হাহাকারদীর্ণ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে থাকি। টমিটাও আমার পাশে এসে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে।

আমি হয়তো আর কোনদিন গ্রামে ফিরতে পারবো না। সেখানে গেলে আমি আর অফিসার থাকবো না; সবাই আমাকে জীতে কারিগরের ছেলে বলেই ডাকবে। এই শাহী ঠাটবাটের বদলে ওখানে মান্ধাতার আমলের গোবরগন্ধময় কাঁচা মাটির বাড়ি। না না, এত ভাবুক, এত অভিমানী হলে চলবে না, যে যা ভাবে ভাবুক। কারো খাই না পরি? আবার রতি আর মেজর সাহেবের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে হবে। এখানে হাজার লড়াই ঝগড়া রয়েছে, কিন্তু এগুলি কি গ্রামে নেই? তার উপর দারিদ্র্য আমার টুঁটি টিপে ধরবে।

আমি এগিয়ে গিয়ে বিছানায় মেজর সাহেবের পাশে বসে নিজের জুতোর ফিতে খুলতে থাকি। টমি লেজ নাড়তে নাড়তে গিয়ে এখন রতির পা চাটছে। আমি আর একবার ওর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি।

•

রচনাকাল: ১৯৮৩

তেজিন্দর গুজরাল

ক্ষিদে

গলিতে ভিখারীর চিৎকার শুনে কান খাড়া করি। ভিখারী আমাদের পাশের বাড়ির মহিলার কাছে কাকুতি মিনতি করে খাবার চাইছে, . "বিহার থেকে এসেছি.. বন্যায় সব ভেসে গেছে গো... তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি মা!"

ওদের উঠোনে চেনে বাঁধা চিতার মতন বড় এলসেশিয়ান কুকুরটা চিৎকার করতে থাকে। ভিখারীর কথায় প্রতিবেশীনীর মন গলে না। ওকে পথ দেখতে বলে। তবু সে ওখানে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করতে থাকলে প্রতিবেশীনী রেগেমেগে বলে, যাবি এখান থেকে, না কুকুরটাকে ছাড়বো?

কুকুর ছাড়ার হুমকি শুনে ভিখারী ভয় পেয়ে চেঁচানো বন্ধ করে। কিন্তু কুকুরটা সমানে ভয়ঙ্কর আওয়াজে ডাকতে থাকে।

ভিখারীর চিৎকার বন্ধ হওয়ার পর আবার হাতে ধরা বই এর পাতায় নজর দিই। অজিত কৌর এর লেখা গল্পসংগ্রহ "ফালতু আওরৎ' এর যে গল্পটি পড়ছি তাতে লেখিকা উচ্চবর্গের ধনী মহিলাদের শারীরিক ক্ষিদের তাড়না ও স্বেচ্ছাচারিতার সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। আমি ভাবি, শুধু উচ্চবর্গের মহিলারা কেন, মানবিক মূল্যবোধই আজ সংকটাপন্ন। কেউ শরীরের ক্ষিদেয় অতৃপ্ত, কেউ পেটের ক্ষিদেয় ভিক্ষারত আবার কারো যশের ক্ষিদের উচাটন।

"মাগো... কিছু খেতে দাও!" ভিখারীর আকুতি এবার আমাদের দরজায় শুনে উঠে গিয়ে দেখি একটা তের-চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে, উস্কখুস্ক চুল, হাতে মুখে পুরু ময়লার আস্তরণ। দেখে আমার দয়া হয়। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা বাসী রুটি এনে ওর হাতে দিই। সঙ্গে দেওয়ার মতন কোন তরকারী পেলাম না। ছেলেটি আমাদের চৌকাঠে বসে ঐ শুকনো রুটিই চিবাতে শুরু করে।

ওকে এভাবে গোগ্রাসে খেতে দেখে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে। সেদিনও আমি এমনি একটা বই পড়ছিলাম,দরজার সামনে এক হকারের হাঁক শুনতে পেয়ে এগিয়ে যাই। তখন মা বাজারে গেছে আর দিদি অফিসে। বাইরে বেরিয়ে দেখি লোকটা ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে রাখা টুকরিতে অসংখ্য মিহিদানার লাড্ডুর মতন. কিম্বা সাদা তুলোর বলের মতন ক্ষুদে ক্ষুদে মুর্গীর ছানা বিক্রী করছে! আমি জিজ্ঞেস করি, কত করে?

— একটা ছানা পঞ্চাশ পয়সা!

"দাঁড়াও, এখুনি আসছি।" আমি ছুটে গিয়ে আলমারী থেকে আড়াই টাকা বের করে এনে ওকে দিয়ে বলি, "পাঁচটা দাও।"

ঘরে এনে মেঝেতে ছাড়তেই ওগুলি-এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। চিঁ চিঁ শব্দ করে এমনভাবে ছুটছে যেন গাছ থেকে আলাদা হয়ে বীজ বুকে নিয়ে উড়ে এসে তুলোর পিন্ডগুলি উঠোন ও বারান্দার মেঝেতে ঘুরে বেড়ায়। আমি রান্নাঘরের কুলো থেকে এক প্লেট ভুসি এনে ওদেরকে খেতে দিই। ছানাগুলি এমনভাবে হামলে পড়ে যেন ওরা একে অন্যের সঙ্গে বাজী ধরেছে। এরকম খাওয়া দেখে হাসি পায়। একটা বাটিতে জল ভরে এনে ওদের কাছে রেখে এক পাশে বসে বসে ওদেরকে দেখতে থাকি।

মায়ের আসার সময় হয়ে এলে বকুনির ভয়ে একটা টুকরী নিয়ে ছানাগুলিকে ঢেকে রাখি। বিড়ালের ভয়ে টুকরীর ওপর দু'টো ইঁট চাপা দিয়ে রাখি। একটু পরেই মা আসে। একথা ওকথার পর আমি মায়ের মুড দেখে মুর্গীছানা কেনার কথা বলি। তারপর মাকে নিয়ে গিয়ে ইঁট সরিয়ে টুকরী উঠিয়ে দেখি সবক'টা মুর্গীছানা মরে গেছে! আমি হতবাক হয়ে পড়ি, এরা কেমন করে মরলো? আমার কান্না পেয়ে যায়। মৃত ছানাগুলিকে তুলে নিয়ে বাড়ির পেছনে গর্তে ফেলতে গিয়ে মনে হয় আমার মরে যাওয়া খুশীর লাশগুলি ফেলছি!

তারপর সারাদিন মন খারাপ থাকে। রাতে খাবার টেবিলে বসেও কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। ওকি উঠে। মা আমার মাথা নেড়ে বলে, "পাগলী কোথাকার, ঐ সাইকেলওয়ালা হকারের কাছে মুর্গীছানাগুলি না জানি কবে থেকে অভুক্ত, তুই হঠাৎ এত বেশী খেতে দিয়েছিস যে ওরা বেশী খেয়ে আইঢাই করে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে !"

এখন মায়ের কথা মনে পড়তেই আমি ভিখারীর দিকে তাকাই। ও একটা রুটি শেষ না হতেই আরেকটা গোগ্রাসে মুখে ঢোকাচ্ছে আর ভালমন্দ না চিবিয়েই গলাধঃকরণ করছে। ওর দিকে তাকিয়ে আবার মুর্গীছানাগুলির কথা মনে পড়ে। ভিখারীটাকে মুর্গীছানা বলে মনে হয়। আবার ভিখারী, আবার মুর্গীছানা, আবার ভিখারী..... আবার মুর্গীছানা,... আবার ! একবার চোখে অন্ধকার দেখি, তারপরই হঠাৎ আলো পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে ওর হাত থেকে বাকী রুটি ক'টা ছিনিয়ে নিয়ে বলি, যা, পালা এখান থেকে। যা ভাগ!

ছেলেটা ওখানেই দাঁড়িয়ে আমার হাতের রুটিগুলির দিকে এমনভাবে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে যেন এক্ষুণি ছুটে এসে ও আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে।

রচনাকাল : ১৯৯৮

কুলদীপ সিংহ বেদী

সুব্রহ্মণিয়মও বলে উঠলো

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

রোজকার মতন সেদিনও আমি মুম্বই-এর লোকাল ট্রেনে যাচ্ছিলাম। বছরে দু-একবার এমনকি আমাকে কোন বছর তিনবারও মুম্বই-এর চক্কর লাগাতে হয়। কিন্তু সেদিনের কথা ভোলা যায় না। মুম্বই-এর উপনগর ভায়ন্ডরে আমার বন্ধু শবাব অলাবলপুরী থাকে — জলন্ধর জেলার অলাবলপুর গ্রামের সোটী সর্দারের ছেলে। বহু বছর ধরে ও মুম্বই-এ থাকে। মাথায় একটাও চুল নেই। ফিল্মের গান লেখে। এছাড়া রয়েছে সর্বদীপ ঢিল্লোঁ, তরণতারণ পার্শ্ববর্তী পট্টির বাসিন্দা—ওর মাথায়ও চুল নেই। আগে ও পট্টি ও অমৃতসরে থিয়েটার করে বেড়াত। তারপর কিছুদিন জলন্ধর দূরদর্শনে নাটক করতে করতে একদিন মুম্বই পৌঁছে যায়। যেখানে ওর মতন অনেক নবযুবক সিনেমার কাজ পাওয়ার জন্যে কঠিন লড়াই করছে।

সেদিন আমি আর দীপ (সর্বদীপের ডাকনাম) উভয়ের বন্ধু শবাব অলাবলপুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। ভায়ন্ডর তখনই বেশ জমজমাট এলাকা ।শবাবের ফ্ল্যাট বড় রাস্তার পাশে। আমাদেরকে পেয়ে ও দারুণ খুশী। গল্পে গল্পে সেদিন রাতের খাবার অনেক বেশী খেয়ে নিয়েছি। কখন যে রাত এগারোটা বেজে গেছে টের পাইনি। টের পেতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। শবাব তো কোনমতেই যেতে দেবে না। কিন্তু সকালেই কাজ রয়েছে বলে উঠে পড়তে হয়। অগত্যা ও স্টেশানে এসে আমাদেরকে ট্রেনে উঠিয়ে ফেরে।

ভায়ন্ডর থেকে আন্ধেরীগামী লোকাল ট্রেনে বসে একটু পরেই আমরা ঢুলতে থাকি। ট্রেন ছুটতে থাকে। একটু পরেই কাঁধের উপর এক ভারী হাতের চাপে আমি চমকে তাকাই। এক শক্তসমর্থ যুবক আমাকে বলে, — সর্দারজী, এদিকে এসো।

আমি মুহূর্তের জন্যে বোকা বনে যাই। ওর কথামতন ওর পেছন পেছন উঠে যাই। একটা খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ও আমাকে দাঁড়াতে বলে। ওরা মোট তিনজন। ওদের মধ্যে একজন এবার আমার হাত ধরে বলে, — তোমরা হিন্দুদেরকে বাস থেকে নামিয়ে মারো — তাই না?

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে। দীপ এখনো নিজের সীটে বসে ঢুলছে। পুরো কামরায় পাগড়িপরা কেউ নেই। দীপকে কী করে ডাকা যায়? আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

— কী হলো বলছো না যে? তোমরা পাঞ্জাবে হিন্দু ভাইদের মারো, আমরা তোমাকে এই চলন্ত গাড়ি থেকে নিচে.......!

আমি কী বলবো? ওদের প্রশ্নের কী জবাব দেব ? প্রাণভিক্ষা চাইবো? আমি আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করি, দেখুন, এরকম কোন ব্যাপার নয়; ওখানে হিন্দু-শিখ সবাই ভাইয়ের মতন.....!

— আমরা কোন কথা শুনবো না, ওখানে যারা হিন্দুদেরকে মারছে ওরা তো শিখই না?

আমি চুপ। জিহ্বা ভারী। কে যেন আমার ঠোঁট দুটো সেলাই করে রেখেছে। এত লেখাপড়া করেও ওদের প্রশ্নের জবাব কেন দিতে পারছি না? কী বলে ওদেরকে বোঝানো যাবে? ট্রেন দ্রুত ছুটছে। ওদের চোটপাট শুনে আরো কয়েকজন সহযাত্রী এসে ওখানে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্য থেকেই দীপ উঁচু আওয়াজে বলে, দেখুন দাদা, কিছু বাজে লোক পাঞ্জাবে এরকম করছে, হিন্দু-শিখ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ ওদেরকে পছন্দ করে না। কিন্তু ওদের হাতে অস্ত্র রয়েছে বলে ভয় পায়। দীপের কথা শুনে সহযাত্রীদের মধ্য থেকে আরো দু'একজন বলতে শুরু করে। ওদের হিন্দি শুনে বোঝা যায় যে ওদের মধ্যে কয়েকজন ক্লীনশেভ করা পাঞ্জাবী রয়েছে। এতজনের সাড়া পেয়ে ঐ তিনজন শান্ত হয়ে পড়ে। ওরা আর কিছু বলে না। দেখতে দেখতে আম্বেরী স্টেশান এসে গেলে আমরা নেমে পড়ি। কিন্তু বুকের ধুকপুকানি তখনও থামেনি। এতক্ষণে বুঝতে পারি আজকাল দীপ কেন পাঞ্জাব যেতে চায় না। আর গেলেও কেন একদমই বাসে চড়তে চায় না। কিন্তু এখনো আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোয় না। কিছুই ভেবে উঠতে পারি না।

পরদিন আমার প্রিয় মুম্বইয়া বন্ধু জগদীশ মালীকে ফোন করি। ও ফিল্মী দুনিয়ার সুপরিচিত স্টীল ফটোগ্রাফার। ভীষণ মেজাজী। ইচ্ছে হলে কাজ করে, নাহলে করে না। ওর স্টুডিওর সামনে ফিল্মে ঢোকার ইচ্ছে নিয়ে যুবক-যুবতীরা ফোটো সেশান করাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ও কখনো মাসাধিককাল কোন কাজ করে না, আবার কখনো রাতদিন লাগাতর কাজ করতে থাকে কয়েক সপ্তাহ। খাওয়া-ঘুম ছাড়া পুরো সময়টাই তখন স্টুডিওতে কাজ করে। ফোনে আমার মুম্বই আসার খবর পেয়ে ও দারুণ খুশী। আমাকে বান্দ্রার এম. আই. জি ক্লাবে আসতে বলে। ঐ ক্লাবেই আমি আর জগ্গী (জগদীশকে আমি এই নামেই ডাকি) প্রত্যেকবার আড্ডা মারি। জগ্গী ক্রিকেটও খেলে। এমনিতেও ঐ ক্লাবে গিয়ে খোঁজ নিলে জগ্গীর খবর পাওয়া যায়।

সন্ধ্যের সময় ঐ ক্লাবের পরিবেশই অন্যরকম থাকে। সবুজ ঘাসের লনে সারি সারি ছোট ছোট সবুজ আলো জ্বলে। গোল গোল টেবিলগুলির চারপাশে জোড়ায় জোড়ায় কপোত কপোতীর ভিড়। হাসিখুশী পরীদের মিষ্টি কথা। জগ্গীর বন্ধুরাও সব দারুণ। ওদের কয়েকজনকে আমি ভালমতন চিনি। এদের মধ্যে অনন্ত এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসার, সর্দার কে. এস. নন্দা এয়ার ইণ্ডিয়ারই পাইলট। জগ্গীর টেবিলে ওদের পাশে বসে আছে এক অচেনা সুবেশা তরুণী।

আমাকে দেখেই জগ্গী উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে। আরেকটা চেয়ার আনায়। অনন্ত এবং নন্দাও আমার সঙ্গে হাত মেলায়। কিন্তু ওদের উত্তাপহীন করমর্দন আমাকে অবাক করে। আগে দেখা হলে অনন্ত শুধু পাঞ্জাবের গল্প শুনতে চাইতো। একবার আমার সঙ্গে পাঞ্জাব ঘোরার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছে। আজ ওর কী হলো? এমনকি ছয়ফুট লম্বা সর্দার নন্দাও আমার চোখে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। ওদের সামনে রাখা বীয়ার গরম হয়ে গেছে বলে ওরা বরফ আনায়। জগ্গী পাশে বসা রূপসীর সঙ্গে আমার পরিচয় করায়, এ হলো নীলু, শী ইজ ফ্রেণ্ড অফ অনন্ত! এয়ার হোস্টেস! আর ইনি হলেন মিস্টার রেড্ডী — অনন্তেরই বন্ধু! আমি রেড্ডীর সঙ্গে হাত মেলাই। ওর হাতেও উত্তাপ নেই। আমার ভীষণ অবাক লাগে। মানুষগুলির হলো কি? সবাই চুপচাপ। জগ্গী আর আমি ছাড়া সবার ঠোঁট যেন সেলাই করা। একটু পরেই অনন্ত উঠে পড়ে বলে, যাই আমি নীলুকে ঘরে

পৌঁছে দিই! ও আমার দিকে আরেকবার ঢিলে হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। জগ্গী, নন্দা আমি আর রেড্ডী ক্লাবের ভোজন কক্ষে গিয়ে ঢুকি। সেখানে গিয়ে বসার আগে নন্দা আমার কোমরে হাত দিয়ে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, পাঞ্জাবের শিখরা তো আমাদের পোজিশান বড়ই খারাপ করে দিয়েছে। কেউ আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। যারা ওখানে ওরকম করছে, কেন বোঝে না যে পাঞ্জাবের বাইরেও অনেক শিখ থাকে, ওদের কৃতকর্মের ফল আমাদের ভুগতে হয়!

নন্দার প্রশ্নের কোন জবাব আমার কাছে নেই। আমি পাঞ্জাবের আতঙ্কবাদীদেরও কিছু বলতে পারবো না, মুম্বই-এর কে এস নন্দাকেও কিছু বোঝাতে পারবো না। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটা অব্যক্ত কষ্টের অনুভূতি হয়ে সমস্ত অস্তিত্বে ছেয়ে থাকে।

মার্চ ১৯৮৭

এই তিন-চার বছরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে — ব্লু স্টার অপারেশান, ইন্দিরা হত্যা, দিল্লী তথা দেশের অনেক জায়গায় শিখদের কচুকাটা করা হয়েছে। মুম্বই-এ অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। সবাই বলে এখানে শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের কৃপায় শিখরা বেঁচে গেছে। মুম্বই-এর এম. আই. জি. ক্লাবে এবার পৌঁছে জগ্গীকে পাই না। কিন্তু অনন্ত দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকে। ও নীলুর সঙ্গে বসে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভাবি, ওর কাছে যাওয়া কী ঠিক হবে? কিন্তু ততক্ষণে অনন্ত উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। নিজের টেবিলের কাছে গিয়ে বলে, নীলু, আমার বন্ধু জলন্ধর থেকে এসেছে! মাঝেমধ্যেই মুম্বই আসে।

আমি বলি, গতবারই এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

নীলুর চোখ চকচক করে ওঠে, — আমার বাড়িও জলন্ধর!

— আচ্ছা? তাহলে আপনি পাঞ্জাবী বলেন না?

— হ্যাঁ! আপনার সঙ্গে পাঞ্জাবীই বলবো!

তখনই জগ্গী আর নন্দা এসে ঢোকে। দু'জনেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এবার সাড়ে তিন বছর পর দেখা হলো যে! জগ্গী বীয়ারের অর্ডার দেয়। আমি আর নীলু পাঞ্জাবীতে গল্প করি। অন্যদের গল্পের বিষয়ও এবার পাঞ্জাব। নন্দা বলে, -- ওরা তো এখন শিখদেরকেও মেরে ফেলছে!

অনন্ত বলে, — সবাইকে এত নৃশংসভাবে কারা মারছে? বাচ্চাদের মারছে, বুড়োদের মারছে, এমনকি নিজেদের নেতাদেরকেও মারছে। ওরা কেউ কারো নয়। ওরা পশু, শত্রুদের কেনা গোলাম। আতঙ্ক ছড়ানোই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য!

জগ্গী জিজ্ঞেস করে, পুলিশের ভূমিকা কি? আমরা কাগজে পড়ি যে পুলিশও ওখানে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে! আমি বলি, সত্যি কথা। পুলিশ আর সন্ত্রাসবাদী উভয়ই সাধারণ মানুষের ভয়ের কারণ। সরকারকেও ধোয়া তুলসীপাতা বলা যায় না।

অনন্ত বলে, --- সরকার হয়তো ওখানে শান্তি চায় না। তাহলে মন্ত্রীদের আখের গোছানো হবে না যে।

এমনি পাঞ্জাব-পাঞ্জাবী-পাঞ্জাবের সাহসী মানুষজন, সন্ত্রাসবাদ আর সরকারের ভূমিকা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। পরিবেশকে হাল্কা করার জন্যে নীলু একটা গজল শোনায়। আমরা যখন রাতের খাবার খেয়ে উঠি তখন রাত দেড়টা। জগ্গী আমাকে হোটেলে ছাড়তে আসে। বিছানায় শুতেই আমার শরীর অবশ করে ঘুম চলে আসে। অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

জুন ১৯৮৯

বাচ্চাদের গ্রীষ্মের ছুটির ভিড় থাকায় এবার জলন্ধর থেকে মুম্বই-এর রিজার্ভেশানই পাইনি। আমার রিজার্ভেশান দিল্লী থেকে হয়েছে। দিল্লীর প্ল্যাটফর্মে অন্য সহযাত্রীদের পাশে বসে ট্রেনের

প্রতীক্ষা করছি তখন পুলিশের এক সিপাহী এসে আমার অ্যাটাচি কেসে ডান্ডা মেরে বলে, — এটা আপনার? আমি পকেট থেকে নিজের পরিচয়পত্র বের করে ওকে দেখাই। ও 'সাংবাদিক' শব্দটি পড়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। তারপরও আমি ওকে দেখতে থাকি। এত বড় প্ল্যাটফর্মে ও আর কারো অ্যাটাচি কেস দেখতে চায় না। কিন্তু আমি নিশ্চিত আজ আমার কাছে এই পরিচয়পত্র না থাকলে বা আমার জায়গায় অন্য কোন পাগড়িওয়ালা হলে তাকে সিপাহীটি অ্যাটাচি খুলিয়ে ছাড়তো।

ট্রেন এলে নিজের বার্থ খুঁজে নিয়ে বসে পড়ি। আমার কূপেই এক সুব্রহ্মণিয়ম পরিবারের চারটে বার্থ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আর দুই বাচ্চা। ওরা গ্রীষ্মের ছুটিতে দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, জম্মু ও কাশ্মীর ঘুরে ফিরছে। ভদ্রলোক বেশ আলাপী। মহারাষ্ট্রের করাড় শহরের এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ান। ওর স্ত্রীও বেশ সুন্দর হিন্দীতে কথা বলেন। বাচ্চা দু'টিও খুব মিষ্টি। কিন্তু ওরা সবাই ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত। তবুও আমাকে খবরের কাগজের লোক জেনে সুব্রহ্মণিয়ম অনেক গল্প করেন।

— আমরা জম্মু ও কাশ্মীর ঘুরে ফেরার পথে পাঠানকোট ও জলন্ধর ঘুরে এসেছি। ওখানে এমন কিছু দেখিনি যা আমরা খবরের কাগজে পড়ি আর ভাবি!

— আপনার কথা ঠিক। আমাদের কাগজগুলি আর সরকার পাঞ্জাবের ছবি সমস্ত ভারতবর্ষের সামনে ধোঁয়াশাময় করে রেখেছে!

— ঠিক! আমরা তো ভালই ঘুরেছি! পাঞ্জাবের শিল্প নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে, হিন্দুদের জীবনে নাকি নিরাপত্তা নেই। আমরা কিন্তু সেরকম কিছু দেখিনি। ওখানে হিন্দু-শিখকে তো বেশ মিলেমিশে থাকতে দেখলাম!

ওর কথায় মুম্বইবাসী পাঞ্জাবীদের কথা মনে পড়ে। ওরাও এই ধ্বংসের ব্যাপারে জানতে চাইছিলো। আমি জবাব দিই, — কিসের ধ্বংস? কতিপয় ধর্মোন্মাদ নৃশংস মানুষের পাশবিকতা মানবসত্তাকে বারবার কলুষিত করতে পারে ঠিকই কিন্তু মানবতাকে ধ্বংস করতে পারে না। পাঞ্জাবের কৃষকরা আজও ভরপুর ফসল ফলাচ্ছে। শুধু এই সরকারী ও আতঙ্কবাদীদের দুই তরফা সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারলেই পাঞ্জাব শান্ত হয়ে পড়বে।

•

গাড়ি গুজরাট সীমান্তে ঢুকতে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী কামরায় ঢোকে। দুই একবার আমার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করে। একসময় ওরা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। — এই ব্রিফকেস? আপনার কোন্‌টা?

ওদেরকে ঘুরঘুর করতে দেখেই আন্দাজ করেছিলাম যে এমনটি হবে। আমি নিজের মাল দেখাতেই একজন সিপাহী আমাকে অ্যাটাচি কেস খুলতে বলে। আমি আগের মতই নিজের পরিচয়পত্র বের করে দেখাই। সিপাহীটি প্রায় দুই মিনিট ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। তারপর নির্বিকার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, — আপনি অ্যাটাচিটা খুলুন না!

সুব্রহ্মণিয়ম এতক্ষণ উপরের বার্থে বসে বসে দেখছিল। ও এবার লাফ দিয়ে নীচে নেমে বলে, — কেবল ওর অ্যাটাচিই কেন খোলাচ্ছেন? আমারটা খোলাচ্ছেন না কেন? এতক্ষণ কামরার আর কারো খোলাননি কেন?

সিপাহী বলে, — আমাদের ইচ্ছে!

এ কথায় সুব্রহ্মণিয়ম আরো রেগে উঠে বলে, — কেন? আমাদের মাথায় পাগড়ি নেই বলে? আগে আমাদের সবার অ্যাটাচি কেস খোলান, তারপর ওর খোলাবেন। করুন আপনাদের ডিউটি। আমি সুব্রহ্মণিয়মের হাত ধরে শান্ত করতে চাই। কিন্তু ওর বড় বড় চোখ আর প্রখর ব্যক্তিত্ব বন্দুকধারীদের ঘাবড়ে দেয়। ওরা চারজন মুখ গোমড়া করে চুপচাপ ওখান থেকে চলে যায়। আমি

সুব্রহ্মণিয়মকে আমার কাছে বসাই। ও রাগে গজগজ করতে থাকে। আমি ভাবি, ওর ভেতরের মানুষটা অনেক বছর এই অন্যায় সহ্য করেছে কিন্তু আজ সুযোগ মতন একেবারে আগ্নেয়গিরির মতন ফেটে আমাদের বন্ধুত্বকে শাশ্বত করে দেয়।

মুম্বই পৌঁছোনো অব্দি আমরা একই পরিবারের মানুষের মতন গল্পগুজব ও খাওয়া-দাওয়া করি। ওদের আগেই আমি বোরীবলী স্টেশানে নামি। নামার আগে সুব্রহ্মণিয়মকে বুকে জড়িয়ে ধরে একদমই ছাড়তে ইচ্ছে করে না। তার আগেই আমরা একে অন্যের ঠিকানা লিখে নিয়েছি। ট্রেন ছেড়ে দিলে জানালা দিয়ে সুব্রহ্মণিয়ম পরিবারের সবাই হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানায়। ওদের ছলছলে চোখ দেখে আমার দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে। ওরা শারীরিকভাবে অবশ্য আমার থেকে দূরে চলে গেছে কিন্তু নৈকট্যের যে অনুভূতি আমার হৃদয়ে দিয়ে গেছে তা আমি আমৃত্যু মনে রাখবো।

রচনাকাল : জুলাই ১৯৮৯

গীতা ডোগরা

মিট্ঠু

মিট্ঠু কেমন জ্বলজ্বল করে তাকায়, একদম কাঁদে না। নিজের মা আর বাবাকে সে চেনে না। 'মা' কিম্বা 'বাবা' কাকে বলে তা-ই জানে না। এমনি ঘরের সবাইকে চেনে। সবাই ওকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়.... পিসী, কাকা,ঠাকুমা, কখনো কখনো কাকীমা। সবাই ওকে খুব ভালবাসে।

ওর কাকীমা এবাড়ির নতুন বউ। মিট্ঠু ওকে দূর থেকে দেখে, এখনো কথা বলা শেখেনি। মিট্ঠুর মা মাসে তিন-চারবার এক-দেড় দিনের জন্যে বাড়ি আসে, সে তো কথা বলতে পারে, তবু সে নতুন বউকে দূর থেকেই দেখে। এই বাড়ির এটাই পরম্পরা। ছোট জা আর বড় জায়ে বেশী কথা হলে, বন্ধুত্ব হলে নাকি পরিবারে বিপত্তি আসতে পারে। বড় জা তো অনেক আগেই এই পরিবারে এসেছে, সংসারের ভাল-মন্দ কি সে-ও বুঝতে সক্ষম নয়? এ বাড়িতে বড় বউই দ্বিতীয় মহিলা। সেই অধিকার নিয়ে কথা বলতে গিয়েই ও প্রথম ঠোকর খায়। বড় হওয়া মানেই সবসময় কিছু না কিছু দেওয়ার জন্যে তোমার হাত খোলা থাকতে হবে, মানসম্মান, ভালবাসা ও অর্থ সব তুমি দেবে, কিন্তু কিছু নেওয়ার কথা ভাবলেই মুস্কিল। বড় বউ কেবল মানসম্মানের কাঙাল বলে সবার সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ওর নিজস্ব অধিকারের লড়াই 'ক্লেশ'-এ পরিণত হয়, ও কাচের মতন টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

ওর বইগুলি, যেসব বই পড়ে ছোটবেলা থেকে ও সহজ সরল সম্পর্কের গভীরতাকে অনুভব করেছিল, নিজস্ব আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই-এ সেগুলিও কোন কাজে আসেনি, উল্টো সেগুলির প্রভাব ওকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে।

সত্যিকারের জীবন কোন বই নয় — এক বাস্তবমাত্র। যদি একে বই মানো তাহলে এতে তোমার পছন্দমতন একটা কথাও লেখা থাকবে না। সে বই কখনো পড়া যাবে না, জীবন আবার একটা লেখাপড়ার বিষয় হতে পারে নাকি? একে তো ঘষটে নিয়ে যেতে হয়, আর পোশাক পাল্টানোর মতন বারবার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার জলাঞ্জলি দিতে হয়।

হ্যাঁ, মিট্ঠুর কথা হচ্ছিলো, যে রাতে ওর জন্ম হয় সে রাতেই ওর বাবার মুখ ভার, মেয়ে হলো! কখনো কল্পনাও করিনি।

মিট্ঠুর মা ভেবেছিল হয়তো মেয়েকে দেখে ও খুশী হবে,......... মাথার কাছে এসে খুশী খুশী চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছো ?

কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু হলো না। ও চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লো, মিট্ঠুর দিদিমা সেসময় কাছে থাকায় তিনিই মিট্ঠু আর তার মায়ের সেবাযত্ন করেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় মিট্ঠুর ঠাকুমা হয়তো মিট্ঠুকেই দেখতে আসেন। ওর চোয়াল শক্ত। মিট্ঠুর বাবা ওকে খবর দিতে গেলে তিনি বলেছিলেন "মেয়ের জন্যে তো মা-বাবার মাথা সবসময় ঝুঁকেই থাকে!"

এখন শাশুড়িকে কাছে পেয়ে মিট্ঠুর মা ওকে একথার মানে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, ঠিকই তো বলেছি, আমাদের মাথা তো ঝুঁকেই গেল!

একথা শুনে মিট্ঠুর দিদিমা আর থাকতে না পেরে বলেন, কেন? আমাদের ঘরে তো বেশ কয়েকটা মেয়ে, ওদেরকে ছেলেদের মতনই লেখাপড়া করিয়েছি, মাথা ঝুঁকবে কেন?

এই একটি বাক্য সংসারে আগুন লাগিয়ে দেয়। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এসে মেয়ে ও নাতনীর তরফদারী করা? সাহস তো কম নয়। এর ফল মিট্ঠুর মাকে ভুগতে হয়। এই রোষ দীর্ঘদিন ওর মাথার উপর ফণা তুলে থাকে, দীর্ঘদিন মিট্ঠুর ঠাকুমা ও মিট্ঠুর বাবা কথায় কথায় ওকে এই নিয়ে কথা শোনাতে থাকে। অথচ মিট্ঠুর মা ঈশ্বরের কাছে কন্যাসন্তানেরই প্রার্থনা করেছিল। ওর মতে মেয়েরাই বড় হয়ে মা বাবার দুঃখ বেশী বোঝে। শাশুড়ী-ননদ-দেওর ও স্বামীর তিরস্কারপূর্ণ পরিবেশে সমব্যথী কাউকে কাছে পাওয়ার আকুতি থেকেই এই ইচ্ছা ওর মনে আকাঙ্ক্ষার রূপ নেয়। মেয়ের জন্মের পর আকাঙ্ক্ষার এই সুন্দর ফুটফুটে মূর্ত রূপটিই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাড়ির সবাই নানা অজুহাতে ওকে চোর, বদমাশ কিম্বা চরিত্রহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করে, আর মিট্ঠুর বাবা তা চুপচাপ শুনতে থাকে! এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি একজন দারুণ শ্রোতা। বাড়ির কারো উপর ওর মনে কোনই ক্ষোভ নেই, তিনি অন্তরে এক সমুদ্র বহন করেন, আর তাতেই সমস্ত কথাকে ডুবিয়ে দেন। ওর কাছে পত্নীর আত্মসম্মানের প্রসঙ্গ সম্ভবত পত্নী অব্দিই সীমিত।

ও সহ্য করে। ও ঘরে সবার বড় তাই সহ্য করা উচিত বলে মনে করে। তাছাড়া যেসব সমালোচনা ওর স্ত্রী কিম্বা ওর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে হয়, এরকম তো সমস্ত পরিবারের সব ননদ শাশুড়ীরাই বলে থাকে। ওদের কাছে অন্যায় ঠেকলে বলবে না? বড় বউ এর উচিত সেগুলি হজম করা। কিন্তু মিট্ঠুর মা এত সরল যে সবকিছুর প্রতিবাদ করে ফেলে। মাথা গরম করলে কি আর সংসার করা যায়! কিছু কিছু কথা পছন্দ না হলেও চুপচাপ হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। এত বড় পরিবার, কাকে কাকে তুমি পরিবর্তন করে ফেলবে? কেমন করে করবে? এজন্যে পারস্পরিক সম্পর্কের হৃদ্যতা, উষ্ণতা, কর্তব্য, বোঝাপড়া ও সমর্পণের মনোভাব না থাকলে মানিয়ে চলা ভীষণ মুস্কিল! সেজন্যেই তিনি সব জেনেও চুপ থাকেন। ওর স্ত্রীর মনোভাব ওর কাছে শিশুসুলভ ও অপরিপক্ক বলে বলে মনে হয়। ও প্রায়ই সম্পর্কের সবলতার কথা বলে, অথচ · সব কোন সম্পর্কই সরল হয় না, স্বার্থ নিহিত থাকে, আড়ালে বা প্রকাশ্যে সেই স্বার্থই সমস্ত সম্পর্ককে ধারণ করে।

বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য তো মিট্ঠুর বাবার কাঁধেই। সবার সমস্ত চাহিদাও মেটাতে পারে না। তবুও কখনো কখনো নিজেকে বড় ভেবে, দায়িত্বের মুখোশ পরে ও সবাইকে স্বপ্ন দেখায়। নিজে সরকারী চাকুরে.... সীমিত আয়ে স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন করে সবার স্বপ্নের আকাশ থেকে তারা পেরে আনা বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন সবাই ওর জন্যে মিট্ঠুর মাকেই দায়ী ভাবে। এসব মিট্ঠুর বাবা বোঝেন না। তিনি সবার চোখে দেবতা হয়ে থাকতে চান। আর ঐ দেবতার ভূত মিট্ঠুর মায়ের মাথায় ঘৃণার বোঝা চাপাতে থাকে। মিট্ঠুর জন্মের পর তো সেই বোঝা আরো ভারী হয়ে পড়ে।

অবশ্য মিট্ঠুর দাদার জন্মের পরও এ বাড়িতে আনন্দের লহর বয়ে যায়নি। মিট্ঠুর ঠাম্মা তো পাঁচদিন পর নাতির মুখ দেখেছিল। ওদের পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী প্রসূতি অচ্ছুৎ, বিশেষ করে

সে যদি বাড়ির বড় বউ হয়। সোয়ামাস অব্দি ওকে ছুঁলেই স্নান করতে হয় আর ওর হাতের কোন কিছু খেতে হয় না। মিট্‌ঠুর মা বাথরুমে নিজের জল নিজেই রাখতো, স্নান করতো আর কাউকে না ছুঁয়ে আঁতুড় ঘরে চলে যেত। মিট্‌ঠুকে তো ওর কাকা কাকী আর পিসীরা জন্মের চল্লিশদিন পর দেখতে এসেছে!

তখন ও ভাবতো হয়তো ওর বাচ্চাগুলি এভাবেই লালিত হবে। কেউ ছুঁয়েও দেখবে না। নতুন কাকী অব্দি ছোঁবে না। অথচ ওকে মিট্‌ঠুর বাবা-মা-ই পছন্দ করে বউ করে এনেছে। পরবর্তী দায়িত্ব ননদের বিয়ে। সেজন্যে মাত্র দেড়মাসের মিট্‌ঠুকে ঠাকমার কাছে রেখে মিট্‌ঠুর মাকে এক দূরবর্তী শহরে চাকুরী করতে যেতে হয়। সেই থেকে সপ্তাহান্তে একদিন আসে ।আবার চলে যেতে হয়। গত চার-পাঁচ মাস ধরে এই হলো ওর জীবন।

তবে এখন মিট্‌ঠু সবার আদরের। ও ঠাম্মার ঘর চেনে, ... দেওয়ালগুলি চেনে, দরজা ও চৌকাঠ চেনে, পিসী-কাকা-কাকী-ঠাম্মা সব্বাইকে চেনে... সবাই ওকে আদর করে। কেননা ওর আগমনে এ বাড়ির অনেক অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। অনেক স্বপ্ন সাকার হচ্ছে.... ঘরদোর ক্রমশ ঝা চকচকে হয়ে উঠছে। মিট্‌ঠু সেখানে সবার চোখের মণি হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ও সবাইকে চেনে।

শুধু ও নিজের মাকেই চিনতে পারে না।

রচনাকাল ঃ ১৯৮৯

অমর গিরি

ঘা

এ দুঃখ আমি প্রায় ভুলেই গেছিলাম। সময় অনেক দুঃখকেই ভুলিয়ে দেয়। পুরনো দুঃখ ভুলে যাওয়াই ভাল। ভুলে যাওয়ার কথা এজন্যে বলছি যে আজ এ দুঃখ আবার তাড়া দিয়ে উঠেছে। সময়ের ধুলোর পরত জমে যা বিস্মৃত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল আজ হঠাৎ তা আবার জেগে উঠেছে। এমনি এমনি হঠাৎ করে জাগেনি। জাগানো হয়েছে। এমনটি কেন হলো? আজকের এই মুহূর্তও কি ঐ দুঃখেরই অংশবিশেষ? একদম চোখ বন্ধ করে বর্তমান, অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ি। কেমন করে সইবো, মুখোমুখি হবো, কেমন করে এ থেকে নিজেকে রক্ষা করবো? চোখ মেলতেই দেখি এই অবকাশে আমার একমাত্র ছেলে আমারই জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে।

আসলে সমস্ত ক্লেশের মূল এই ছেলেটাই। বাবা হিসেবে আমার কর্তব্য ওকে ভাল শিক্ষা দেওয়া, লেখাপড়া করানো আর সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার মতন যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা। কিন্তু ছেলেটার তিরিক্ষি মেজাজ দেখে মনে হয় আমার সব স্বপ্ন ব্যর্থ। আর ওর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দুঃখটিও যে আকারে বাড়ছিলো তা জানতাম না।

গত কুড়ি বছর ধরে এই শহরে, কিন্তু শহুরে জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারিনি। তবু যেদিন থেকে গ্রাম ছেড়েছি একবারও ও মুখো হইনি। গ্রামের কথা ভাবলেই লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়। গ্রামবাসীদের কোন প্রশ্নের সঠিক জবাব আমার কাছে নেই। কিন্তু গ্রামের সহজ সরল মানুষরা কেবল প্রশ্ন করতে জানে। ওরা কানে কানে কথা বলতেও জানে।

ছোটবেলায় ছেলে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো, বাবা, আমার সমস্ত বন্ধুর নিজের নিজের গ্রাম আছে, আমার গ্রাম নেই?

— নেই বাবা!

— আমার সব বন্ধু ছুটিতে নিজের গ্রামে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যায়। আমাদের কোন আত্মীয় নেই?

— না বাবা!

এখন ১৭-১৮ বছর বয়সে ও ভালমতন জানে, — আমাদেরও একটি গ্রাম আছে। ওর ঠাকুর্দা বেঁচে নেই, কিন্তু কাকা ও জ্যাঠা রয়েছে। ওদের ছেলেপিলে আছে। ও অনেকবার গ্রামে যাওয়ার

জন্যে জেদ ধরেছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি ওকে বাঁধা দিয়ে বলেছি, ভাই-এরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, ভাগের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে! আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার কথা শুনে ওর চোখ লাল। চেহারা দেখে ভয় করে। ও গাড়ির চাবি চায় আর শীঘ্রই রাইফেলের লাইসেন্স ওর নামে ট্রান্সফার করে দিতে বলে। ঘাবড়ে গিয়ে আমি ওর মায়ের দিকে তাকাই। ওর মা বলে, ও এখন বড় হয়েছে, নিজের ভাল-মন্দ নিজেই বুঝবে।

আমার মনে হয়, ও নিজেই মমতার বশবর্তী হয়ে ছেলের ভাল-মন্দ বুঝে উঠতে পারছে না। হাত পা লম্বা হলে কী হবে, ছেলে এখনো শিশু, আমি ওর শিশুসুলভ আব্দারকে প্রশ্রয় দিতে চাই না!

একদিন ওকে কাছে ডেকে বলি, বাবা, তুমি এখনো ছোট, পাগলামি করো না। গাড়ির চাবি কিম্বা রাইফেলের লাইসেন্স তোমাকে পরে দেব! গ্রাম এখন আগের মত নেই, তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমার কথা শুনে ওর চোয়াল শক্ত হয়। ও বলে, আমি ঠিক গ্রামে যাব, যারা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে তাদেরকে একবার অন্ততঃ দেখতে চাই। ওরা আমাদেরকে আমাদের সংস্কার ও শেকড় থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলি, আসলে অন্য কোন কারণে আমি গ্রামে যাওয়ার সাহস—

ও আমাকে শেষ করতে না দিয়েই বলে, না বাবা, তুমি বোঝ না কেন, আই ওয়ান্ট আ চেঞ্জ!

সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ও ধরতে পাবেনি। ওর জবাব শুনে আমিও আর কিছু বলতে পারিনি। কেন পারিনি? নিজেকেই এত অপরিচিত লাগে কেন? মনে হয় সময় অনেক এগিয়ে গেছে আর আমি অনেক ক্রোশ পেছনে। নিজেকে সময়ের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে অনেককিছু হারিয়ে ফেলেছি। তার চাইতেও বেশী, অনেক কিছু চোখের সামনে এক একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আমার আওয়াজকে সাঁড়াশির মতন চেপে ধরে। আমার প্রশ্নচিহ্নময় অতীত আমাকে বোবা করে রাখে।

এখন ভাবি, আজ কেন, আমার এই দুঃখ আগে কোনদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি। ছেলেকে বড় হতে দেখে, ওর ওঠা-বসা, কথাবলা, খাওয়া-দাওয়া, বাদ-বিবাদ, ওর ঘুম আর জেগে ওঠার প্রতিটি মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে দেখার মাধ্যমেই পুরনো ঘায়ের মতন লালিত হয়েছে। সন্তানের চোখে ভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ও এই দুঃখের সঙ্গে অবচেতনে জুড়ে থাকে। এমনিতে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সচেতনভাবেই ওকে মানা করতে চেয়েছি। কিন্তু ও বলে, বাবা, তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, তোমার চিন্তাভাবনাও তেমনি ঘুণধরা, তুমি হয়তো জান না যে বাঁধা পেলেই মানুষের আকর্ষণ বেশী বাড়ে, আমার মনে এই অদম্য আকর্ষণের জন্যে তুমিই দায়ী!

এহেন পরিবেশে, এরকম ঋতুতে কেউ বয়সের খোটা দিলে সেটা হজম করা এত সহজ নয়। ঘাড়ের ক্ষতস্থানে আশপাশে আঙুল নাড়লে আরাম লাগে কিন্তু ঘায়ে মধ্যে নখের আঁচড় লাগলে এক তীব্র যন্ত্রণা আমাকে অধীর করে তোলে আর এই যন্ত্রণা স্থায়ী হয়ে পড়ে। পরশু, গতকাল আর আজকের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হই। তবু অজান্তেই বারবার আমার হাত ঘাড়ে পৌঁছে যায়। আঙুলগুলি ঘাড়ে বোলাতে থাকি।

আমার বাবা ছিলেন গাড়োয়ান। বলদ আর গাড়ি ওর প্রাণের থেকেও প্রিয়। জীবন্ত বলদ আর নিষ্প্রাণ কাঠের গাড়ি ওর কাছে সমান আদরের। বলদগুলিকে খাওয়াতে স্নান করাতে তিনি যতটা সময় ব্যয় করতেন তার চাইতেও বেশী সময় ধরে তিনি গাড়িটার দেখভাল করতেন। এছাড়া আর কোন কিছুর জন্যে ওর সময় ছিল না। গতবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গাই-বলদ দেখার জন্যে

উঠে পড়তেন। তারপর গোয়ালে গিয়ে ওদের খুরলীতে পর্যাপ্ত ঘাস ও খড় রয়েছে কিনা হাত মেরে দেখে বলদগুলির পিঠ থপথপিয়ে ফিরতেন। দিনের বেলায় অবসর পেলেই ওদের পিঠে খরখরা বোলাতেন আবার কখনো ওদের লেজের চুলগুলি কাঁচি দিয়ে কেটে ফুলের আকার দিতেন।

গরমের সময় রোজ একবার ভাল করে স্নান করানো আর শীতে নকশাদার মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকতে কখনো ভুলতেন না। গাড়িটাকেও তেমনি সাত-আটদিন পর পর নিয়মিত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে চাকায় গ্রীস লাগাতেন। ওর বলদের সাজসজ্জা, কোন শিল্পীর কলাকৃতির মতন দৃষ্টিনন্দন হতো। কেউ ওর কাছে বলদ চাইতে এলে তিনি এমন জবাব দিতেন যে অনেক সময় সম্পর্কই নষ্ট হয়ে যেত। মানা করা যাবে না এমন কেউ চাইলে যত কষ্টই হোক উনি নিজে গাড়ি নিয়ে যেতেন, অন্যহাতে লাগাম ধরানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। আমার কাছে ওর এরকম ক্রিয়াকলাপ পাগলামী বলে মনে হতো। কতবার ভেবেছি হঠাৎ গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে যাই। বলদগুলিকে মহারাজার মতন চালাই আর ওদের গলায় ঝোলানো ঘন্টা ও ঘুঙুরের ছন্দে হারিয়ে যাই। বাবা আমাকে তখনো বাচ্চাই ভাবতো, অথবা গরুর গাড়ি চালানোর অযোগ্য ভাবতো, অথবা ভরসা ছিল না।

আসলে আমি অনেকবার স্বপ্নে গরুর গাড়ি চালিয়েছি। প্রত্যেকবারই বলদ দুটি ছুটতে ছুটতে গাড়িসহ আমাকে নিয়ে আকাশে উড়তে শুরু করে, সামনে কম আর পেছনে বেশী ছোটে। মনে হয় বাবাও পেছন পেছন উড়ে আসছেন। এই বুঝি আমাকে ধরে ফেলবেন। যেদিন দু'জনের মধ্যে দূরত্ব কমে যায় ঝট্ করে ঘুম ভেঙে যায়। আমি কখনোই ইপ্সিত ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। বাস্তবেও আমার ইচ্ছা কখনো সাকার হয় না। আমি অধীর অপেক্ষায় থাকি।

'গুগ্গের মেলা' (গুগ্গের মেলা - গুরু নানকের আবির্ভাবের আগে গুগ্গে নামক এক রাজস্থানী ফকির দক্ষিণ পাঞ্জাবে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা তাঁকে পীর বলতো। তাঁর মৃত্যুর পর দুই সম্প্রদায়ের শিষ্যরা অন্ত্যেষ্টি সৎকার নিয়ে বিবাদ শুরু করলে তাঁর মৃতদেহ একটি সাপে পরিণত হয় এবং শিষ্যদের চোখের সামনে দিয়ে একটা উই-এর ঢিবিতে ঢোকে। সেই থেকে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে গুগ্গের স্মরণে যেকোন বড় উই এর ঢিবি ঘিরে গ্রামে গ্রামে মেলা হয়। সেই থেকে পাঞ্জাবীরা সাপ মারে না। বাড়িতে সাপ দেখলে তাড়িয়ে দেয় বা লাঠি দিয়ে তুলে মাঠে ছেড়ে দেয়। গুগ্গের মেলায় কুস্তি, কবাডি, খো-খো, গরুর গাড়ির দৌড়, মোরগের লড়াই প্রধান আকর্ষণ।) এগিয়ে আসতে থাকলে বাবা বলদগুলির খাদ্য-খোরাক আরো বাড়িয়ে দিতেন। প্রতি বছরের মতন এবারও। তিনি বলদ গাড়ির দৌড়ে প্রথম হতে চান। অন্যান্য বছরের মতন এবারও সোনা জিতে আগামী মেলা অব্দি মানুষের মুখে মুখে চর্চার বিষয় হয়ে থাকতে চান বাবা গিরী গ্রামের গর্ব আর বলদ দুটি বাবার গর্ব।

একদিন বাবা সামান্য অসুস্থ ছিলেন। আমি দুপুর থেকেই খুশীটাকে অধীর অপেক্ষায় লালন করে বারবার গোয়ালে গিয়ে খুরলীতে রাখা ঘাসখড় হাতিয়ে দেখছিলাম। শুধু বাবাকে দেখানোর জন্যে যে বলদে আমার রুচি রয়েছে, আর ওদের দেখাশোনা যদি করতে পারি তাহলে চালানোরও অধিকার রাখি। আমার এই তীর সোজা নিশানায় লাগে। সেরাতেই আমি গাড়োয়ান হয়ে ভাড়া খাটানোর সুযোগ পাই। আমার আনন্দ তখন কে দেখে। নিজের ইচ্ছানুসারে গাড়ি ছোটাবো; ছোটবেলা থেকেই গরুর গাড়ির চাকার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ আমার দারুণ লাগে।

সেদিন রওয়ানা হওয়ার আগে বাবা আমাকে কাছে ডেকে বলেন, প্রথমতঃ, বলদ দুটিকে ওদের ইচ্ছেমতন হেলেদুলে চলতে দিস, দ্বিতীয়তঃ একবারও চাবুক মারিস না, তৃতীয়তঃ পথে আরামের সময় বলদ দুটিকে খাবার দিবি, সঙ্গে গুড় দিবি আর লক্ষ্য রাখবি গাড়ির চাকা যেন কখনো পুরনো লীগের বাইরে না যায়। প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি চলতে চলতে যে লীগ তৈরী হয়েছে শুধু তাতেই চালাবি, তাহলে বলদ দুটির পরিশ্রম কম হয়। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি।

সেদিন বলদ দুটি নিজস্ব চালে ওই পথে গাড়ি টানতে থাকে। গলায় ঝোলানো ঘন্টি আর সিঙে জড়ানো ঘুঙুরের আওয়াজে বিভোর নিজেকে সত্যি সত্যি গাড়োয়ান হিসেবে পেয়ে দারুণ লাগে। এ যেন স্বপ্ন। একথা আমি তখনই বুঝতে পারি যখন অন্য গাড়োয়ানরা আমাকে চিনতে পেরে বলে, ধীরে চল, আরে বাবা ধীরে চল! তোর বাবা বলদ দুটিকে ছেলের মতন আগলে রাখে, আর তুই থেকে থেকেই লীগের বাইরে চালাচ্ছিস, এগুলির দুশমন নাকি তুই?

ওদের কথা আমার অসহ্য লাগে। অজান্তেই আমার হাত দিয়ে চাবুক চলে যায়, আর আমার গাড়ি সবার আগে বেরিয়ে যায়। ওদেরকে পেরুনোর সময় একজন গাড়োয়ন চেঁচিয়ে বলে, দেখছো কান্ড, ওর বাবা বলেছে ছেলেকে দেখে রেখ, এতো দেখছি আম্মাদেরও বাপ!

এক বুড়ো গাড়োয়ান বলে, ছাড়ো তো, মানমর্যাদা রাখবে না, লীগ ছেড়ে চালালে ওরই কপাল ফাটবে, এত বাড়াবাড়ি ভাল না। ওর বাপ এখন দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে অথবা নিজেই শেষ হয়ে যাবে।

বলদ দুটি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে থাকে। ওদের পিঠে চাবুকের পর চাবুক পড়ে। ওদের জিভ বেরিয়ে পড়ে। জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যায়। তাই যাওয়ার সময় সবার আগে থাকলেও ফেরার সময় আমার গাড়ি সবার পেছনে। যতই চাবুক মারি না কেন কোন লাভ হয় না। বদল দুটি হাঁপাতে হাঁপাতে সামনের পায়ে বেশী জোর লাগিয়ে অনেক কষ্টে এগুচ্ছে। ওদের এই অবস্থা দেখে এখন ভয়ে বুক দুড়ুদুড়ু করে। এখন কী হবে?

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাবা অধীর অপেক্ষায় ঘরবার করছেন। কাছে পৌঁছুতেই একরকম ছুটে এসে বদলদুটির গায়ে হাত বোলান। আমি অপরাধীর মতন তাকিয়ে দেখি বদল দুটির কাঁধ ফুলে গেছে, জোয়ালের ঘষায় ঘষায় ঘাড়ের ছাল উঠে ঘায়ের মতন হয়ে গেছে। বাবা একবার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে কেবল এটুকুই বলতে পারেন, লীগ থেকে সরিয়ে তুই জোরে চালিয়েছিস! তারপর কপাল চাপড়ে চুপ হয়ে যান। বলদ দুটোর কাঁধে টোটকা ঔষধ লাগান। কিন্তু প্রতিদিন ওদের ঘা বাড়তে থাকে, পুঁজ হয়। বাবা গুমসুম বিছানায় পড়ে থাকেন। এসব দেখে একদিন সাহস করে মাকে জিজ্ঞেস করি, বাবা কথা বলে না কেন?

— আব কোনদিনই হয়তো বলবে না।

— কেন, কী হয়েছে?

— কী হয়নি বল? আগের মতন স্বাভাবিক আর কোনদিন হবে না।

— এতে আমার কী দোষ?

— শুধু দোষ নয়, তুই মহাপাপ করেছিস, ওর প্রাণের থেকেও প্রিয় বলদ দুটির সর্বনাশ করেছিস, ওর ভাবের ঘরে ডাকাতি করে এত বড় আঘাত দিয়েছিস—

— একই লীগে গাড়ি চালানো আমার পছন্দ নয়, আমি নিজস্ব এক লীগ বানাতে চেয়েছিলাম।

— তোর এই নিজস্ব লীগই যত সর্বনাশেব মূল।

— নতুন রাস্তা বানানো কি অপরাধ?

— রাস্তা এত তড়িঘড়ি বানানো যায় না বাপ, ধৈর্য ধরতে হয়। কখনো তো নতুন বাস্তা বানাতে কয়েক পুরুষ লেগে যায়। নাহলে প্রত্যেক পুরুষই এক নতুন ধোকা লালন করে, তবু সবসময় নতুন রাস্তা তৈরী হয় না।

— আগামীদিনে লোকেরা আমার বানানো পথে চলবে।

— এটা তোর ভ্রম, মর্যাদা বলেও কিছু রয়েছে। তোর বাবাও একই ধোকা খেয়েছিলেন, আমি যখন নতুন বউ, তোর বাবা আমাকে প্রথমবার বাপের বাড়ি পৌঁছুনোর জন্য তোর ঠাকুর্দার কাছ থেকে ঘোড়া চেয়েছিলেন। জেদ করায় পেয়েও গেছিলেন। কিন্তু এই শিশুসুলভ পাগলামি। 'ঘগ্গর'

নদীর পার বরাবর নতুন তৈরী পাকা রাস্তায় এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন যে...! মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, সেদিন মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়া দেখে তোর ঠাকুর্দারও প্রায় এইরকমই করুণ দশা হয়েছিল!

— আমি বুঝছি না, কেন? এতে অন্যায় কি?

— প্রত্যেক পুরুষে একই ধোকা বারবার খাওয়া, মর্যাদার উলঙ্ঘন অন্যায় না তো কি?

— কিন্তু বাবার এই দশা তো আর আমার জন্যে হয়নি!

আলবৎ হয়েছে, বলদদুটির ঘাড়ে হওয়া ঘা আর পুঁজই তোর বাবাকে এরকম করে দিয়েছে।

তখন পুরো ঘটনাটার কথা ভেবে আমি কেঁপে উঠি আর বিস্মৃতির মুহূর্তগুলি সারা শরীরে ফোড়ার মতন ফুটে বেরুতে থাকে; খুনী..... খুনী.....খুনী পুত্র..... খুনী পুত্র'..... খুনী পুত্র! এজন্যে এখন মাঝমধ্যেই আমার ঘুমের বারোটা বাজে। আমি সারারাত ছেলের কথা ভেবে ভেবে নিজের অতীত মন্থন করে ছটফট করি। এহেন পরিস্থিতিতে ছেলে গাড়ির চাবি আর রাইফেল চাইলে আমি কী করি? ও কোন ভুল পথে পা বাড়াবে না তো! ও কি গ্রামে গিয়ে কাকা-জ্যাঠার ছেলেদের হত্যা করে বদলা নেওয়ার কথা ভাবছে? বারকয়েক স্বপ্নে ওকে গাড়ি আর রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে ধড়ফড় করে উঠেছি।

ওর মা আমার অবস্থা বোঝে। যখনই ছেলের কথা বলি ও আমাকে বোঝায়, তুমি ওকে নিজস্ব সমাজ, পরিবেশ ও আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভাল করোনি, এই রিক্ততাই ওকে একগুয়ে ও জেদী করে তুলেছে।

ওর কথা হয়তো ঠিক। অবশ্য আসল ঘটনা ওর মা-ও জানে না। আমি মনে মনে ঠিক করি, সকাল হতেই ওদেরকে সবকথা পরিষ্কার করে খুলে বলতে হবে। গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনের কথা, ভাইদের নামে এত বছর ধরে ধোকা দেওয়ার মিথ্যে অপবাদ, বাবার মৃত্যু, আমার মনে পিতৃহত্যার বোঝা সম্পর্কে ওরা যা যা জানতে চায় তার চাইতে বেশী করে জানাবো। তারপরও যদি ও চায় তাহলে রাইফেল এবং গাড়ির চাবি দিয়ে দেব। তাহলে অন্ততঃ দমবন্ধ হয়ে মরবো না। এরকম ভেবে আমি একটু শান্তি পাই।

ভোরবেলা ডেকে তুলে স্ত্রী বলে, শুনছো, তোমার ছেলে পালিয়েছে, গাড়ি নিয়ে গেছে। আমি চোখ কচলাতে কচলাতে বলি, কিন্তু ও তো রাস্তা চেনে না।

— হায় কপাল। ছেলে আমার আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে মরবে।

যেমন কর্ম তেমন ফল। নিজের গন্তব্য না চিনে পথে পা বাড়ালে এমনই হয়। এখন সাতঘাটের জল খেয়ে আপনাআপ ফিরে আসবে।

— হায় রে। কী বলছো তুমি, ওর মাথায় গ্রামে যাওয়ার ভূত চেপেছে, ও যে কেন রাইফেল নিয়ে যেতে চায় তা মাথায় ঢোকে না।

একথা শুনে বুক কেঁপে ওঠে। ও কি কাকা-জ্যাঠার ছেলেদের মারার জন্য যমদূতের মতন ছুটছে? আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। না, এমনটি হতে দেব না। ওকে গিয়ে সব কথা খুলে বলবো। আমার ঘাড়ে জ্বলন হয়। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি ঘাড়টা ফুলে উঠেছে। আঙুলে আঠালো রস ঠেকে। স্ত্রী আমার হাত অনুসরণ করে ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ঘাটা যে দগদগে হয়ে উঠেছে, সারছে না কেন এটা? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না; এটা তোমাদের বংশগত ঘা নয়তো।

ওর প্রশ্নে না কি যন্ত্রণায় আমার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপে। কিন্তু কোন শব্দ বেরোয় না।

জিন্দার

আত্মজ

এক ফর্মা দেখেই আমার মাথা খারাপ। পান্ডুলিপির হাতের লেখা এত বাজে, এত বেশী বানান ভুল ও কোথাও কোথাও এতই অস্পষ্ট যে একবার ভাবি, দুর ছাই, এটা আর দেখবোই না! ফিরিয়ে দেব! যত মুস্কিল কাজ আমাকেই কেন পাঠায়? অথচ এটি দ্বিতীয় প্রুফ। প্রথম প্রুফের পাতায় এত কম কাটাকুটি দেখে অবাক লাগে। নাকি প্রথম প্রুফ রীডারও আমার মতন পড়তে না পেরে ছেড়ে দিয়েছে। 'সী কপি' ও লেখেনি। এক এক প্যারাগ্রাফ পড়ে, তিন তিন প্যারাগ্রাফ করে ছেড়ে দিয়েছে। আমি কিন্তু কষ্ট করে হলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, এর থেকে তো আর মুক্তি নেই! আজ ফিরিয়ে দিলে কাল হয়তো এই ফর্মাই ঘুরে আসবে। এখন ভালমতন দেখলে এর ফাইন্যাল প্রুফটা আমার কাছে এলে আর পান্ডুলিপি দেখার দরকার হবে না, তখন মাত্র আধাঘন্টায় পুরো ফর্মা দেখে নিতে পারবো।

অথচ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরকম সময়ে আমার সতীশের কথা মনে পড়ে, এটাও কি একটা জীবন, কখনো প্রাণভরে ঘুমোতে পারি না, পুরো পরিবার যখন টি ভি দেখে বা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়, তখন আমরা মাছির পর মাছি মারতে থাকি।

এর কথা সবসময় ঠিক না লাগলেও কখনো বিরক্ত হইনি। এখনও হই নি, আর মাত্র দু ফর্মা বাকী। সকালে করার জন্য রেখে টেবিলল্যাম্প বুজিয়ে আমি চেয়ার ছাড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গি, কোমর ঘুরিয়ে শরীরের নিচের অংশটাকে সচল করি, তখনই হাই ওঠে আর বিলাবলের ঘর থেকে স্টিরিওর আওয়াজ শুনতে পাই। টেবিলের উপর রাখা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারেও ওর কাটাগুলি জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে—বারোটা পাঁচ। বিলাবল এখনো ঘুমোয় নি কেন? না কি ঘুমিয়ে পড়েছে! আগেও অনেকবার এমন হয়েছে ও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে আর স্টিরিওতে রিভার্স ক্যাসেট চলতে থাকে, চলতেই থাকে। যতক্ষণ জেগে থাকে একের পর এক সিগারেট ফুঁকতে থাকে। ও জানে, ওর মা সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না, তবু ফুঁকতে থাকে; না হলে নাকি ঘুম আসে না।

ঘুম তো আমারও আসে না। আমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে কোনদিন বাথরুম থেকে ফেরার সময় ও উঁকি দিয়ে বলে, ঔষধ খেয়েছ? আমি মাথা নাড়ি। কখনো আবার চুপ থাকি। টিউবলাইট বন্ধ করে দিই। কিন্তু তারপরও ঘুম আসে না, বারবার ওর ঘরের দিকে চোখ চলে যায়,

কান পেতে থাকি। জ্যোতি কি একবার উঠে গিয়ে বোঝাতে পারে না, রাত অনেক হয়েছে বাবা, শুয়ে পড়, চিন্তা করার জন্যে তোব মাথার উপর তো আমরা আছি!

আমি নিশ্চিত, জ্যোতি বললে কাজ হবে, ও নিশ্চয়ই আলো বন্ধ করে শুয়ে পড়বে, আমি বললে না-ও শুনতে পারে। যতক্ষণ ওর কামরার আলো জ্বালানো থাকে আমার মাথায় যতসব আজেবাজে চিন্তা ঘুরপাক খায়। কখনো মনে হয় আমার ঘুম এখন ওর নিদ্রা-অনিদ্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। .জ্যাতি বারবার বলায় আমি ডাক্তার বাবেজার কাছে যাই। ডাক্তার কেস হিস্ট্রি শুনতে চান। আমি বলি, অফিসে, ডিস্পেচর নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে শয়ে শয়ে চিঠির উপর ঠিকানা লিখতে লিখতে আমার আঙুল ও কব্জি ব্যথা করতো, ঘাড় ব্যথা করতো, সুপারিনটেনডেন্টকে কয়েকবার বলেছি একজন সহায়ক দিতে। দু'একবার হ্যাঁ, হুঁ বলার পর একদিন রাগ করে বলে, নতুন নতুন ডিস্পেচারের কাজ শুরু করেছো, কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে যাবে, আজকাল না জানি কেন কেউ মন দিয়ে কাজ করতে চায় না। এখানে ভাল না লাগলে তোমাকে পরিসংখ্যান বিভাগে লাগিয়ে দেব, সারাদিন যোগ-বিয়োগ করতে হলে টের পাবে।

আমি ওখান থেকে পালিয়ে বাঁচি, ওর মাথায় সবসময় কূটবুদ্ধি কিলবিল করছে, সত্যি সত্যি কিছু করে দিলে আমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। সরকারী অফিসে আমার মতন অধস্তন কর্মচারীর কি মূল্য? পরের মাসে ড্রাইভার নিয়োগের ইন্টারভিউ আর আমার উপর সমস্ত চিঠি পাঠানোব দাযিত্ব অনুযায়ী এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত চিঠি পাঠাতে হবে, একটাও যাতে বাকী না থাকে। সেজন্যে আমি ৯ এর মতন ঝুঁকে নাম্বারের পর নাম্বার লিখতে থাকি। তখন বাড়িতে প্রুফেরও চাপ বেশী; প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচ-ছয় ফর্মার সঙ্গে চিট লাগানো থাকে, "সকালে চাই" ফলত: আমাব ভালমতন বিশ্রাম নেওয়া হয়ে ওঠে না। কখনো কখনো নাম্বাব লেখার সময় আমার মনে হয — অর্ধেক চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু কেমন করে ছিঁড়বো? চিঠি ছেঁড়া আব মৃত্যুকে আবাহন করা সমার্থক। তবু একটা উপায আবিষ্কার করে ফেলি। নিয়মমাফিক প্রতিটি নামেব বিপরীতে ডিসপ্যাচ রেজিষ্টারে নাম্বার লিখে প্রতিদিন কিছু চিঠি বান্ডিল বানিয়ে পেচ্ছাব করতে যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়ে নর্দমায় ফেলে অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে ফিবলে তবেই কিছুটা শান্তি পেতাম।

তাহলে ইন্টারভিউর দিন তো কেউ আসেনি?

না এসেছে, প্রথম দেড়দিনেব ডাকে যাদেবকে পাঠিয়েছিলাম আব পবে পাঠানো স্থানীয় কিছু ক্যান্ডিডেট।

অকপটভাবে বলা স্বীকারোক্তি শুনে ডাক্তাব হাততালি দিয়ে হাসে। তারপব বলে, ঠিক আছে, বলে যান।

আমি লাগাতাব দুই ঘন্টা ধরে মনের যত কষ্ট আছে বলে যাই, কিন্তু একটিবারের জন্যেও বিলাবলের কথা বলতে পারি না। ডাক্তারবাবু ঘন্টি বাজিয়ে দু'কাপ কড়া চা আনায়। তাবপর নিজের রিভলভিং চেয়ারটিকে ঘুরিয়ে একদম ওর মুখোমুখি বসে বলে, এবাব যা জিজ্ঞেস করবো তার জবাব দিন, আপনি কোন্ খববের কাগজ পড়েন?

— অফিসে হাতের সামনেযেটা পাই।

— কী ধরনের খবর বেশী পড়েন?

— অল্পবয়েসী যুবকদের আত্মহত্যার খবর।

— কেন?

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারি না।

— আপনি কি আত্মহত্যা কবার কথা ভাবছেন?

— না, [illegible] চিন্তা কখনো মাথায আসেনি।

— এইরকম খবর পড়ে আপনার ভাল লাগে?

— না।

— তাহলে কেমন লাগে?

— খুব খারাপ লাগে।

— তাহলে এগুলি পড়েন কেন? সিনেমার নায়িকাদের রঙীন গল্প পড়বেন, হাসিমজা-চুটকুলা পড়বেন! তারপর ডাক্তার আমাকে অশ্লীল শব্দ ও যৌন ইঙ্গিতময় কিছু কবিতা শোনায়। আমাকেও শোনাতে বলে। আমি মানা করলে বলে, আরে মশাই, আপনার বয়স এমন কিছু হয়নি,.........জীবনকে রঙীন করে তুলুন, একটা চুটকুলা শোনাচ্ছি......! ভীষণ মজার সেই চুটকুলা শুনে হাসতে হাসতে আমার পেট ব্যথা করে। এক সপ্তাহ লাগাতার এরকমই করতে থাকে। এতে আমি অনেক স্বাভাবিক হই।

কিন্তু মাসখানেক পরই আবার ঘুমের ঔষধ ছাড়া আর ঘুম আসে না। বিলাবল কি জেগে আছে? এই চিন্তাই আমাকে উদ্বিগ্ন রাখে। শুতে শুতে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে আমি গায়ে চাদর জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। বিলাবলের ঘর থেকে এক উদাস সঙ্গীত ভেসে আসে। ওর এতক্ষণ জেগে থাকা আমার কাছে ভয়ানক লাগে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার বারান্দায় দাঁড়াই। একবার ভাবি, মেন সুইচটা অফ করে দিলে কেমন হয়। তাহলেও জেগে থাকলে অবশ্য কিছু বলবে। নাহলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু ও যদি চেঁচিয়ে ওঠে। ভাবতেই বুক কাঁপে। আমি ওর চিৎকার সহ্য করতে পারবো না।

হয়তো সেও আমার চিৎকার সহ্য করতে পারেনি। আমি সেদিন অন্যায়ভাবে চেঁচিয়েছিলাম তা অস্বীকার করতে পারি না। তখন ও ক্লাশ এইটে। একদিন একটি সামারি মুখস্থ করতে করতে আমার কাছে আসে আর কিছু কঠিন শব্দের অর্থ জানতে চায়। আমি ওকে অর্থ বুঝিয়ে বলে দিই। একটু পরেই ও আবার আসে, যা জানতে চায় আমি ভালমতন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিই। কিন্তু তৃতীয়বার এলেই আমি চিৎকার করে উঠি, আমাকে কাজ করতে দেবে কি না?

জানিনা আমি কত জোরে চেঁচিয়েছিলাম, জ্যোতি শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে আর হতভম্ব দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাদের দু'জনকে দেখে। ও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বিলাবলের হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলে, বাবাকে কাজ করতে দাও, কাজ শেষ হলে তবেই ও ঘুমোতে পারবে! একদম বিরক্ত করো না!

সত্যি আর কোনদিন ও বিরক্ত করেনি। নিজের বইগুলি আমার ঘর থেকে উঠিয়ে বৈঠকে নিয়ে যায় আর তারপর থেকে সেখানেই ঘুমাতে থাকে। অবসর সময়ে মায়ের কাছে বসে গল্প করে কিন্তু ভুলেও কখনো আমার কাছে আসে না। আমার কাছেও এত সময় থাকে না যে উঠে গিয়ে ওর কাছে বসি কিম্বা ওকে নিজের কাছে ডাকি। প্রুফ শেষ হলেই অনুবাদের কাজ এসে যায়, রিভিশানের জন্যে বইগুলি পড়ে থাকে। তবু আমি মনে মনে চাইতাম যে ও আমার কাছে এসে বসুক। আমি চাইতাম, ও অনেক পড়ুক! নিদেনপক্ষে কোন কলেজের অধ্যাপক হোক। আমি প্রয়োজনে আরো কষ্ট করতে রাজী, কিন্তু ওর যেন কোন কষ্ট না হয়। এজন্যেই তো দিনরাত খাটি! রাত্ত প্রায় দশটায় চায়ের পিপাসা পেলে আমি উঠে রান্নাঘরে যাই, ওর কামরায় উঁকি মেরে দেখি ঘুমিয়েছে কি না। যদি পড়তে দেখি তাহলে ওর জন্যেও চা বানাই। আমার মত বিলাবলও চা ভালবাসে। আমি চা নিয়ে ওর কাছে গেলে ও বই থেকে চোখ সরায় না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' বলেই জবাব দেয়।

অফিস যেতে যেতে প্রায়ই ভাবি, ওর আর আমার মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। সেদিনই আমি বাজারে যাই আর ওর জন্যে কোন না কোন উপহার কিনে আনি। বাচ্চা তো! ও

খুশী হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার বাবা কত ভাল!

কিন্তু এই ভাল খারাপে পরিণত হতে বেশীদিন লাগেনি। মাধ্যমিকে ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। আমি ওকে কারণ জিজ্ঞেস করলে রেগেমেগে জবাব দেয়, তোমার কি, তোমার কাছে তো আমার জন্যে সময় নেই!

ওকে কষে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজেকে সামলাই। ও এখনো শিশু। বুদ্ধি হলে ধীরে ধীরে সব বুঝে যাবে। তারপর ও ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়। পরে অবশ্য ওর রাগের কারণ বুঝতে পারি। ওর অভিমান, অন্য বন্ধুদের বাবার মতন আমিও কেন আগে থেকে রেজাল্টের খোঁজ করিনি। এরকম রেজাল্ট হয়েছে খোঁজ পেলে আর কিছু না পারলেও ওকে ফেল তো করানো যেত! তাহলে পরের বছর ভাল নম্বর পেয়ে যেত। ও জানে যে আমার প্রকাশকের সঙ্গে স্কুলবোর্ডের কয়েকজন হর্তাকর্তার বেশ দহরম মহরম। এটুকু কাজ তো সহজেই করানো যেত। ওর মায়ের কাছে এইসব ক্ষোভের কথা শুনে আমার নিজের অর্কমণ্যতার জন্যে আফশোষ হয়। আমি তখুনি গিয়ে ছেলেকে বলি, ঠিক আছে বাবা। এখন খুব মেহনত করো, আমি তোমার প্রত্যেক বিষয়ের জন্য টিউটর রেখে দেব।

ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে এক-দুই বছর নানা চাকুরীর জন্যে আবেদন করতে থাকে। তৃতীয় বছর আমি প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে টাকা উঠিয়ে ওকে বাসনের দোকান করে দিই। হয়তো তাড়াহুড়ো করে ফেলি, কেননা ছেলেদের বেকার ঘরে বসা আমার একদমই পছন্দ না। আমিতো এও চেয়েছি যে আর কিছু না হলে প্রুফ রিডিংই শিখে নিক। কিন্তু দু-একবার বলার পরই ও জবাব দেয়, এর থেকে কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়া অনেক ভাল!

যাই হোক, ওর বাসনের দোকান ভালই চললো। আমিও অফিস ফেরৎ নিয়মিত একবার ঢুঁ মারি। কিন্তু বসতে পারিনা। আসলে আমার শরীর তখন বিছানা চায়, এই ঘন্টাখানেক সময়ই আমি বিশ্রাম নিতে পারি। আর এই সময়ই ওর দোকানে বেশী খরিদ্দার আসে। সাতটা বাজতেই শসী আমার বাড়ি পৌঁছে প্রুফের বান্ডিল এগিয়ে দিয়ে বলবে, নিন্ বগ্গা সাহেব, পড়ুন, কালকের মধ্যে চাই। খুবই আর্জেন্ট। দেখবেন ফাঁকি মারলে ধরা পড়ে যাবেন, আজকাল খুবই কড়াকড়ি চলছে! তখন আমি সবকিছু ভুলে যাই। রুটি খাওয়ারও হুঁশ থাকে না। শুতে যাওয়ার আগে যত বেশী সম্ভব ফর্মা দেখে ফেলতে চাই। জ্যোতি খেতে ডাকলে বলি, — এখানে দিয়ে যাও! ও চায় আমরা বাপ-বেটা একসঙ্গে খাই, কিন্তু আমি সময় নষ্ট করতে চাই না! ও সেজন্যে কোনদিন কিছু বলেনি। কেননা এই নানা কাজ থেকে যে টাকা আসে তা ও খোলা হাতে খরচ করতে পারে! ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে কাজ কমে গেলে ও আমাকে বারবার মনে করানোর জন্যে বলে, — জস্‌পালকে ফোন করলে হয়, এখন তো নতুন সীজন শুরু হলো বলে!

বিলাবল দোকান বন্ধ করে সোজা ঘরে ফিরতো। আমার কাছে বসে কত বিক্রী হয়েছে, কত লাভ হয়েছে, তা থেকে ঋণ শোধ করতে কত যাবে ইত্যাদি বলতো। ওর এই নিষ্ঠা আমার খুব ভাল লাগতো। কিন্তু ওর রমরমা দেখে বেশী পুঁজি নিয়ে পাশাপাশি আরো দুটি নতুন বাসনের দোকান খুলে যাওয়ায় কয়েকমাসের মধ্যেই বিলাবলের ব্যবসা মার খায়। ওর পক্ষে ঘর ভাড়া দেওয়ার পর আর কিছু করা মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। তেয়ার-পরবের সময় বিক্রি বাড়লে কিছুদিন হাসিখুশী, তারপর আবার মাসের পর মাস মন্দা। ওর স্বভাব ক্রমে খিটমিটে হয়ে পড়ে। না ডাকলে আর আমার কাছে আসে না, কথাও বলে না। তারপর ঘরভাড়া, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি ক্রমশঃ বড় হা করে গিলতে এলে ও একদিন নিজের মাকে বলে, — দোকান বন্ধ করে দিলেই ভাল!

— এখনো তো তিন বছরই হয়নি! জ্যোতি ওকে বোঝায়, ধৈর্য ধর, ব্যবসাতেই তোমার

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!

— কিন্তু মা অন্য বাসনঅলাদের কাছে ভ্যারাইটি বেশী, লোকে আমার দোকানে আসবে কেন?

— তুই অল্প অল্প করে মাল বাড়া।

— সপ্তাহে দুইবার আমি মাই হীরা গেট যাই, পুরনো পিতল বেঁচে নতুন আনি, কিন্তু তাতে তেমন লাভ নেই। এক সঙ্গে প্রচুর মালের বৈচিত্র্য চাই!

দীপাবলীর বিক্রিবাটার পর আবার মন্দা শুরু হলে বিলাবলের দোকানে তালা লেগে যায়। তার কিছুদিন আগে থেকেই ওর ঘরের আলো আবার অনেক রাত অব্দি জ্বলতে থাকে, সারা বাড়িতে সিগারেটের হতাশ ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ ছেয়ে যায়। আমার ঘুমেরও বারোটা বাজে। মনে হয় জীবনের প্রথম পরাজয়ই ওর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। হয়তো তাড়াহুড়োর জন্যেই ও এত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। আমি জ্যোতিকে ওর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে বলি, যখন টাকা চায়, ও যেন পায়। ঘুমিয়ে থাকলে যেন না ডাকে, আগের মতনই যেন পাশে বসিয়ে খাওয়ায়। আমি ওকে একটা রঙীন টি ভি কিনে দিই। এক ছুটির দিনে ওর কাছে গিয়ে পাশে বসে ওকে পাসপোর্ট বানিয়ে কোন আরব দেশে গিয়ে কয়েক বছর রোজগার করে তারপর ফিরে আসতে বলি!

ও জবাব দেয়, আমি আগেই ভেবেছি, বাইরে যেতে যত খরচ হবে, সেই টাকায় এখানেই একটা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করা যাবে!

— তুমি কি করার কথা ভাবছো?

— অনেক কিছুই করা যায়।

— তাহলে কি ভাবছো?

— কিচ্ছু না!

— টাকার জন্যে ভেব না!

— আমি জানি, বাসনের দোকানে ত্রিশ হাজার লোকসান হয়েছে! এই বলে ও উঠে চলে যায়। তারপর থেকেই ও আমাকে এড়িয়ে চলতে থাকে। কিছুদিন ও এক প্রেসের বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজ করে, তারপর কিছুদিন মার্কেট কমিটির অ্যাকশান রেকর্ডারের কাজ করে। ওর এই কিছু করার চেষ্টা আমার ভাল লাগে। তবু আমাদের দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। তার প্রমাণ পাই যেদিন ও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটা ছোট কফি হাউস খোলার জন্য দোকানঘর খুঁজে নেয়। এব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনরকম শলাপরামর্শ দূরের কথা ও নিজের মাকেও কিছু বলেনি। যেন বলার কোন প্রয়োজনই নেই। আমি বেরুনোর আগেই রোজ ও বেরিয়ে পড়ে আর আমি ফেরার অনেক প'রে টলমল পায়ে বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। ও এত আস্তে গেট খুলে ঢোকে যে বেশীরভাগ দিন আমি বুঝতে পারি না। জ্যোতি জানালার পাশে বসে থাকে কখন ছেলে ফিরবে আর ও দুটো রুটি খাইয়ে নিশ্চিন্ত হবে। আমি ওকে বলি, ও কি দুধের শিশু? খিদে পেলে অবশ্যই ডাকবে অথবা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে দুটো খেয়ে নেবে!

জ্যোতি কোন জবাব দেয় না। কিন্তু ওর কাতর চাহনি বলে, আমি যে মা!

ওর এই দুর্বলতা ছেলে বোঝে। তাই জ্যোতি কোন কারণে ওকে রান্নাঘরে ডাকলেও, সে উল্টো বলবে—তুমি এ ঘরে এসে বল না মা!

মায়ের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা বাদশাজাদা নিজের ঘর থেকেই সারবে। এইসব দেখে আমার বিলাবলের উপর যত রাগ হয় তার থেকে বেশী রাগ হয় জ্যোতির উপর। ওর আদর আহলাদই ছেলেটাকে বিগড়েছে। বিগড়ানো না বলে বলা উচিত কুঁড়ে বানিয়ে দিয়েছে। আজকাল অবশ্য ব্যবসার খাতিরে দৌড়ঝাঁপ করছে। ওর জন্যে আমাকে কিছু করতে হয় না। আজকাল ও কিছু করে

নিয়ে তারপরই জানায়। তখন কিছু করারও থাকে না। আমি চাই, ও আমার কাছে দুদন্ড বসুক। কিন্তু ও অদ্ভুৎ স্বরে বলে ওঠে, আসছি, আপনি প্রুফ দেখতে থাকুন!

আমি জানি প্রুফ ওর দু'চোখের বিষ। অথচ ও জানে আমি এই কাজ শখে করি না। ওকে কথায় কথায় বেশ কয়েকবার বলেওছি, তুমি বোঝ না কেন, জান আমি হাউস বিল্ডিং অ্যাডভান্স নিয়েছি, বেতনের অনেক টাকাই কিস্তিতে কাটাতে হয়, আরো দু'বছর এরকম চলবে, নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই তো তোমার কথা ভেবেই বানিয়েছি।

ও উৎপটাং জবাব দেয়, আমি থাকবো কিনা সময় বলবে!

একদিন ও একটা ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র আমার সামনে রেখে বলে, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নেবে। ঐ কার্ডে আমার নাম ছাপা রয়েছে দেখে অবাক হই। জ্যোতি আর থাকতে না পেরে বলে, তুমি আমাদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন বোধ করলে না?

এতে আবার জিজ্ঞাসা পরামর্শের কি রয়েছে, এ আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি। বুঝি ও এখন কারো নাক গলানো পছন্দ করছে না। তবু আমি এ মুহূর্তে ওর দিকে তাকাতে পারি না। ও জিজ্ঞেস করে, আসবে তো? ওর আওয়াজে স্পষ্ট বিরক্তি।

— কেন যাবো না..... আমরা যাবো না তো কে যাবে বাবা?

জ্যোতি মহা উৎসাহে জিজ্ঞেস করে, আর কে কে আসবে রে?

ও কঠিন আওয়াজে জবাব দেয়, তা দিয়ে তোমারা কী করবে, কার কার আসা উচিত সেটা আমি দেখবো!

ও ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ও বেরুতেই আমার মনে হয় যেন কোন বোঝা ঘাড় থেকে নামলো। আমার সহকর্মী রামপ্রকাশের ছেলে নিন্দার কথা মনে পড়ে। প্রথমে ও বাজাজের দোকানে সেলসম্যান ছিল, তারপর ধারে জিনিস নিয়ে নিজের দোকান খোলে। দোকান ভাল চলতে শুরু করলে রামপ্রকাশকে রিটায়ারমেন্ট নিইয়ে দোকানের কাউন্টারে বসায়। আমিও এখন বিলাবলের সফলতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। বাসনের দোকান বন্ধ করাব পর থেকেই ও অস্থির ছিল। এই ধাক্কা মনে হয় ওকে অনেক পরিণত করেছে। এবার নিশ্চয়ই আর মার খাবে না। আমার খুব ভাল লাগে। ওর কফি হাউসের উদ্বোধন আমি উপভোগ করি। স্থানীয় কাউন্সিলর ও বাজার কমিটির সভাপতিও উদ্বোধনের পার্টিতে এসে চা মিষ্টি খেয়ে যান। অনেকদিন পর ভাল ঘুম হয়। প্রতিদিন লাগাতর ভাল ঘুম আসা মানুষের জীবনে আশীর্বাদ।

মাসখানেক পর ও রান্নাঘরে মায়ের কাছে বসে বলে, এবার আর চিন্তা করতে হবে না!

প্রুফ দেখতে দেখতে শুনি। যে দুটি ছেলেকে রেখেছি, ওদেরকে মাসে পাঁচশো টাকা করে দিতে হবে, দু'হাজার টাকা ঘরভাড়া আব পাঁচ-সাতশো টাকা ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে মোড়ের উপর দোকানটা নিয়েছি। সকাল সন্ধ্যায় তিনটে পথে লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। গত মাসে সব দিয়ে তিন হাজার বাঁচাতে পেরেছি। এই তো শুরু। দাদু বলতেন, প্রথম এক বছর দোকান তোমাকে খাবে, তারপর থেকে তুমি দোকানকে খাবে!...... আমার মাথায় আরো বুদ্ধি খেলছে, ড্রাইফ্রুটস রাখা যেতে পারে। কোনখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করতে হবে। না পেলে সুদেও নেওয়া যেতে পারে। শুধু একটাই ভয়, এই এলাকায় আর কেউ কফি হাউস না খুলে বসে। আমি তোমাকে টাকা জমিয়ে দেখিয়ে দেব।

ও উঠে আমার ঘর দিয়ে যাওয়ার সময় কর্তৃত্ব সহকারে বলে, তুমি সময়মত শুয়ে পড়! তারপর ওর ঘরে আধাঘন্টারও বেশী আলো জ্বলে না। আমিও ঔষধ ছাড়াই অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়ি।

কিন্তু এই শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে কেবল কয়েক মাস। একদিন ও আমার কাছে দু'হাজার টাকা চায়। কুড়ি তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্কের কিস্তি জমা দিতে হবে। ওর চোখের কোণে কালি দেখে আমার বুক মুচড়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, সকালে নিও। ও চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যায়। আমি প্রুফ দেখতে থাকি। কেননা এখন উঠলে কোথাও 'সী কপি' অদেখা থেকে গেলে কালই প্রুফের সঙ্গে চিট পাবো, "বগ্‌গাজী, মনোযোগ দিয়ে দেখুন, নাহলে আর প্রুফ পাঠানো হবে না!"

এখন রাত প্রায় একটা। বিলাবল ক্যাসেট পাল্টালে বুঝতে পারি যে ও জেগে আছে। তাকিয়ে দেখি জ্যোতিও চুপচাপ বসে রয়েছে। ও কি কিছু বলবে? আমি চিন্তিত কণ্ঠে বলি, এতরাত হয়েছে, এখনো ছেলে ঘুমায়নি!

জ্যোতি বলে, জানি না, ও বসে বসে কী সব ভাবতে থাকে।

—এই বয়সে তো খুব ঘুম আসা উচিত।

— হুঁ।

আমি জানি জ্যোতি যখন হুঁ বলে তখন আর কোনরকম কথোপকথন অসম্ভব। ও কিছুক্ষণ নিজের গভীরে ডুবে থাকে। আমি ওর নিস্তব্ধতাকে অনুভব করি। প্রুফ দেখতে আর ভাল লাগে না।

— আচ্ছা, বিলাবলকে ডাঃ ববেজার কাছে নিয়ে গেলে হয় না গো? এই প্রশ্ন করে জ্যোতি গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি হেসে বলি, ডাক্তারবাবু কী ভাববেন, প্রথমে বাপ ঔষধ খাচ্ছিল, এখন বেটাকে নিয়ে এসেছে!

আমার মুখে হাসি দেখে ও অবাক। ওর চোখ বলে, এতে হাসার কী হলো?

জ্যোতি বলে, ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তোমারও তো ওর ঔষধে লাভ হয়েছে। আমি ওর কথায় সায় দিয়ে বলি, তুমি চা বানিয়ে আনো, বিলাবলের জন্যেও বানিও!

ও তক্ষুণি উঠে চা বানাতে চলে যায়। আমি প্রুফগুলোকে গুটিয়ে টেবিলল্যাম্প বুজিয়ে আমাদের একমাত্র পুত্রসন্তানকে নিয়ে ভাবি। মেয়েগুলি তো যার যার শ্বশুরবাড়িতে সুখেই ঘর করছে। কাউকে নিয়ে এত ভাবতে হয়নি। কিন্তু আমার রিটায়ারমেন্টের আগে এর একটা হিল্লে হলে বাঁচি, তাহলে বিয়েটাও করিয়ে দেব। আমি ঘরময় পায়চারী করতে থাকি।

জ্যোতি দু'কাপ চা আনে। ও নিজে রাতে চা খায় না। আমি জানি আমার অভ্যাসটাই ভাল না। কিন্তু এই চা-টা খেলে সাধারণত আধঘন্টার মধ্যেই ঘুম এসে যায়।

এখন আমি কাপ দুটি হাতে নিয়ে বিলাবলের ঘরে ঢোকার সময় একটা সিদ্ধান্ত নিই, যা শুনলে বিলাবল খুশী হবে। এবার আমার প্রভিডেন্ড ফান্ডে অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার তুলে ওকে দেব। এই টাকা দিয়ে ও নিজের কফি হাউসের গেট আপ পাল্টে ফেলতে পারবে। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওর কামরায় ঢুকি। ও ঘাড় অব্দি লেপ ঢাকা দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় কিছু লিখছে। আমাকে দেখে মাথা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বলে, চা-টা টেবিলে রেখে দাও, তুমি এখনো জেগে? সরি বাবা, খেয়াল করিনি, এত জোরে ক্যাসেট চালানো উচিত হয়নি! সরি বাবা, রিয়েলী সরি!

ও উঠার আগেই আমি স্টিরিওর আওয়াজ কমিয়ে কাপ দুটি সামলে কম্বল সরিয়ে বিছানায় বসতে গেলেই ও বেশ জোরে বলে ওঠে, না বাবা, নিজের কামরায় যাও, প্লীজ লীভ মী এলোন!

আমি আমতা আমতা করে বলি, বলছিলাম কি, আমার ...

সকালে বলবে, যাও, এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো, আমাকে একা থাকতে দাও, প্লীজ! আমার তখন নিজের কামরায় ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

রচনাকাল: ১৯৯৮

মাই হীরা গেট : জলন্ধরের পাইকারী মালের বড় বাজার যাবতীয় সামগ্রীর হোলসেল মার্কেট

অবতার সিংহ বিলিংগ

উড়ে যাওয়া অশ্বত্থ

আজ দাদু আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। দাহসংস্কারের পর চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমরা ঘরে ফিরি। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ঢুকে খাবার বানাতে শুরু করে। আমি স্নান সেরে এসে বিছানায় বসি। হ্যাপী বলে— বাবা, মন খারাপ লাগছে, একটা গল্প শোনাও না!

আমি ওকে প্রায়ই দাদুর কাছে ছোটবেলায় শোনা নানা গল্প শোনাই। কিন্তু আজ আমারও যে মন খারাপ, গল্প কি মানুষ যখন খুশী বলতে পারে? কিন্তু আমি একটা নয় বছরের ছেলের ইচ্ছাকে, সহজ অনুরোধকে কেমন করে এড়াই?

অন্যসময় গল্প বলার ইচ্ছে না থাকলে আমি ওকে নানা হাসিমজার চুটকুলা ইত্যাদি শুনিয়ে খুশী করি। অথবা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলি, কথা থেকে কথা বেরোয়

কথায় কথায় কথা
পেঁয়াজের খোসা যতই ছাড়াও
পেঁয়াজ থাকে সেথা!

ও ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের কাছে যায়। বলে, বাবা ভীষণ দুষ্টু! ওর মা তখন কোন একটা গল্প বলে ওকে ভুলিয়ে রাখে। ওর এই গল্প শোনার নেশা আমার ভাল লাগে। অন্য বাচ্চারা তো টি ভি দেখতে বেশী ভালবাসে। আমি জিঞ্জেস করি, আমার ছোটবেলার গল্প শোনাব, না বই-এ পড়া গল্প?

ও বলে, তোমার ছোটবেলার গল্প!

আমি তখন ছোটবেলার গল্প বলতে শুরু করি। যা পুরোপুরি আমার ছোটবেলার গল্প নয়। ছোটবেলায় শোনা রূপকথার গল্পের সঙ্গে নিজস্ব স্বপ্ন ও ইচ্ছা মেশানো থাকে। দাদুর কাছে শোনা রূপকথার গল্পে দাদুই যেন নায়ক।

সেদিন বুধবার। আমার ছটফটে দিদিমা সাতদিনের জমানো মাখন জাল দিয়ে ঘি বানিয়েছে। যেদিনই দিদিমা ঘি বানায় আমাকে ঘি আর চিনি মিশিয়ে খেতে দেয়। এক গ্লাস দুধ খেলে যত খুশী ঘি-চিনি খেতে পারো! ঘি-চিনি আমার খুব প্রিয়। শিকেয় ঝোলানো মটকা থেকেও কতবার ঘি নিয়ে খেয়েছি! কোনদিন বাড়িঘরে তালা লাগানো হতো না। যার যখন খুশী বিশাল দোহনী থেকে কাসার বড় গ্লাস ভরে দুধ খাও। দাদু বলতো, ঘরের প্রাণীদের থেকে কখনও দুধ-ঘি লুকিয়ে রেখ

না হর কৌর : দাদু আদর করে দিদিমাকে 'হর কৌর' ডাকতো।

শ্রাবণ মাসে দুই-তিন দিন পরপরই বহলোলপুরের বাগান থেকে টুকরি ভরে আম নিয়ে আসতো। সকালবেলা নালার দিকে গরু মোষ নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিতো। সেখানে গরু মোষের পেছনে দৌড়ঝাঁপ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে বলতো, আজ তোকে সিন্দুরী আম খাওয়াবো! আমার মন আনন্দে নেচে উঠতো। কিন্তু খানিকটা বাদেই আবার জিজ্ঞেস করতাম, নানাজী, আমরা *চমকৌর কবে যাব?

দাদু আমাদেরকে বড় বাড়ির জাগীরদারদের মতন সবাইকে 'জী' বলতে শিখিয়েছে। বড় বাড়ির লোকেরা ঝগড়া করার সময়, এমনকি ঘুষি মারতে গিয়েও কাউকে 'জী' বলে সম্মান জানায়। দাদু বলে, আমাদের মতন জাট-বুট লোকেরা সম্বোধন করি, "হো"-"আহো" বলে! আমাদের ভাষা পাহাড়ী কাকের মতন কর্কশ। আর উচ্চারণের সময় কুড়ুল দিয়ে কাটার মতন শব্দ হয়। এজন্যেই বলি ভাই, "চমকৌর" না বলে "চমকৌর সাহিব" বলা উচিত।

চমকৌর সাহিব গেলেই দাদু আমাদের সমস্ত ধর্মস্থান — কতলগড়, গঢ়ী সাহিব, দমদমা সাহিব আর রণজিৎগড় ঘুরিয়ে আনতো। কিন্তু সংক্রান্তির দিন ভোর হওয়ার আগেই কখন দাদু বেরিয়ে পড়তো। আমরা ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে দিদিমার কাছে প্রসাদ পেতাম।

দাদু প্রায়ই বলতো, সুযোগ পেলেই তোকে বাজারে নিয়ে যাব, * লস্যরেব মতন হাল্কা বাদামী রঙের পাগড়ি কিনে দেব। তোর জন্যে একটা টুকটুকে ফর্সা বউ খুঁজবো, যাকে হাত লাগালেই ময়লা হয়ে যায়!

কখনো সখনো আমরা শহরে যেতাম কলে আটা পিষিয়ে আনতে অথবা সিঙ্গারা ফলের নাড়ু বানিয়ে আনতে। দাদু চিনি-ঘি আর গিরি-বাদামের গুড়ো পনের কেজি তেলের টিনে ভরে চমকৌর নালার বাঁধানো পার দিয়ে হেঁটে যেতো। ওর পাশাপাশি হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগতো। যদিও জানতাম ইনি আমাকে বাজার থেকে চাটুমচুটুম কিছুই কিনে দেবেন না। পিহোবে গেলে ওখানকাব হোটেলের জলও খেতে দিত না। নিজে খাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। ঘরে তৈরী পঞ্জীরী আব পিতলের গ্লাস একবগুা গামছায় পুটুলি বেঁধে সঙ্গে রাখতো। চমকৌর সাহিবের সামনে রলারাম হালুয়াই-এর দোকানে গিয়ে ঐ গ্লাসে করে জল, চা আর * পঞ্জীরী খেত। ওখান থেকেই লাড্ডু কেনা হতো। কিন্তু ঐ লাড্ডু হাতে পেতে তখনো অনেক দেরী। দিদিমা কারো হাত লাগাব আগেই বিলওয়ালা শহীদদের জন্যে আলাদা করে প্রসাদ রেখে দিত।

দুই-তিন টিন লাড্ডু দাদু চাদরেব দুই প্রান্তে বেঁধে কাঁধের দুপাশে লটকে গ্রামের পথে হাঁটা দিত। গুরুদুয়ারা তাড়ীসাহিবের কাছেই সূর্য ডুবে যেত। দাদু বলতো, যুদ্ধ জেতার পর দুর্গ থেকে বেরিয়ে দশম গুরু এখানে এসে দাঁড়িয়ে তালি বাজিয়ে শত্রুকে আবার যুদ্ধের আহ্বান করেছিলেন, এখনো যদি কোন মাই-কে লাল শক্তি পবীক্ষা করতে চাস্ তো আয়। এবপর বলিস না যে " হিন্দ কা পীর" চুপচাপ চলে গেছে!

অন্ধকার বাড়তে থাকে। আমরা নিজেদের মতন নালার বাঁধানো পার দিয়ে হাঁটতে থাকি। দাদু বলে, এই নালার দু'পাশে দাঁড়ানো মোটা মোটা খেঁজুর গাছের নিচে বসে মোগল সৈনিকরা কাবুল-কান্দাহারের খেঁজুর খেত। কাশের বন আর অন্য ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শিয়ালের হুক্কা হুয়া.......!

— না বাবা, এটা আর শুনবো না, ঐ যে খোদার বান্দার গল্পটা শোনাও—

হ্যাপী কি আমার গল্পের কথাগুলি বিশ্বাস করছে না? ও অন্য গল্প শোনার জন্যে জেদ করে কেন? আমাকে ঝাঁকায় কেন? আমি আনমনা জিজ্ঞেস করি, কোন্ খোদার বান্দা?

— ঐ যে গল্পটা, এক রাজার ছেলে আর এক মন্ত্রীর ছেলে চাকবের ছদ্মবেশে এক রাজকুমারীর চাকর হয়ে পড়ে। প্রতিবেশী স্বর্ণকারদের এক রোদরঙা কন্যা রাতের বেলা রিনঝিন কদমে হেঁটে

গিয়ে এক অশ্বত্থ গাছের ডালে চড়ে বসে বলে, — খোদা কে বান্দে, চলো! তাই দেখে চাকরবেশী মন্ত্রীপুত্র একদিন চুপিচুপি ওর পেছন পেছন হেঁটে গিয়ে ঐ অশ্বত্থের শিকড়ে বসে পড়ে। ওর মাথায় জাদুটুপী পরা থাকায় মেয়েটা ওকে দেখতে পায় না! ও অশ্বত্থকে উড়ে যেতে বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন অশ্বত্থ চড়বড় করে মাটি ছাড়িয়ে আকাশে উড়তে শুরু করে। মন্ত্রীপুত্র ওর শিকড়টাকে প্রাণপনে আঁকড়ে ধরে থাকে। অবশেষে ঐ অশ্বত্থ স্বর্গে পৌঁছে যায়। সেখানে সভা আলো করে বসে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা অপ্সরা ও পরীদের নাচ দেখেন। দূর থেকে সেই নূপুরের নিক্কন ও ঢোলের মাদক বোল শোনা যায়। ঢোলকীর চোখ ঢুলঢুলু। ওর ঘুম পেয়ে গেছে। তাই দেখে মন্ত্রীর ছেলে আলগোছে ঢোলটাকে কোলে নিয়ে বাজাতে শুরু করে। ও এত সুন্দর চাটি মারে যে অপ্সরাদের নাচে মজা এসে যায়। একজন তো গলার দামী হারটি মন্ত্রীর ছেলের গলায় পরিয়ে দেন.....।

পরদিন গলির পথে রোজকার মতন মেয়েরা যখন খেলা করে, চাকরবেশী মন্ত্রীপুত্র ওদেরকে এই গল্প শুনিয়ে বলে. মেয়েরা এই গল্পটাকে সত্যি ভেব না! এটা তো আমি স্বপ্ন দেখেছি! তারপর দ্বিতীয় রাতে কী হলো বাবা?

হ্যাপী নিজে অনেকটা গল্প বলে ফেলে এখন আমার কাছে বাকীটা শুনতে চায়। আমিও এই গল্প বারবার দাদুর কাছে শুনতে চেয়েছি। এই নাও, আবার দাদু আমার চিন্তায় চলে আসে। মনে পড়ে একদিন গরু চড়াতে গিয়ে আমি দুপুরের আগেই বাড়ি ফেরার জন্যে জেদ ধরি, কান্নাকাটি শুরু করি, তখন দাদু আমার মাথার চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কেটে বলে, বাহ্‌রে মাই-কে লাল! জানিস্‌ না আজ বৃহস্পতিবার?

নালার পাশেই জঙ্গলের ভেতরে কয়েকশো বছরের পুরনো পাঁচ পীরের একটি মকবরা রয়েছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ওখানে পুজো হতো। চোখ বন্ধ করে শ্বাস নিলেই তখন ওখানকার দেশী ঘি আর ঝুড়িভাজার সুগন্ধ পেতাম। বৃহস্পতিবারে চাষাভূষা রাখাল-বাগালরা সবাই এজন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। দাদু তো প্রতিদিনই এখানে এসে উটের চামড়ার জুতো খুলে হাতজোড় করে মকবরাকে প্রণাম করতো। নালার বাঁধানো পার থেকে নিচে জঙ্গলের দিকে নামতে নামতে দাদু বলতো, এই পীর ভীষণ ক্ষমতাবান ছিলেন! বড়ে করামাতী!

পথচলতি যে কোন পথিককে দাদু হেসে 'মহারাজজী' বলে অভিবাদন করতো। ছোট-বড় কাকা-জ্যাঠা-ভাই-ভাইপো এমনকি অপরিচিতদেরকেও। শুধু জাগীরদার বাড়ির লোকেরা কাষ্ঠমুখে পিঠ দেখিয়ে ফেরীঘাটের দিকে হেঁটে গেলে আহত দাদু বলতো, আহা, এদেরই বা কী দোষ, 'বন্দোবস্ত'-এর পর এদের জন্যে শুধু সাদা পোষাকটাই রয়ে গেছে! সামান্য যা-ও বাকী ছিল নতুন চকবন্দীর পর তাও আর নেই! কাল যে রাজা ছিল আজ সে ফকির! ওদের পূর্বজরা আমাদের বাপ ঠাকুর্দাদের খুব অত্যাচার করেছে! ফাল্গুন মাসে কোন চাষাকে কয়েকটা ভূট্টা বা কয়েকটা খোসাশুদ্ধ মটরশুটি পুড়িয়ে খেতে দেখলেই হলো। জাগীরদারের দুর্গসম ছাদে দাঁড়ানো প্রহরী কোথাও ধোঁয়া দেখলেই ঘোড়ার পিঠে চেপে সোজা পৌঁছে যেত। কোন কৃষক যদি পা দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিত তাও ওরা শিকারী কুকুরের মতন শুকতো। পরদিন ভোরে ঐ চাষা মাঠে হেগে গেলে ওরা কাঠি দিয়ে পায়খানা ঘেটে দেখতো। শংকা নিবৃত্ত না হওয়া অব্দি কাঠের বেড়ি ও শেকল পরিয়ে নানারকম অত্যাচার চালাতো। ঐরকম কাঠের বেড়ি ও শেকল দাদু নিজের চোখে দুর্গের বাইরে পড়ে থাকতে দেখেছেন।

কোন কোন পথিক কিম্বা কদাচিৎ সাইকেল আরোহী দাদুর সম্বোধন অভিবাদনে আকৃষ্ট হয়ে ওর কাছে থেমে যেত। দাদু নিজের দোপাট্টার আঁচল কাঁধের দুপাশে জড়িয়ে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করতো, এবার বলুন জী. আপনার দৌলতখানা কোথায়?

কোন হাউটা-বাউটা লোকের সঙ্গে গল্প করার সময়ও দাদু নিজের বাড়িকে "গরীবখানা" আর অন্যের বাড়িকে "দৌলতখানা" বলতো। পথিককে কোন গাছের ছায়ায় বসিয়ে গল্প করতে করতে ওদের সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়তো। অথবা দেখা যেত ভদ্রলোক জ্ঞাতি সম্পর্কে কোন নিকট আত্মীয়।

দাদুকে আমি কখনো হাল চালাতে দেখিনি। কোন পরিশ্রমের কাজ করতেও খুব কম দেখেছি। যদি কখনো সেচের নালা বা বিছন থেকে জলের গতি পাল্টে দিতে যেত তাহলে নিহংগ মামার বকরবকর শুরু হতো, বাহ্-বাহ্, সেচের নালা পরিষ্কার করা তো কেউ আপনার থেকে শিখবে! দাদু বলতো, আরে জমিদার, ঘাসের নিচে বাসা বানিয়ে পিঁপড়েরাও একদিনে সওয়া মন জল খায়, আরে নির্ধন মানুষ, ঐ সেচের নালার দু'পাশে মাটি কে দেবে?

এ কথায় মামা রেগে যায়। — সারা জীবন তো আপনি দোকান আর ইটভাট্টায় বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন, এখন চাষবাস নিয়ে পণ্ডিতি দেখাতে এসেছেন? এরকম কথায় কথায় বাপবেটায় একপশলা ঝগড়া হয়ে যেত।

দাদু কোনদিন কোনরকম নেশা করেননি। ঐ এক গল্প করা গল্প শোনার নেশা! সামান্য জমি ছিল, তাও ঘর গৃহস্থীর পেছনেই লেগে গেছে। এমনকি গয়নাও বন্ধক রাখতে হয়েছে। নিহংগ মামা অবিবাহিতই থেকে গেছে। ইনি তো আর পরম্পরাগত * নিহংগ নন। অবিবাহিত মানুষ বিবাগী হয়ে নিহংগদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ওদের মতন পোষাক পরে নিহংগ হয়ে পড়েছেন।

সামান্য যা জমি বাকী ছিল তাতে আর কতটা ফসল হতো! দূরের ফসল কাটার সময় জংলীঘাসের কাঁটায় হাতের ছাল উঠে যেত। ঝড়-তুফান এলে জংলীঘাসের শুকনো গুঁড়ি মামার খালি পায়ে কুলের কাঁটার মতন বিধে যেত। নিহংগ মামাও আসলে ভাল চাষবাস জানতো না।

হ্যাপী হয়তো আমার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কোথাও চলে গেছে। আমার মনে পড়ে, দাদু একদিন রক্তাক্ত হয়ে ঘরে ফেরেন। শরীকরা সেদিন লাগানো আমগাছ কেটে নিয়ে গেছে, ওদের উট দাদুকে পা দিয়ে মাড়িয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। দিদিমা ছলছল চোখে ইষদুষ্ণ দুধে ঘি মিশিয়ে এনে দাদুর কাঁধে ও কানুই-এর উপরে ক্ষতস্থানে লাগাতে লাগাতে কাঁদোকাদো স্বরে বলেন, এই বুড়োও পারে! কতবার বলেছি এই ম্লেচ্ছের ফাঁদটাকে কেটে ফেল! সেই পয়সায় টিউবওয়েল পোতা যাবে, নাও এখন সব নোংরা ঘোড়ার বাচ্চাদেরও সাফ করো! খুব মজা পাবে! নিহংগ মামা খবর পেয়ে দাদুকে দেখতে এসে দিদিমার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে। দাদু কাতরকণ্ঠে হুঙ্কার দেয়, রে দুষ্টাত্মা, আমার সামনে থেকে চলে যা!

দিদিমা পরদিন থেকে নিয়মিত দুইবেলা ঘি আর হলুদ লাগিয়ে ধীরে ধীরে দাদুর ক্ষতস্থানকে ভরিয়ে তোলেন। কিন্তু তার আগেই একদিন আমাদের উঠোনে আসে এক জ্যোতিষি। ও কুষ্ঠী দেখে পঞ্চাঙ্গ সাজাতে সাজাতে বলে, অনেক আগেই তো তোমার মরার কথা ছিল যজমান, স্ত্রীর ভাগ্যে বেঁচে আছো! তারপর ও চোখ বড় বড় করে বলে, ভালোমতন পুজোআচ্চা করাও তাহলে একদম বুড়ো হয়ে মরবে!

তারপর দাদু কুষ্ঠী নিয়ে একবার বারনালার জ্যোতিষীর কাছে যান, একবার হোসিয়ারপুরবাসী ভৃগু-সংহিতাজ্ঞানী জ্যোতিষীর কাছে যান।

হোসিয়ারপুরে ভোর ভোর গিয়ে হত্যে দিয়ে তারপর ভাগ্য দেখানোর সুযোগ পান। সেখানে ওর কুষ্ঠীর সঙ্গে জ্যোতিষীর হিসেব নাকি একদম ঠিকঠিক মিলে যায়। দাদু নাকি আগের জন্মেও জাট ছিলেন। তখন ওর নাম ছিল কেসর। অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন নাকি! এ তো বিধাতার লীলা যে এবার ছোটচাষী হয়েছেন। আগামী জন্মে তিনি আবার বড় জমিদার হবেন। নিজের এলাকার 'চৌধরী'। যমুনার তীরে আগ্রার কাছাকাছি কোথাও ওর অনেক সম্পত্তি হবে।

এবার ওর আয়ু ৮৮ অথবা ৮৭ বছর হবে।

ব্যস, সেইদিন থেকেই দাদু লক্ষ কোটি টাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আমার মাসতুতো ভাই আর আমি ওকে বোঝাই, দাদু এইসব জ্যোতিষীরা গল্প বানিয়ে বলে! দাদু বলেন, তোদের পেটে দুই অক্ষর ইংরেজী ঢুকেছে বলে নিজেদেরকে খুব জ্ঞানী ভাবিস নাকি? জ্যোতিষী বলেছেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই আমার যমলোকে যাওয়ার কথা। কিন্তু তোর দিদিমার ভাগ্যে আমার আয়ু বেড়েছে। মাত্র একসের গমের বদলে জ্যোতিষী এত অমূল্য কথা বলেছেন, ভাবা যায়! দাদুর অটুট বিশ্বাস! গত জন্মের জমিদারীতে টিউবওয়েল থেকে 'বগ-বগ' করে জল বেরুতো। এসব শুনে নিহংগমামা বলে, কালো বলদের মতন খেটে আমি আপনার ঋণ চুকিয়েছি বাবা, আপনার মতন আড্ডা মেরে বড় বড় হাঁক দিয়ে যদি সময় নষ্ট করতাম তাহলে আপনার খোড়া কুয়োয় ডুবে মরতে হতো। নিজের ভাই-ভাইপোদের নিয়ে কী কী করেছেন তা সবাই জানে!

ওর কথা শুনে দাদু রেগে বলে, আচ্ছা আচ্ছা, আমি আপনাদের মত নাগরিকদের জন্যে খালি পুকুরই খুঁড়েছি, তাই না? আরে কুড়ের বাদশা, তুই যদি প্রথম থেকেই বদমাইশি ছেড়ে পরিষ্কার মনে কাজকর্ম করতিস্ তাহলে কবেই তোর বিয়ে হয়ে যেত। এখন অযথা কুতর্ক করছিস্!

আমি জানি এরকম সময়ে দাদুর মন অস্থির হয়ে পড়ে। শুধু একটা স্বপ্নকে তিনি আগলে ধরতে চান। কবে? কবে এই জন্মের শরীর পাল্টে তিনি আগ্রার কাছাকাছি যমুনা তীরের মাটিতে জন্ম নেবেন!

জ্যোতিষী বলেছিলেন, সামান্য কাশি আর জ্বর হবে যজমান, এতেই তুমি এই শরীর ত্যাগ করবে! এক সুখময় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাদু মহানন্দে দিন গোনে।

— বাবা, আজ তোমার কী হলো? এখনো তেমনি থম মেরে বসে আছো? হ্যাপী আমাকে ধরে জোরে ঝাঁকায়। ও মায়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করে, ওর দাদার সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়াই করে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমাকে জোরে ঝাঁকিয়ে বলে, অশ্বত্থ গাছের গল্প মনে না থাকলে কর্ম-ধর্মের গল্পটা শোনাও! অতীতের স্মৃতিস্রোত থেকে মাথা বের করে আমি জিজ্ঞেস করি, সে আবার কোন্ গল্প?

হ্যাপী বলে, ঐ যে কর্ম বলে, আমি বড়! ভাগ্য বলে, আমি বলবান! ধর্ম বলে, আমি সত্যের প্রতীক!

মায়া চোখ নাচিয়ে বলে, — আরে, আমার থেকে বড় কে আছে? রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে ওরা বিচার চায়। বীর বাজা ভাগ্যের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েও বিচার করে বলেন, নিজের নিজের মতন আপনারা সবাই বলবান!

আমি ভাবি, হ্যাপীর বয়স সবে নয় বৎসর। বয়সের তুলনায় ওর চিন্তাভাবনা, কথাবলা বেশ গোছানো। ওর বয়সে আমি দাদুর কাছে গল্প শুতাম ঠিকই, কিন্তু অনেক কিছুই এত সুন্দর করে বুঝতাম না!

দাদু বরাবরই বেশ জোরে কথা বলতেন। রাশভারী মানুষ। যতদিন দিদিমা বেঁচে ছিল রোজ ওকে একসের দুধ খাওয়াত। ঘরে তৈরী ত্রিফলার গুড়োই ছিল ওর সর্বরোগহর ঔষধ। কোনদিন আর কিছু খেতে দেখিনি। প্রতি বছরই গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদু-দিদিমার কাছে যেতাম। দাদুর গল্প ও জীবন-দর্শন আমাকে পরিণত করেছে। পড়াশুনা শেষ করে আমি চাকুরী পেয়েছি। কিন্তু দাদু শেষদিন অব্দি একইরকম আদর করতো। গল্প শোনাত।

একবার এক ভ্রমণ দলের সঙ্গে আমি দিল্লী-আগ্রা ঘুরতে যাই। দাদু না জানি কোথা থেকে খবর পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠায়। — আরে, অমর সিংহ, তুই দিল্লী-দক্ষিণ ঘুরে এসেছিস. ওখানে কী কী দেখেছিস্?

আমি দিল্লী, আগ্রা এবং ফতেপুর সিক্রি ঘোরার বর্ণনা করি। মথুরার পেঁড়ার অপূর্ব স্বাদ আর পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্যের কথা বলি। বাঁদর আর মন্দিরের গল্প করি। আবার পেঁড়ার স্বাদের কথা বলি। দাদু এতক্ষণ আগ্রহ নিয়ে হু, হুম করছিল। এবার অধৈর্য হয়ে বলে, আরে শালা,পেঁড়া কী আমার মাথায় মারবো? তোর কাছে কোন কাজের কথা থাকলে বল!

ওর মনের কথা বুঝে আমি মরুভূমির বর্ণনা দিই! আমার কথা শুনে দাদু হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আরে কোথাও তো ফসল হয়, নাকি সমস্ত জমিই বন্ধ্যা?

আমি কী বলবো ভেবে পাই না। দাদুই বলে, তুই ভালমত দেখিসই নি, শুধু কতগুলি স্মৃতিস্তম্ভ মন্দির মসজিদ দেখে আর পেঁড়া খেয়ে চলে এসেছিস্! আর একবার যা, ভালমতন সব খোঁজখবর নিয়ে আয়! তোর মামার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে যাস্।

ওর ব্যগ্রতা দেখে আমার হাসি পেয়ে যায়। জ্যোতিষীর বলা ৮৭ কিম্বা ৮৮ বছর কবে পেরিয়ে তখন ওর ৯৮ বছর বয়স চলছে। কিছুদিন পর সত্যি সত্যি সপরিবারে আবার আগ্রা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরে এলে দাদু আমাকে জিজ্ঞেস না করে এবার আমার বড়ছেলে দীপীকে কোলে টেনে নিয়ে বলে, দীপে বেটা, আমার সোনাছেলে, পুরো যাত্রার গল্পটা শোনা বাবা! ওখানকার মানুষজন কেমন মান-মর্যাদা দিয়ে কথা বলে? ফসল কেমন হয়? দীপী ওকে ঘাগড়াপরা মহিলা আর কাছা দিয়ে ধুতি পরা পুরুষদের গল্প শোনায়। গল্প শুনে দাদুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। — কোন ব্যাপার না, এখানেও আগে লোকেরা ঘাগড়া আর ধুতিই পরতো। দীপী ওকে দিগন্ত বিস্তৃত সর্ষে আর লাই-এর ক্ষেতের কথা বলে। কোথাও কোথাও তো গমের ক্ষেতও দেখেছি!

— হুই শাবাস্। চারপাইয়ে শুয়ে থাকা দাদু নিজের বয়স ভুলে তড়াক করে উঠে বসে। কোমরে লাগা মোচড়কে পাত্তা না দিয়ে বলে, শাবাস্ বেটা, তুই হলি মাই-কে লাল, আমাকে দা-রু-ণ আনন্দ দিলি তুই।

মনশ্চক্ষে ডগমগে ফসল দেখতে পেয়ে দাদু যে কী আনন্দ পেয়েছে তা ওর কথা বলার উচ্ছ্বাসে বোঝা যায়!

— তাহলে তো খুব ভাল জমি হবে ভাই! জাটের কাছে যদি লাঙল চালানোর আর বীজ বোনার মতন খোলা জমি থাকে তো ও কারো পরোয়া করে না। তুই সর্ষে আর লাই-এর ক্ষেতের কথা বললি, যদি শুধু ঘাস, আগাছা ও কাশের বন থাকে তাহলেও জমি উর্বর হয়। আমাদের পাঞ্জাবেও তো আগে শুধু সর্ষে, লাই আর জৌ-চানাই হতো। শ্রাবণ মাসে মাসকালাই মুগ মসুর আর জোয়ার বাজরা হতো। আর এখন দেখ, আমরা কেমন বছরে তিন ফসল নিচ্ছি!

পাঞ্জাবে আতঙ্কবাদের সময় একদিন বড়মামা মজা করে দাদুকে বলে, আরে বাপু একটা কথা মনে রেখ, তোমাকেও ওখানে ধুতি-টুপিই পরতে হবে!

দাদু হেসে বলে, কোন ব্যাপার নয়, আমি ধুতি ভুলিনি, এই জোড়া পাইপের মতন পায়জামা তো অনেক পরে এসেছে। এখন আর দাদু মামার সঙ্গে রেগেমেগে কথা বলে না। আগের কারেন্ট আর নেই! নিহংগ মামা চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাছা মেরে ধুতি পড়লে তোদের দাদুকে কেমন লাগবে রে? নিহংগ মামাকেও এখন দেখতে দাদুর মতনই বুড়ো লাগে।

দাদু বলে, তোকে একশোবার বলেছি আমার সামনে আসবি না। ধুতি-টুপি নিয়ে উপহাস কেন? এগুলি সবই তো নগ্নতা ঢাকার উপায়— মূর্খ কোথাকার! নিহংগমামা হাসি থামিয়ে একপাশে বসে পড়ে।

ছয়মাস-নয়মাসে ওকে দেখতে গেলে মিস্‌রী, আঙুর, বাতাসা বা এলাচীদানা নিয়ে যেতাম। দাদুর চোখ চকচক করে উঠতো। মুঠি ভরে মুখে দিয়ে মহানন্দে খেতে খেতে বলতো, মরে গেলে তুই আমার অস্থি গঙ্গামায়ের বুকে বিসর্জন করিস্।

নিহংগমামা চোখ টিপে বলে, পেলে তো। ও আসার আগেই—

দাদু ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, আরে আপনারা শিখেরা এত কষ্ট করবেন কেন? তারপর ভারী আওয়াজে বলে, এখানেই কোথাও গভীর নলকূপের চৌবাচ্চায় অথবা সরহন্দ নহরের জলে ফেলে দিস্ — এই মাইলখানেকের মধ্যেই আমি থেকে যাব। দেখিস্ পাঁচ পীরকে প্রণাম করতে ভুলিস্ না যেন। অন্যসময় হলে শ্লোক আউড়ে বলতো,গঙ্গা গয়ে বগের ন গতি হোয়!

এখন কি ওর স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়েছে? আমি আঙুর মুখে নিয়ে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি কনখলের গঙ্গায় যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন?

আহত আওয়াজে দাদু জবাব দেয়, কী করি ভাই, এরা তো কেউ নিয়ে যাবে না। তুমিই আমাকে গঙ্গামায়ের বুকে নিয়ে যাওয়ার·দায়িত্বটা নাও অমর সিংহ। তোমার মামা তো শুধু মজা করতেই জানে! এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ মেরে বলে, যদিও দুনিয়ার লোক বলে মেয়ের ঘরের নাতি হারামখোর হয়!

বুড়োকে শান্তি দেওয়ার জন্যে আমি কথা দিই যে ওর অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করবো। এতে অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে ওর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দাদু আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এতদিনে ওসব অঞ্চলে নিশ্চয়ই জলসেচের ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাই না রে? ওর আওয়াজে অতি আন্তরিক কুশল জানার মতন আগ্রহ।

আমিও আন্তরিক জবাব দিই, এখন তো দাদু ওখানেও কোথাও কোথাও মোটর লেগে গেছে। তবে সেচের নালাগুলি হাল চালানো জমির বুকে হালের দাগের মতন সরু সরু। দাদু দারুণ উৎসাহে আগের মতন রাশভারী আওয়াজে বলে, আগে এখানেও এমনি ছিল, অগভীর নলকূপের জল দিয়েও কাজ চালাতে হতো, তবু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পরিশ্রম করে আমরা *আধাকীলা ক্ষেত সিঞ্চন করেই নিতাম। ভাল হয়েছে, ওখানে জলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, চাষের জমিও তৈরী, তুমি বললে, ভাল ফসলও হচ্ছে, পরিশ্রম করার জন্যে আমিও তৈরী, তাছাড়া কৃষক হবো নিশ্চয়ই! বয়স্ক মাথার ভারে দাদুকে খুশীতে ডগমগ করতে দেখে মামা মুচকি হাসে।

দীপী-হ্যাপীর মা রান্নাঘরের কাজ সেরে এঘরে এসে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে,— হায়রে আমার মরণ! বাচ্চাটা গল্প শোনার অপেক্ষায় তোমার পাশে বসে ঘুমিয়েই পড়লো, একবার তাকিয়েও দেখলে না, কী ভাবছো ধ্যানমগ্ন হয়ে?

আমি ওর কথা শুনেও শুনি না। আমি যে এখনো বাস্তব দুনিয়ায় ফিরিনি। দাদুর রূপকথার আবর্তে দেখতে পাই স্বর্ণকারদের রোদবরণ কন্যা আর ছদ্মবেশী মন্ত্রীপুত্র, কাশের বনে বিশাল অশ্বত্থের নিচে দাঁড়িয়ে। কন্যা গাছে চড়ে আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে বলে, খোদা কে বান্দে, চলো! আর দেখতে দেখতে চড়চড় শব্দে মাটি ছাড়িয়ে অশ্বত্থ গাছ আকাশে উড়ে চলল।

আমি দেখতে পাই দাদুর খোলা সাদা দাড়ি উড়ছে। শিকড়টা আঁকড়ে ধরে তিনিও উড়ে যাচ্ছেন পূর্বদেশের দিকে।

রচনাকাল ১৯৯৭

* চমকৌর : রোপড় জেলায় অবস্থিত। এখানে গুরু গোবিন্দ সিংহের বড় ছেলে শহীদ হয়েছিলেন। * লসুরের : লসুর। * পঞ্জীরী : আটা, ঘি, চিনি, পেস্তা, বাদাম, কাজু, আখরোট, শুকনো আদা, এলাচি, দারচিনি মিশিয়ে তৈরী এক গরম শক্তিবর্ধক খাবার। * নিহংগ : খালসা পন্থের প্রতীকী ধর্মসেনা। এদের পোষাক নীল জোব্বা, নীল পাগড়ি, কোমড়ে হলুদ ফেট্টি আর পঞ্চ 'ক' ধারণ করে অমৃত ছকা মানুষ সব। তিনশো বছর আগে গুরু গোবিন্দ সিংহ এই বাহিনী বানিয়েছিলেন। *আধাকীলা : আধা একর।

মনমোহন কৌর

মাকড়সা

বিছানায় আধশোয়া ক্যাথরীন ফুঁসছে। বাবা মায়ের উপর ভীষণ রাগ। ওর বাবা সেনাবাহিনীর মামুলি সিপাহী। অথচ প্রত্যেক ছুটিতে এসে ওর ভালবাসার (?) একটি বীজ পুঁতে যায়। মাও মেশিনের মতন প্রতিবছর পয়দা করে। কোন্‌টা বাঁচে, কোনটা মরে। বেঁচে মবে তবু ওরা এখন ছয়জন। এক সিপাহীর বেতনের পয়সায় ছয়টা সন্তানের প্রতিপালন কি সহজ কথা? সেজন্যেই মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে ক্যাথরীনকে কাজে বেরুতে হয়। এখন ওর বয়স ২৩ বছর। ওভাবে অথচ মা বাবার আমাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই,হবেই বা কেন? প্রতিমাসের রোজগার থেকে পাঁচশো টাকা করে হাতে তুলে দিই যে! প্রতিবেশীর গরুটীকে ডাক দেওয়ানো নিয়ে ওর মা যতটা চিন্তা করে, প্রতিবেশীনিকে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজের মেয়েদের জন্য বর খোঁজার কোন উদ্যোগই নেই! ক্যাথী কখনো মা-বাপের বিরোধিতা করলে মা শোনায়, "তোদের জন্ম দিয়েছি, বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি!" যেন জন্ম দিয়ে সন্তানদেরকে কৃতার্থ করেছেন।

মাঝেমধ্যেই ও ভাবে প্রতিবেশীর গরুটার মতন দড়ি ছিড়ে ফিলিপের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্তু ফিলিপ! ফিলিপও তো দিনরাত কেবল তাসের প্রাসাদ বানায়। ও বলে, 'ক্যাথী... ক্যাথী, একবার ভারতীয় ক্রিকেট টিমে সিলেক্ট হয়ে যাই, তারপর দেখো দিনের বেলাতেই আকাশের তারা পেড়ে আনবো, তোমার পায়ের তলায় ধনসম্পত্তির ঢের রেখে দেবো!'

ফিলিপের বয়স এখন পঁচিশ। লম্বা শরীর আর মজবুত কাঁধের অধিকারী পাঞ্জাব দলের ডাকসাইটে খেলোয়াড়। সে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজের কীর্তি স্থাপন করবে এতে অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাথী আর কত অপেক্ষা করবে? ফিলিপ ওকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে 'ভুনা কাবাব' আর কালো চা খাইয়ে ওর মাথা ঠাণ্ডা করে। ওর স্নেহস্পর্শে আর ভবিষ্যতের সোনালি মুহূর্তগুলির কথা ভেবে ক্যাথী চুপ থাকে। ফিলিপ স্বপ্ন দেখায়, 'বিদেশ থেকে যখন খেলে ফিরবো, তোমার জন্যে দারুণ সব বিদেশী পোষাক, গয়না আর মেডেল নিয়ে আসবো" ক্যাথী ভাবে, কিন্তু কবে আমার ভাগ্যে এমন সোনালি দিন আসবে? কবে আমি অনেক টাকার সুখ পাবো?

ক্যাথরীন ডা: স্মিথের বাসায় কাজ করে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার। তাই ওদের বাসার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ক্যাথীর ওপর। একদিন কাশ্মীর থেকে ওদের কোটিপতি আত্মীয় সিমেইন

বেড়াতে আসে। ও বেশক'টা আপেল বাগানের মালিক।

সিমেইন ওর মাকে ভীষণ ভালবাসে। তিনি এখন শয্যাশায়ী। সিমেইন এখানে ভাল কাজের লোকের সন্ধানে এসেছে। এখানে ক্যাথীকে দেখে ওর খুব পছন্দ। সে ডাক্তার দম্পতির সম্মতি নিয়ে ক্যাথীর বাবা-মাকে আটশো টাকা মাসিক বেতনের লোভ দেখিয়ে রাজি করে ফেলে। লোকটার ব্যবহার খুব ভাল। ক্যাথীও সেজন্যে রাজি হয়ে যায়। কাশ্মীরে সিমেইনের বেশ কয়েকটা সুন্দর বাংলো রয়েছে। যেতে যেতে দুপাশের সুন্দর পাহাড়শ্রেণী আর সুশোভিত উপত্যকা ওকে বিমোহিত করে। এর আগে ডাক্তারবাবুর বাড়ির রঙিন টিভিতে দেখে ও কাশ্মীরকে যত সুন্দর ভেবেছিল বাস্তবে প্রকৃতি তার থেকেও সুন্দর। কলকল ঝর্ণার সৌন্দর্য অনুপম, উপত্যকার সবুজ পোশাক মখমলের কার্পেটের মতন লাগে। ক্যাথী জীবনে প্রথম পাহাড়ি পথে বাস জার্নি করছে। ওর গা গুলায়, কিন্তু প্রকৃতির মনমোহক আপ্যায়নে ও দুচোখ বন্ধ করতে পারে না। আর্থিক কারণে ও দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু শিল্প ও সৌন্দর্য ওকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

ক্যাথরীন সীমেইনের আলিশান বাংলোর ঠাঁটবাট দেখে হা হয়ে যায়। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে আমার ফিলিপ কি কোনদিন এরকম বাংলো বানাতে পারবে ? ও পরমুহূর্তেই ভাবে, না পারুক। আমাদের ছোট একটা তিন কামরার পাকাবাড়ি হলেই যথেষ্ট! এত বিশাল বিশাল ঘর বারান্দা দিয়ে আমরা কী করবো ! তবে হ্যাঁ, এমনি ঘাসের লন, ফুলের বাগান, লনে পাতা আরাম কেদারা আর দোলনা যদি ফিলিপ ওর জীবনে এনে দেয় তাহলে ওর মতন সুখী আর কে হবে !

ও কিছুদিনের মধ্যেই এ বাড়ির সব দায়িত্ব বুঝে নেয়। সীমেইনের মায়ের দেখাশোনা, সময় মতন আহার - ঔষধ দেওয়া আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই ওর প্রধান কাজ। সীমেইন রোজ রাতে মদ খেয়ে টলতে টলতে ঘরে ফিরে ওর কাছে মায়ের শরীর স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে সামান্য খাবার মুখে ঠেকিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে। সারাদিনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন শব্দ ওকে উচ্চারণ করতে শোনেনি ক্যাথী।

ওর জন্যে দয়া হয়। ভদ্রলোক কোনদিন ওর দিকে খারাপ নজরে তাকায়নি। গত চারমাসের চাকরিতে দুবার বাড়ি যেতে দিয়েছে। ওর মা-বোন আর ভাইরা খুব খুশী। সীমেইনও ক্যাথীর কাজে সন্তুষ্ট। ওকে টাকা ছাড়াও ছুটি যাওয়ার সময় ভাল হাতখরচ দেয়। কিন্তু একবারও ক্যাথী ফিলিপের দেখা পায়নি। ওর স্বপ্ন অনেকটা সাকার হয়েছে। ও সত্যি সত্যি ভারতীয় ক্রিকেট টিমে নির্বাচিত হয়ে বিদেশে খেলতে গেছে।

ক্যাথীর মনে হয় কাশ্মীরে চাকরি পাওয়ার পর থেকে বাড়ির সবাই ওকে আগের থেকে অনেক বেশী ভালবাসতে শুরু করেছে, যদিও ওর কাছে এই ভালবাসা মেকি বলে মনে হয়, ভাল রোজগারের জন্যেই আজ ওর কদর বেড়েছে।

দেখতে দেখতে শীতকাল এসে যায়। তুষারপাত শুরু। শীতের দাপটে সীমেইন এর মায়ের স্বাস্থ্যে অবনতি হলে ওরা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পংরবুর গ্রামের বাংলোতে চলে যায়। এখানে কেসরের চাষ হয়। সাদা বরফের মধ্যে কেসরের লাল লাল শিস ক্যাথীর দারুণ লাগে !

ক্যাথীর কাজে খুশী হয়ে সিমেইন ওকে বেশ কটা দামী রেশমি শাড়ি এনে দেয়। ক্যাথী এখন এই বাড়িতে কত্রীর মতন থাকে, যে কোন জিনিস ও নিজের মতন ব্যবহার করে। কাশ্মীরের স্বচ্ছ জল তাজা হাওয়া আর সদাবাহার প্রাকৃতিক পরিবেশে ও আরো ফর্সা এবং সুন্দর হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যও ভাল হয়। মাঝে মধ্যেই ও লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে চুল ছেড়ে দেয়। তারপর বিছানায় পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে ফিলিপের কথা ভাবে। ফিলিপের আলিঙ্গন, ওর আদর ও চুম্বনের অভিলাস ওকে উত্তপ্ত করে দেয়। ডানলপের গদি ও বালিশে এ পাশ ও পাশ করতে করতে ও

ভাবে, ফিলিপ, আমার ফিলিপ, কবে এসে আমার এই উত্তাপ তুমি নিরসন করবে ? ও ভবিষ্যতের স্বপ্নিল কল্পনার সমুদ্রে ডুব দিয়ে অতলে তলিয়ে যায় ।

সেদিন সকাল থেকে লাগাতর অঝোরে তুষারপাত হচ্ছিলো । সন্ধ্যা হওয়ার আগেই স্থানীয় চাকর তাই ওর অনুমতি নিয়ে বাড়ি চলে যায় । ওকে অনেকদূর পায়ে হেঁটে যেতে হবে । কিন্তু ও যাওয়ার পর থেকেই ওর বুক ধড়ফড় করে । মন কেমন করে । দুদিন ধরে সিমেইন বাড়ি ফেরেনি । ও অনেকক্ষণ মায়ের বিছানায় বসে ওর চুল আঁচড়ে দেয় । মাথা নেড়ে দেয় । কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়লে ও আর কী করবে বুঝে উঠতে পারে না । ভীষণ একা লাগে, কখনো চেয়ারে বসে কখনো বিছানায়, আবার উঠে ঘরময় পায়চারি করে । না-জানি কতক্ষণ পর হঠাৎ গাড়ির শব্দ শোনে, আতিশদানের আগুন তখন ঝিমিয়ে পড়েছে । ও স্লিপার পায়েই ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দেখে দুজন লোক সিমেইনকে পাঁজাকোলে করে আনছে । ওকে দেখে বলে, — " ম্যাডাম , ইনি নেশায় অচৈতন্য হয়ে রাস্তার পাশে পড়েছিলেন, পকেটে পরিচয়পত্র দেখে আমরা উঠিয়ে এনেছি "।

ওরা সিমেইনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে যায় । ওর হাত-পা ঠান্ডায় জমে গেছে । না জানি কতক্ষণ ও বরফের মধ্যে পড়ে ছিল কে জানে ! ও ডাক্তার ডাকার জন্যে টেলিফোন উঠিয়ে দেখে টেলিফোন কোন কারণে খারাপ । ও এখন কী করবে ? ইলেকট্রিক সাপ্লাই না থাকায় রুম হিটারও জ্বলছে না । ও দ্রুত গিয়ে আতিশদানে আরো শুকনো কাঠ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে তোলে । রান্নাঘরে গিয়ে জল গরম করে তিনটে বোতলে ভরে । দু টো বোতল সিমেইনের পায়ের তলায় লাগিয়ে তৃতীয়টা বুকের উপর রেখে পর পর দুটো লেপ চাপায় । তার উপর কম্বল । কম্বলের নীচে গরম জলের বোতল দুটিকে পায়ের ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ও তেল গরম করে পায়ের তলায় মালিশ করতে থাকে । তেমন লাভ হয় না । অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ওর শরীর গরম হয় না । বুকে কান ঠেকিয়ে নিয়মিত হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যায় না । ও আর সময় নষ্ট না করে নিজের মুখ সিমেইনের মুখে ঠেকিয়ে গরম শ্বাস দিতে শুরু করে । কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে লোকটা পাথরের মতন পড়ে থাকে । ক্যাথী ঘাবড়ে কেঁদে ফেলে । এখন ও কী করবে ?

হঠাৎ ওর মনে পড়ে অনেক বছর আগে এক শীতের রাতে ওর ভাই ঠান্ডা জলের চৌবাচ্চায় পড়ে গেলে — ওকে ও উঠিয়ে এনে লেপকম্বল মুড়ি দেওয়ার পরও শরীর নীল হয়ে গেছিল । তখন ওর বাবা ভাইকে নিজের লেপের ভেতর নিয়ে জড়িয়ে ধরে শরীরের উত্তাপ দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তোলে । একথা মনে হতেই ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় । মালিককে বাঁচানোর একটাই পথ — চেষ্টা করে তো দেখা যাক । ও লেপের তলায় ঢুকে পড়ে সিমেইনকে জড়িয়ে ধরে । ধীরে দুজনের জামাকাপড় খুলে ফেলে ।

সিমেইন একটি কাটা গাছের মতন নিথর । ক্যাথীর মনে পড়ে ইতিহাসে পড়েছে , আদিম মানবরা শুকনো কাঠে পাথরে ঘষা লাগিয়ে আগুন জ্বালাতো । জীবনে প্রথম কোন নগ্ন পুরুষ শরীরের উপর নিজেকে ঘষতে ঘষতে ওর শরীরেও আগুন ধরে যায় । আর ও সীমেইনকে যৌনভাবে আদর করতে শুরু করে । ওর প্রতিটি অঙ্গের উষ্ণতা সিমেইনের শরীরে প্রবেশ করে । ধীরে ধীরে ওর শ্বাস চলতে শুরু করে । হাত পা গরম হয় । ধীরে চোখ খুলে সিমেইন ক্যাথরীনের দিকে তাকায় । ও তখন উন্মাদের মতন ওকে জাগানোর চেষ্টায় চুমু খেয়ে যাচ্ছে । সীমেইন টের পায় দীর্ঘদিন শুয়ে থাকা শিরা উপশিরা টানটান হচ্ছে, ওর শরীর শিথিল হচ্ছে, কাম প্রচন্ড এবং প্রবল হয়ে উঠছে । তখনই ওর চোখে চুমু খেতে গিয়ে ক্যাথরীন দেখে ও তাকিয়ে আছে । ও লজ্জায় সরে যেতে চায় । কিন্তু সিমেইনের হাতের বাঁধন তখন শক্ত । ক্যাথরীনের চামড়া এত নরম এবং কোমল তা সিমেইন এতদিন জানতো না । ওর শরীরে এত আনন্দ ও উত্তাপ যে

লুকিয়ে আছে তা কে জানতো। ধীরে ধীরে ক্যাথীর সঙ্গে ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা ছন্দ তৈরী হয়। এক অজানা স্বর্গ পাওয়ার জন্য এক অনাস্বাদিত অমৃতকে এক চুমুকে শুষে নিতে চায়। এহেন স্বর্গীয় সময়ে প্রকৃতি যেন হঠাৎ থেমে যায়। ক্যাথরীন তখন একবার ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজের কুমারিত্ব বজায় রাখার অসফল চেষ্টা করে কিন্তু সীমেইনের কামদেব তখন এত প্রবল যে সেই বাঁধা খরকুটোর মতন ভেসে যায়।

অনেক অনেক ধনসম্পত্তির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজের যৌবনের মহামূল্যবান মণিমুক্তো হারিয়ে থমথমে শীতল কুয়াশাভরা সকালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলো তখন একটা মজবুতপুরুষ হাত ওর কাঁধে আলতো চাপ দেয়, ক্যাথী, ক্যাথী ডার্লিং — আমার ক্যাথী! রাতে যা করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত! ক্যাথী ওর হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে....! ও ঝুঁকে ও ক্যাথীর কপাল ও চোখের পাতায় চুমু খেয়ে বলে, — "ঠিক এমনি করে কাল তুমি আমাকে আদর করেছো, ক্যাথী আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমার উপহার কখনো ভুলবো না, তখন হঠাৎ আমার যে কী হয়েছিলো!" সীমেইনের দুগাল বেয়ে অশ্রুবিন্দু পাথর হয়ে পড়া ক্যাথরীনকে ভেজাতে থাকে। ও বলে, "ক্যাথরীন তুমি আমাকে এমন স্বর্গ উপহার দিয়েছো তোমার ভালবাসার দোলায় সারাজীবন দুলতে চাই, তোমাকে বিয়ে করতে চাই!"

সীমেইন তার সমস্ত ধন দৌলত ক্যাথীর পায়ের কাছে সঁপে দেয়। ক্যাথীর দু'চোখ থেকে দুটি মুক্তোবিন্দু বেরিয়ে দু'গাল বেয়ে সীমেইনের ঐশ্বর্যে পড়ে মিলিয়ে যায়। এই সেই ঐশ্বর্য, যা পাওয়ার জন্য ওর মনে কত না আকাঙ্ক্ষা ছিল। আজ সে তা পেল শরীর ও মন এঁটো করে!

পরদিন সকালে দু'জনে চার্চে গিয়ে বিয়ে করে। তারপর কতদিন ধরে সীমেইনের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। অনুপম সব সরোবর, দারুণ সুন্দর ঝর্ণা, বরফগলা জলে দুধসাদা হাঁসের মতন ছোট বড় বরফের চাইগুলি ভেসে যায়। ঘন অরণ্য,সারিসারি বৃক্ষলতাগুল্ম পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে জড়জড়ি করে থাকে। এত সুন্দর সব দৃশ্য! ক্যাথীর ইচ্ছে করে ফিলিপকে এসব ডেকে দেখাতে। আহা ফিলিপকে সঙ্গে পেলে এসব পরিবেশে ও যেন হাতে স্বর্গ পেত! তাহলে ফিলিপই ওর যৌবনকে যথাযথ শাসন করতো!

তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই ও ভাবতো, কী করে সীমেইনের থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে! এখনো ও মা-বাবাকে নিজের বিয়ের কথা বলেনি। পংরবুর ফিরে এসে থেকে ও একা সময়ে মুক্তির উপায় ভাবে। সীমেইনের সিন্ধুক ও আলমারীর চাবি তো ওর কাছেই। শুধু ঘরে যা আছে তা নিয়ে কোনমতে পালিয়ে গেলে ফিলিপকে নিয়ে সংসার পেতে সারাজীবন খেয়েও তা ফুরাতে পারবে না।

কিছুদিন পর মায়ের চিঠির খামে করে ফিলিপের চিঠি আসে। চিঠি পড়ে ও ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। ফিলিপের লেখা প্রত্যেকটি শব্দ ওর মাথায় ঘুরপাক খায়। ...." আমার ক্যাথী,..... তুমি অনেক টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে, আমি তোমার জন্যে নিজের পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে আনছি, এখন সারা পৃথিবীর ক্রিকেটপ্রেমীরা আমাকে চেনে, সত্যি বলছি, অনেক মিষ্টি মিষ্টি দেশীবিদেশী মেয়ে আমার চার ছক্কার মারে মুগ্ধ হয়ে আমাকেই মোহিত করতে চেয়েছে — কিন্তু আমি তো শুধু তোমার! এ কতদিন হয়ে গেল, তোমাকে দেখিনি বল! কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরছি এবার আমাদের বিয়ের কোন অসুবিধে নেই!

ওফ্! আমার ফিলিপ! ও ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে। ফিলিপ........ এখন আমি আর তোমার যোগ্য নেই! আমার পেটে এখন সীমেইনের সন্তান। একথা মনে মনে ভেবেই ওর হঠাৎ শরীর কেমন করে, হাত পা আড়ষ্ঠ হতে থাকে, এক অদ্ভুত ঢেঁকুর ওঠে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

জ্ঞান ফিরে দেখে মাথার কাছে সীমেইন। ও ধীরে ওর গাল ও কপালে হাত বোলায়। তারপর বলে, ক্যাথী,......... তোমার শরীর বরফের মতন ঠান্ডা ... নাও একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নাও, চাঙ্গা হয়ে উঠবে! সীমেইন ঐ ঘরের কোণে কাচের ছোট্ট বার থেকে পেগ, গ্লাস আর ব্র্যান্ডির বোতল আনতে যায়। ক্যাথী দেখে ওর পাশেই ফিলিপের আধখোলা চিঠি! ও চমকে সেটাকে ক্ষিপ্রহস্তে উঠিয়ে মাথার বালিশের নীচে চাপা দেয়। তারপর সীমেইনের দিকে তাকায়। সীমেইন ফিরে এসে পেগ বানাতে শুরু করলে ক্যাথী না জানি কেন আবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। সীমেইনের গলা দিয়ে ক্লান্ত আওয়াজ বেরোয়। ও বলে, ক্যাথরীন, আমার দিকে তাকাও!.. আমি ফিলিপের চিঠি পড়ে নিয়েছি। আমি নিজেকে তোমার ভালবাসার শত্রু, অপরাধী মেনে নিচ্ছি। তোমাদের বিরহ আমার কাছে অসহ্য! ভুলের মাশুল হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে করে দিয়েছি, শুধু মায়ের জন্য খারাপ লাগে, ও তো নদীতীরের শুকনো গাছের মতন একা, যতদিন বেঁচে থাকবে দু'বেলা দুটো করে রুটি বানিয়ে দিও তাহলেই তোমার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো! অবশ্য এব্যাপারেও আমিকোন জোর করবো না.... ক্যাথী, আমি তোমাকে ভালবাসি,তোমার উপর আমার কোনরকম অভিযোগ নেই, আমি তোমাকে যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করছি!"

ক্যাথী পাথরের মূর্তির মতন নীরব চাহনিতে সীমেইনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ক্যাথী ক্যাথী!' সীমেইন ঝুঁকে ওর ঠোঁটে দীর্ঘচুম্বন খেয়ে আর ওর চোখের সামনেই আংটির ঢাকনা সরিয়ে ছোট্ট কৌটো থেকে কী যেন মুখে পুরে নেয়। ক্যাথীর ভেতর থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার বেরোয় —"আমার মালিক,... একী করলে তুমি... আমি... আমি তোমার সন্তানের মা হতে যাচ্ছি!"

একথা শুনে সীমেইনের চোখের দৃষ্টি একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দুফোঁটা চোখের জল ওর থুতুনিতে গড়িয়ে পড়ে আর তারপরই ওঁর মাথা একদিকে হেলে পড়ে।

তারপর থেকে ক্যাথী মূর্তিমতী শোকের প্রতিমা। সীমেইনের মৃত্যুর সঙ্গে ওর আত্মার সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। ক্যাথী কোনভাবেই নিজেকে ক্ষমা করে উঠতে পারে না! ছেলের শোকে সীমেইনের মা-ও এখন একরকম বিছানার সঙ্গে লেপ্টে গেছে। ক্যাথী নিজের মাকে এ সব কিছু বিস্তারিত লিখে জানায়।

—"মা, আমি আর ফিলিপের যোগ্য নেই....... আমি জানি ফিলিপ আমার বিরহ সহ্য করতে পারবে না, হয়তো আমার এ সিদ্ধান্ত ওকে পাগল করে দেবে! কিন্তু তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো, আমার অবস্থা এখন মাকড়সার মতন— যে শিকার ধরার জন্য জাল বুনতে থাকে কিন্তু একদিন নিজেই সেই জালে আটকে মারা যায়।

রচনাকাল : ১৯৯৬

প্রেম গোরখী

রামপুরাফুলের টিকিট

দাঁতের নীচে জিভ চেপে জস্‌সী এদিক-ওদিক মনোযোগ দিয়ে দেখে, কিন্তু ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায় না। দুর্বল ব্যথাভরা হাতে কোনমতে পোশাক ঠিক করে। শরীর যেন দুভাগে চিরে গেছে। ঝলসে যাওয়া পা দুটিকে টেনে হিঁচড়ে এক করে কোনমতে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়ায়। শীতল মেঝেতে পা রেখে দাঁড়াতেই মাথা ঘোরায়, ও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায়। তারপর হাতিয়ে হাতিয়ে বিছানা থেকে ওড়না খুঁজতে গিয়ে হাতে কয়েকটা ভাঙ্গা চুড়ির টুকরো ঠেকতেই চমকে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে বিছানায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে মানুষের আকার নিলে ওর আবার মাথা ঘোরায়, এখুনি ধসে পড়বে বলে মনে হয়। ও অনেক কষ্টে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালিয়ে দেখে মদের নেশায় চুর ওর দেওর তেজীর শরীরে একটি সুতো ও নেই। আলো জ্বলতেই ও পাশ ফেরে। কোমর অব্দি চাদর টেনে নিজেকে লুকায়। তারপর ধস্তাধস্তিতে খুলে পড়া চুলের বাঁধন ঠিক করে লাজুক দৃষ্টিতে পিটপিট করে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা বৌদির দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলে, "কিচ্ছু হয়নি, ... আমি বলছি কিছুই হয়নি... এমনভাবে তাকাচ্ছো কেন, আমি কি পর? ... ঠিক আছে বাবা, এক্ষুণি নিজের বিছানায় চলে যাচ্ছি, তুমি এখানে শান্তিতে ঘুমাও।"

চাদরটাকে কোমরে পেঁচিয়ে তেজী ধীরে ধীরে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর জস্‌সী স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে কাদাভরা কুয়োর পাকে ধসে যেতে থাকে। একবার চারপাশে দেখে দরজা বন্ধ করে আলুথালু বিছানা, সারি সারি কাপ প্লেটে সাজানো আলমারি দেওয়ালে ঝুলতে থাকা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকায়। দেখতে দেখতে এই সবকিছু ওর কাছে অসহ্য ও কন্টকময় লাগে।

বুকভরে লম্বা শ্বাস নিয়ে দেওয়াল ও ছাদ দেখে। ছাদের মাঝ বরাবর একটা ফাটল ও দেখতে পায়। মনে হয় অচিরেই সেই ফাটল আরো চওড়া হয়ে ছাদ ধসে পড়বে, দেওয়াল ধসে পড়বে। তাই হোক, তাড়াতাড়ি সব ধ্বংস হয়ে যাক। ও গিয়ে দেওয়ালে কপাল ঠোকে, জোরে জোরে ঠুকতে থাকে। আর হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। হায় এ কী হলো, সব কিছুই তো ঠিকঠাক চলছিলো, আজ হঠাৎ তেজী কেন এরকম করলো? ওকে এভাবে লুণ্ঠিত হয়ে যেতে দেখে এই রাত থেমে গেছে। দেওয়ালের ঘড়িটা কি চলছে? ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ওর শোক আরো তীব্র হয়। ওটার কাচে ধুলো জমেছে। সুঁইগুলি যেন কয়েকশো বছর ধরে থেমে থেকে পাথর হয়ে

গেছে। অনেকবার ভেবেছে ও ঘড়িটাকে আগের মতন প্রতিদিন মুছে চকচকে রাখবে আর নিয়মিত চাবি দেবে, কিন্তু গৃহস্থীর কাজের চাপে তা আর হয়ে ওঠেনি। এ সময় কিশনের কথা মনে পড়ে। ও ঘড়িটা দিয়ে বলেছিল, "তোমার দেওয়ালে এটা যতদিন টিকটিক করে চলতে থাকবে, মনে করবে তোমার কিশনের হৃদয় তোমার জন্যে ধুকপুক করছে।"

ওর বিয়েতে অনেক উপহারের মধ্যে এই ঘড়িটাও ছিল। জস্‌সী ধীরে ধীরে পাঁচ কদম এগিয়ে অনেক কষ্টে চেয়ারে উঠে নিজের ওড়না দিয়ে ঘড়িটার কাঁচ সাফ করে। নতুন ব্যাটারি কিনে এনে লাগালেই হয়তো এটা আবার টিকটিক করে চলবে। ও ঘড়িটার কাচে কপাল ঠেকিয়ে কিশনের দুঃখী চেহারাটা ভাবে।

সেদিন কয়েক শতাব্দী ধরে পথ খুঁজে ক্লান্ত শ্রান্ত ধূলিধুসরিত কিশন ওর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়। সেদিন জস্‌সীর সাংসারিক জীবনের প্রথম লোহরী। ওর বর শহর থেকে নতুন জামাকাপড় ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতে গেছে। তেজী কয়েকজন সঙ্গীসহ আখের ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে মদ বানাতে গেছে। জস্‌সী ঘরে একা। তবু দরজায় দাঁড়ানো কিশনকে দেখে ওর চোখে যে প্রদীপ অজান্তেই জ্বলে উঠে জস্‌সী সেটাকে জোর করে নিভিয়ে দেয়। অচেনা মানুষের মতন কিশনকে চেয়ারে বসতে বলে। অথচ ওর জন্যেই জস্‌সী সেই স্কুলজীবনে বদনাম হয়ে গেছিল। দশম শ্রেণী থেকে শুরু করে কলেজ অব্দি আর তারপর চাকুরী পাওয়ার পরও কিশন শুধু ওর জন্যেই ওর মামাবাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করতো। ওকে একদিন না দেখলে দমবন্ধ লাগতো।

সেই কিশন আজ পরপুরুষ। ওকে বৈঠকে বসিয়ে রেখে জস্‌সী রান্নাঘরে গিয়ে রুটি বানায়। তারপর থালার উপর ডাল ও সব্জির বাটি রেখে পাশে ভাজ করে রুটি কিশনের সামনের টেবিলে রাখে। কিশনের চোখ চঞ্চল। জস্‌সী স্যালাডের থালাটা আনতে যাবে তখুনি হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরার মতন ওর হাত ধরে ফেলে। আমার কোন রুটির ক্ষিদে নেই জস্‌সী.... আমার তো ব্যস... তোমার হাত... শুধু তোমাকে চাই!

জস্‌সী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। ওর হাত পা থরথর করে কাঁপে। বিয়ের পর ও নিজেকে বদলে নিয়েছে। ধীরে ধীরে স্মৃতিগুলিকে মনের গোপন আলমারিতে সময়ের আস্তরণে চাপা দিয়ে বাস্তবকে বরণ করে নিয়েছে। ওর মতে সাংসারিক জীবনে পূর্ব প্রেমিকেব কোন স্থান নেই। ও তাই বিয়ের পরও এক বুক স্বপ্ন নিয়ে হাত ধরতে আসা কিশনকে বোঝায়, " না কিশী, এই হাত এখন শুধু ওর... তুমি জানো না ও কত ভালমানুষ এখন ও-ই আমাব সব কিছু।"

কিশনের চোখ জলে ভরে ওঠে। ঠোঁট থরথর করে কাঁপে। জস্‌সীরও শরীর কেমন করে। ও হাত জোড় করে বলে, ক্ষমা করো! তখন সমাজের ভয়ে আমাকে তুলে নিতে পারোনি, এখন কেন এসেছো ? ভুলে যাও, সুন্দরী দেখে কাউকে বিয়ে করো। প্রথমবার আমার বাড়িতে এসেছো... রুটিগুলো খেয়ে নাও প্লীজ, না হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে!

কিশন একবার ওর মুখেব দিকে আর একবার রুটির দিকে তাকায়। তারপর আর এক মুহূর্তও ওখানে দাঁড়ায় না। হনহন করে কয়েক মুহূর্তেই পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। জস্‌সীর কষ্ট হয়। টলমল বারান্দায় দাঁড়িয়ে না জানি কেন খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে, আবার কখনো জোরে জোরে হাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ও হাসেও না, কাঁদেও না, দুই নৌকায় পা রেখে চলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিজের ভাগ্যের পথে, স্বামী ও সংসারের দিকে পা বাড়ায়। সেই থেকে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে আর ফিরে তাকানোর সময় হয়নি। গৃহস্থ বাড়িতে ভোর থেকে রাত অব্দি কত না কাজ থাকে।

আজ কতদিন পর আবার ঘড়িটার কাঁচ পরিষ্কার করে তার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে

কাঁদতে মাসদেড়েক আগে কাকীমার বলে যাওয়া কথাগুলি মনে পড়ে। গ্রামের সবার খবর দিতে দিতে কিশনের চাকুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও বলে। কিশনের মা মারা যাওয়ার পর ও ওদের গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। এখন প্রায়ই ওকে মদের নেশায় চুর হয়ে রামপুরাফুলের কোন না কোন দোকানের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখা যায়। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চেহারা কঙ্কালসার! জস্সীর মনে পড়ে, ও একবার কলেজ পালিয়ে কিশনের সঙ্গে ওদের গ্রামে গেছিল। সেইসব স্মৃতি আজ অনেকদিন পর ওকে উদ্বেল করে তোলে আর দুগাল বেয়ে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে। আজ ঠান্ডা বেশী। নাকি ওর এমনি মনে হচ্ছে। ভোর অব্দি এই ঠান্ডা ওকে জমিয়ে বরফ করে দেবে। এই ঠান্ডায় অবশ হয়ে মরে গেলেই ভাল।

আজ সন্ধ্যা থেকেই দুইভাই উঠোনে চারপাই পেতে বসে মদ খাচ্ছিলো, খেতে খেতে রাত হয়ে যায়। তখন দু-চারটি রুটি খেয়ে বড়ভাই বলে, কুয়োর কাছে নতুন দামী মোটরটা রয়েছে, মেকানিক কাল এসে ঠিক করবে বলে সব খোলা ছেড়ে চলে গেছে। তেজীর তো কুম্ভকর্ণের মতন ঘুম। এখন চোরেব উপদ্রব বেড়েছে, কিছু উঠিয়ে নিয়ে গেলে সর্বনাশ। আজ আমি কুয়োর পাশেই শোব... তেজী তুই ঘরে শুয়ে পড়!

ও খেস দিয়ে ভাল করে গা মাথা মুড়ে শুতে চলে যায়। জস্সী দুধ জ্বাল দিয়ে বাকী সব্জিগুলিকে গরম করে রান্নাঘর সামলে তেজীকে বৈঠকখানায় চারপাই পেতে শুয়ে থাকতে দেখে নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের পরিশ্রমে এত গাঢ় ঘুমে তলিয়ে পড়ে যে তেজী কখন নিঃশব্দে এসে ওর পাশে শুয়ে সালোয়ারের নাড়া খুলে ফেলেছে ও টের পায়নি। সালোয়ার পা গলে বেরিয়ে যেতে থাকলেও হয়তো অভ্যাসবশে বাঁধা দেয়নি। তারপরই হঠাৎ অন্যরকম চাপ ঠেকলে ও চমকে চেঁচিয়ে উঠতে গেলেই তেজী ওর মুখ চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমি, জস্সী আমি, চুপ কবো, চেঁচালে তোমারই বদনাম হবে।"

জস্সী ওকে ধাক্কা মারে। কিন্তু ওর শরীর ওর দাদার দ্বিগুণ। ও জস্সীকে কাবু করার জন্য হাত মুড়ে ওড়না দিয়ে বাঁধে। তারপর উপুড় করে পশুর মতন চেপে ধরে। তারপর ও কতরকমভাবে কী না কি করে আর জস্সীর শুধু কান্না ছাড়া আব কিছুই করার থাকে না। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত শরীবে কখন ঘুমিয়ে পড়ে ও টের পায়না। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সকালে ঘুম ভাঙ্গে। ও তাকিয়ে দেখে দরজায় তেজী দাঁড়িয়ে। ওকে তাকাতে দেখে বলে, "উঠে পড়ো, রোদ উঠে গেছে, দুধ দুইয়ে আনো, দাদা এক্ষুণি চলে আসবে!"

জস্সী ঘৃণায় নাক কুঁচকায়। তেজী চলে গেলেও জস্সীর মনে হয়, ওর বড় বড় নোংরা নখের আঁচড়ে সারা শরীরে জ্বলন হচ্ছে। সেই জ্বলুনি ক্রমে ওর শরীর থেকে অস্তিত্বে ছড়িয়ে যায়। ও আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বালিশে মুখ রেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে, কাঁদতেই থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ঘর-সংসার-স্বামী-মান-ইজ্জত সব অশ্রু ও লালায় ডুবে যায়, নোংরা বালিশে মাথা খুঁড়তে থাকে এদেশের অসংখ্য অত্যাচারিতের একজন। যারা সংসারে শান্তির কথা ভেবে নীরবে সব সহ্য করে নেয়! কিন্তু ও মনে মনে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, "আজ যে যা খুশী বলুক, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই এর জন্যে আমাকে দায়ী করুক, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন, বিড়ালকে প্রথম রাতেই না মারলে ও রোজ রোজ দুধ খেতে চলে আসবে! ওকে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে ছাড়বো... রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।" এসব ভাবতে ভাবতে ও ঝিম মেরে থাকে।

তখনই দরজায় ওর স্বামীর আওয়াজ শোনা যায়, কী ব্যাপার, এখনো শুয়ে আছ, শরীর ভাল তো?

জস্সী প্রথমে কী বলবে ভেবে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু ও চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই জস্সী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জলভরা চোখে স্বামীর দিকে তাকায়। মনে হয় লোকটা ওর প্রতিদিনের

চেহারা আর আজকের চেহারার মাঝে দাঁড়িয়ে হাসছে। জস্‌সী চেঁচিয়ে বলে, "এরকম ছাই দিয়ে আমার মুখ কালো করতে কাল তুমি গিয়ে কুয়োর পাশে শুয়েছো? আদরের ভাইকে এখানে শুতে পাঠিয়েছ..... এরকমও কেউ করে? আমি তো ওর জন্যে জান দিতাম...! আমি কি জানতাম ছাই...!!" আর বলতে পারে না। চোখের জল আর মুখের লালা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

"ওহো... কী হয়েছে, কিসের জন্যে এত ক্ষোভ?" তেজীর দাদা খেসটা গা থেকে আলগা করে চেয়ারে রেখে অবাক চোখে তাকায়।

"তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করো ও আমার সঙ্গে কী করেছে... ওর সঙ্গে জোরে পেরে উঠিনি, নাহলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতাম। বেঁধে যা খুশী তাই করেছে ও!" ওর কথা শুনে লোকটা জিভের নিচে দাঁত নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকায়। ওর ফুলে ওঠা ক্ষতবিক্ষত হাতটাকে আলতো হাতে ছুঁয়ে চুক চুক শব্দ করে। জস্‌সীর মনে হয় ও এখুনি দরজার পেছন থেকে কৃপাণটা বের করে নিয়ে গিয়ে তেজীকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে নিমেষেই লোকটার রাগ উধাও। ও বলে, "ব্যাস, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করছো, পাগল নাকি তুমি, চুপ কর।"

লোকটার নিরুত্তাপ ভাব দেখে জস্‌সী আরো জ্বলে ওঠে, "আচ্ছা, কিছুই হয়নি বলছো, তাহলে ডাকো ওকে, তোমার সামনেই আবার করুক- এবার আর বাঁধা দেব না।"

ও ঝুঁকে একবার বিছানার নিচে তাকায় যেন চপ্পল খুঁজছে। ওর স্বামী কাছে এগিয়ে আসে। ও সোজা দাঁড়িয়ে বলে, "আমি এখুনি বাড়ি যাবো, জন্মদাতা বাবা-মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো, এই জন্যেই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে নাকি?"

ওর স্বামী সম্ভবত এবার ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে যায়। জস্‌সী এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাতে থাকে। ওর স্বামী বলে, "থুতু উপরে ছিটালে নিজের গায়েই পড়বে, বাইরের কেউতো আর নয়, নিজেরই দেওর! শালী, একে হাতে রাখতে পারলেই ভাল, জালিম দুনিয়া এমনি খুবলে খেতে চায়, এরকম সুযোগ পেলে মন্ত্রণা দেওয়ার লোকের অভাব হবে না, আগামীকালই ও অর্ধেক ভাগ চাইবে আর আমাদের এখন তো কোনমতে চলে যাচ্ছে, তখন দুধ ঘি খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে!"

একটু থেমে ও আবার বলে,"তোমার কী আর ক্ষয়ে গেছে বলো! উৎসবের দিনে কান্নাকাটি বন্ধ করে যাও হাত-মুখ ধুয়ে ভাল জামাকাপড় পরে নাও; মাঘ পূর্ণিমার মেলা দেখতে যাবো!" ও এগিয়ে জস্‌সীর কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে ওর জ্বলন্ত হৃদয়ে একঘড়া জল ঢালতে চায়। কিন্তু জস্‌সী গিয়ে আবার বিছানায় উপুড় শুয়ে কাঁদতে শুরু করলে ওর স্বামী দরজা খোলা রেখেই বাইরে বেরিয়ে যায়।

তারপর না জানি কতক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে অবশেষে নিজেকে সামলায়। উঠে আলমারি থেকে নিজের হাতঘড়িটি বের করে পরে নেয়। তারপর দরজার চৌকাঠ পেরুতে গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরে এসে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে থেমে থাকা কাটাগুলিকে সামনে পেছনে ঘুরিয়ে ওর মনে হয় নিজের ভেতরের সময়কে ও সামনে পেছনে করছে। ও কী ভেবে ওখান থেকে নেমে এসে সহজ কদমে উঠোনে একবার দাঁড়ায়। উনুনের পাশে বসা স্বামীকে একবার তেরছা নজরে দেখে, তেজী বাইরে মোষের দুধ দুয়াচ্ছে। ও সদর দরজায় দাঁড়িয়ে একবার অসীম লালসায় পুরো বাড়িটাকে দেখে। ওর স্বামী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাচ্ছ?" ও ঘৃণার থুতু ফেলে হনহন করে এগিয়ে যায়। পেছন থেকে আওয়াজ আসে, "জস্‌সী জস্‌সী শোন!"

ও যথাসম্ভব জোরে হেঁটে ছোট্ট রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়। ট্রেনের

হুইশেলের আওয়াজ আর স্টেশনের সুরভি ওর গলার আওয়াজ আটকে দেয়। ও গলা ঝেড়ে ঢোক গিলে কাউন্টারের ভদ্রলোককে বলে, "দাদা, একটা রামপুরাফুলের টিকিট দিন!"

সাকাল ১৯৯৭

লোহরী : পৌষ সংক্রান্তির দিনে পাঞ্জাবে লোহরী উৎসব হয়। বিয়ে ও বাচ্চার জন্মের পর পালিত প্রথম লোহরী পারিবারিক জীবনে বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আর আগুন জ্বালিয়ে বাদাম ও একপ্রকার তিলের নাড়ু (রেওড়ি) খাওয়া।

খেস : পুরনো কাপড়, পুরনো উলকে সেলাই করে তৈরী কাঁথাজাতীয় ভারী গরম চাদর। এছাড়া সাধারণ হ্যান্ডলুমের খেসও কোঅপারেটিভ সোসাইটির দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

তলবিন্দর সিংহ

অন্তঃশীলা

এ আমার কী হলো? গুরু মহারাজের শেখানো অমৃত যে আজ ভুলতে বসেছি! যে ব্রত এতদিন ধৈর্যের সঙ্গে পালন করছিলাম তা কি ভেঙ্গে গেল? সমস্ত সংযম কোথায় ভেসে যাচ্ছে। আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমার মন ডুবে যাচ্ছে। মাথা ঘোরাচ্ছে। পা-গুলি শক্তিহীন। কোনমতে নিজেকে সামলে ঘরে ঢুকে শাশুড়ীমায়ের বিছানায় আছড়ে পড়ি।

কপাল পুড়ে যাচ্ছে। এই প্রচণ্ড শীতে এত উত্তাপ? সাদা কাপড় পরেও কারো শরীর থেকে এত উত্তাপ বেরোয়? ওফ্.....! আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে মোটর সাইকেল স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ ভেসে আসে। ঐ আওয়াজ দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শাশুড়ীমা শিথিল কদমে ঘরে ঢুকে গুরু নানকের ছবির সামনে হাতজোড় করে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করেন,.. সচ্চে পাতশাহ, আমরা তো আগে থেকেই সুখে নেই.. এই পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করো বাহে গুরু! তারপর কাচের ফ্রেমে বাঁধানো ছেলের ফটোর সানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেন, ও আমার ছেলে, তোকে কোত্থেকে খুঁজে আনি বল্... তুই ছাড়া আমার ঘর যে খালি হয়ে আছে!

তারপর ধীরে ধীরে কাছে এসে বিছানায় বসে আমার মাথায় হাত বোলাতে থাকেন। আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে বলি, মা, না জানি কেন এমন করলাম..... না জানি কেন! শাশুড়ীমা আমার চুলে বিলি কাটতে থাকেন, ওর দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ পর নিজেকে কিছুটা সামলে আমরা উঠে বাইরে বেরিয়ে আসি।

চিনাব চুলোর ছাই দিয়ে খেলছে। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখি। শাশুড়ী বলেন, বেটা ওকে ধর, ছাই-এর নিচে আগুন রয়েছে!

আমি ছুটে গিয়ে চিনাবকে উঠিয়ে স্নানঘরে নিয়ে যাই। হাত-মুখ ধুইয়ে দিই। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে ওকে অনেক কটা চুমু খাই। এরমধ্যেই শ্বশুরমশাই কোথাও বাইরে চলে যান। শাশুড়ীমা পিঁড়িতে বসে মসুর ডাল বাছেন। চিনাব মুরগীর বাচ্চাদের পেছন পেছন ছোট ছোট পায়ে উঠোনময় দৌড়ুতে থাকে। আমি শাশুড়ীর পাশে রাখা চারপাইয়ে বসি, তারপর শুয়ে পড়ি।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই এখানে সোহন বসেছিল। ও এলেই আমার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। ওকে দেখলেই শরীর অবাধ্য হয়ে পড়ে। ধৈর্য, অপেক্ষা আর সন্তোষের বাঁধন কেমন আলগা হয়ে

পড়ে। ওর সঙ্গে কথা বললে মনে হয় আমার আওয়াজ কোন্ দূর থেকে আসছে! ও চলে গেলে আমি মাটির মতন অসাড় হয়ে পড়ি। শাশুড়ীমা সবসময় দুশ্চিন্তা করেন। উনি ভাবেন আমার এমন কোন রোগ হয়েছে যা আমাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রতিবেশী কাকিমার কাছে এ নিয়ে আক্ষেপ করলে তিনি বলেন, বোন, আমার তো মনে হয় এ কোন আঁলগা প্রভাব! কোন জ্ঞানীজীকে দিয়ে পুজো করাও!

শাশুড়ীমা শ্বশুরমশাইকে একথা বললে তিনি নিজের স্বভাব অনুযায়ী 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' কোনটাই না বলে কেবল মাথা নাড়িয়ে দেন। থম্ মারা চেহারা নিয়ে ক্ষেতে চলে যান। কিছুদিন ধরে আমি আজব সব কাণ্ডকীর্তি করে ফেলছি। কখনো তাওয়ায় শেঁকতে নিয়ে রুটি ছাই করে ফেলি, কখনো আমার চোখের সামনে মোষের বাচ্চাটা ওর মায়ের সমস্ত দুধ খেয়ে যায়। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি অথবা খেয়ালই করি না। প্রায়ই নিজের হাতে কোথাও কোন জিনিস রেখে ভুলে যাই। 'গ্রন্থসাহিব' পাঠ করতে করতে মনোযোগ হারিয়ে ফেলি। এইসব দেখে শাশুড়ী ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। চন্নের ফটোর কাচ ওড়না দিয়ে মুছতে মুছতে টপটপ চোখের জল ফেলেন।

আমার দাদা-বৌদি দেখা করতে এলে শাশুড়ী বৌদিকে এই করুণ অবস্থার কথা বলেন। দাদা কাঁদো কাঁদো চেহারায় আমার মাথা নিজের বুকে লাগিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বুনু, তোর কী হয়েছে রে? কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমার মাথায় বলার মতন কোন শব্দ আসে না। বৌদি জিজ্ঞেস করেন, তোমার শরীর তো ঠিক আছে?

— হ্যাঁ বৌদি, কোনই অসুবিধে নেই! আমি মুচকি হাসার চেষ্টা করি। বৌদি চিনাবেব মাথা নেড়ে দিতে দিতে বলেন, নিজের জন্যে না হোক এই বেচারার কথা ভেবে তোমাকে হাসিখুশী থাকতে হবে!

আমিও মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিই। দাদা বলে, মাকে দেখতে মন চাইলে আমাদেব সঙ্গে চল!

শাশুড়ীমা ওর কথায় সায় দিয়ে বলেন, মন চাইলে ঘুরে আয় মা!

— আপনাদেরকে কার ভরসায় ছেড়ে যাই! এখানে আমাব একশোটা কাজ! ফসল উঠে গেলে না হয় গিয়ে কযেকদিন থেকে আসবো! একথা বলে আমি রান্নাঘবে গিয়ে চা বানাতে বসি।

দাদা বলে, ঠিকই তো লাগছে!

শাশুড়ী বলেন, আমি ভাল বুঝছি না বাবা!

বৌদি প্রশ্ন কবে, গ্রন্থসাহিব পাঠ কবে কি?

শাশুড়ী বলেন, — প্রতিদিন পঞ্চবাণী পাঠ করে। সকাল-সন্ধ্যা গুরদুয়ারায় যায়। গুরুর ঘরে তো শুরু থেকেই ওর ভীষণ নিষ্ঠা! ব্যস এই ক'দিন হলো......।

গুরুর প্রতি আমার অটুট শ্রদ্ধা এখনো রয়েছে। গত গ্রীষ্মে পাশের গ্রামে অহর্নিশ কীর্তন হয়েছিল। বদ্ধনীকলাঁ গ্রামের সন্তও কীর্তন গাইতে এসেছিলেন। আমি আর শাশুড়ীমা রোজ ওখানে যেতাম। গ্রামের সবাই যেত। সবাই সন্তের প্রবচন একাগ্র হয়ে শুনতো। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসে থাকতাম। দেহের নশ্বরতা এবং আত্মার ব্যাপকতা নিয়ে ওরা বলেন। জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ প্রাকৃতিক ক্রম অনেকটা বুঝতে পারি। এসব জানার আগ্রহ আমার অনেকদিনের। কিন্তু এখন এই মহাবিশ্বের বিস্তার যেন আরো স্পষ্টভাবে অনুভব করি। আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক সম্পর্ক আমার মনে ফিকে হয়ে আসে! এমনকি আমার চন্নের বিয়োগব্যথাও ধীরে ধীরে কমে আসে।

শেষদিনে বৈরাগ্যময় এক দীর্ঘ কীর্তনের পর সন্ত অমৃত সঞ্চার করেন। আমি উঠে গিয়ে সন্তের পা ছুঁয়ে অমৃত জ্ঞান প্রার্থনা করি। অমৃত জল মন্ত্রপূত করে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, — জীবনসাথীকেও গুরুর কাছে নিয়ে আসা উচিত ছিল!

এই কথা শুনে শাশুড়ীমা কেঁদে ফেলেন। আমার চোখ ভরা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। শাশুড়ীমা বলেন, — ও তো মহারাজজী আমাদের ছেড়ে.....!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সন্তের মুখেও আফশোসের রেখা প্রকট হয়ে উঠে। তারপরই নিজেকে সামলে বলেন, — চিন্তা না কী কীজিয়ে, রাম গয়ো রাবন গয়ো! তিনি ডান হাত উপরে উঠিয়ে বলেন, — এই দুনিয়া এক অতিথিশালা, সবাইকে এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে..... ঈশ্বরের কথা ভাববি....... কেবল ওর নামই তোর সঙ্গে থেকে যাবে.......!

রাতে ট্র্যাক্টরের ট্রলীতে বসে গ্রামে ফেরার সময় গ্রামের সবাই সন্তের প্রতিভার গুণগান করে। ওর বিনম্র স্বভাব আর উচ্চ বিচারধারা সবাইকে মোহিত করেছে। আমি চিনাবকে কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। সন্তের প্রশংসা ও গুণগান আমার ভাল লাগে। আমার মস্তিষ্ক ও মন হাল্কা লাগে। ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় চারপাশ মোহময় লাগে। আজ যদি চন্ন সঙ্গে থাকতো তাহলে এই জ্যোৎস্না আমার কাছে অন্য মানে নিয়ে আসতো। সবার সামনে আমি কখনো ওর নাম উচ্চারণ করিনি। কিন্তু একান্তে আমি ওকে 'চন্ন'ই ডাকতাম। আমার মুখে এই নাম শুনে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত। আমার রবিন্দর নামটাকে ও 'রাবী' বানিয়ে দিয়েছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি রাবী নদীর কাছাকাছি। ও প্রায়ই বলতো,—তোর গভীরে ডুব দিয়ে আমি একদিন মরে যাবো! আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাতচাপা দিতাম।— না, চন্ন এরকম কুকথা বলতে নেই!

ও আমার ফুলে ওঠা পেটে আলতো হাত বোলাতে বোলাতে বলতো,—মেয়ে হলে নাম রাখবো চিনাব আর ছেলে হলে রাখবো বিয়াস! চন্নের নদীপ্রিয়তার ভাবনায় ডুবে থেকে বলি, — একটা নাম রাখলেই হলো!

— সমস্ত মায়া তো নামের মধ্যেই। তুই আমাকে চন্ন না বলে 'ছপ্পড়' অথবা 'বলদ' ডাকতে পারবি? জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন,—এরকম কাজ করে যাবে যাতে তোমার নাম মৃত্যুর পরও লোকের মনে থেকে যাবে!

আমি রেগে বলি,—আবার মরার কথা?

না জানি কেন এরকম কথায় কথায় মরার কথা বলতো! সোহন বলতো, চরণজিতের গানের গলা খু-উ-ব ভাল!

সত্যি দারুণ গানের গলা ছিল ওর। কিন্তু আমি ওকে গাইতে বললে না জানি কেন 'অসাঁ তাঁ জোবন রুত্তে মরনা......' আমি তো যৌবন থাকতেই মরে যেতে চাই.....' গানটিই গাইতো। যে শুনতো ওর দরদী আওয়াজে সে নিথর হয়ে পড়তো।

অবশেষে এসে যায় সেই ভীষণ দিনটি। সারাদিন চন্ন ঘরেই ছিল। বিকেলে ও বলে বেরোয় যে কাদীয়া গ্রামের আড়তিদের থেকে টাকা নিতে হবে, ফসলের জন্যে পোকার ঔষধ কিনতে হবে আর স্কুটারে পেট্রল ভরতে হবে, তৈরী হয়ে থাকিস, ফিরে এসেই তোকে নিয়ে বাটালায় সার্কাস দেখতে যাবো!

সেদিন তাড়াতাড়ি ঘরের কাজটাজ সেরে ওর কথামতন সেজেগুজে বসেছিলাম। দরজার দিকে কান পেতে থাকি। সাধারণত ও এসে লাগাতর তিনবার হর্ণ বাজায়। কিন্তু সেদিন আমার অপেক্ষা যেন অন্তহীন। কোন হর্ণের আওয়াজ শোনা যায় না। একটি ছেলে এসে খবর দেয়, চরণজিতের স্কুটার একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে! ওর মাথা গিয়ে মাইলষ্টোনে লেগেছে, ওখানেই সব শেষ!

শাশুড়ীমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ওখানেই পড়ে যান। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চারপাশে হৈ হৈ শুরু হয়ে যায়। প্রতিবেশী মহিলারা অনেক কষ্টে মায়ের দাঁতি খুললে ওর কান্না ও বিলাপে আকাশও কেঁদে ওঠে। পুরুষেরা শ্বশুরমশাইকে ঘিরে থাকেন। কেউ বলে,—পোষ্টমর্টেম

করাতে হবে! অবসরপ্রাপ্ত দারোগা সাহেব বলেন,—আমরা পোষ্টমর্টেম হতে দেব না! আমি নিজে গিয়ে ডি এস পি-র সঙ্গে দেখা করবো!

আমার ইচ্ছে করে, ঘুষি মেরে মেরে পেটের বাচ্চাটাকে মেরে ফেলি! হয়তো তাই করতাম, কিন্তু তখনই দারোগার বউ আমার কাছে চলে আসেন। আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। তিনি বলেন, যা, মুখের মেকআপ ধুয়ে আয়!

ওর কথা শুনে আমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

পরদিন সবাই আমার চন্নকে লাকড়ির বিছানায় শুইয়ে আগুনে সমর্পণ করে দেয়। শ্বশুরমশাই চিতায় আগুন দিতে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। পুরো গ্রাম কাঁদতে থাকে। আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন আবার কাঁদেন। গ্রীষ্মের রোদ্দুরে চিতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আমার তলপেট চিনচিন করে ওঠে। আমার চন্নের নরম শরীরটা দেখতে দেখতে ছাই হয়ে যেতে থাকে। শুরুতে আমি ঠোঁট চেপে সব সহ্য করে নিই। কিন্তু একটু পরেই তলপেটের ব্যথাটা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে আমি আর সহ্য করতে পারি না। অজান্তেই ভেতর থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে আর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি ঘরে শুয়ে আছি। পাশে ব্রার-বৌদি বসে আছেন। ধাই-এর কোলে কাপড়ে মোড়া সদ্যজাত শিশুটিকে দেখিয়ে তিনি বলেন,—এই যে দ্যাখ্, নতুন মানুষ!

আমি ওঠার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। ভীষণ দুর্বল লাগে।

দশম দিনে শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। আমিও ধীরে ধীরে চলাফেরা শুরু করি। আত্মীয় স্বজনেরাও আসা-যাওয়া করতে থাকেন। যখন তখন চন্নের কলেজের অধ্যাপক বন্ধুরাও আসে। সোহন তো বেশ কিছুদিন নিজের ঘরেই যায়নি। টুকটাক ঘবের কাজ থেকে শুরু করে শ্বশুরমশাইর হাতে হাত লাগিয়ে সব কাজই ও করেছে।

প্রায় দুইমাস পর একদিন বাবা আর দাদা আসে। দাদা আমাকে জড়িয়ে ধরতেই কান্না চলে আসে। বাবা আর শ্বশুরমশাই পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। একসময় বাবা বলেন—সুখই যদি আমাদের ভাগ্যে থাকতো তাহলে এরকম হতো না, মেয়েটার কপালই এমন যে—, বলতে বলতে গলা বুজে আসে। দাদা বলে—এখন ও এখানে কী করবে? আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমরা একে সঙ্গে নিয়ে যাই!

শ্বশুরমশাই বেশ জোর দিয়ে বলেন,— মায়ের সঙ্গে দেখা করাতে যতবার খুশী নিয়ে যাও সর্দারজী, কিন্তু হাতজোড় করে প্রার্থনা করি, ছেলের অবর্তমানে তোমরা আমাদের অনাথ করে দিও না, এ তো আমাদের নিজের মেয়ে থেকেও বেশী প্রিয়, এই বুড়োবুড়ির এছাড়া আর কে আছে?

দাদা মাটির দিকে তাকিয়ে বলে— কিন্তু তালইমশাই, এত অল্প বয়স ওর, কেমন করে — মানে বলতে চাইছি—

কেশে গলা ঝেড়ে ও আবার বলে, ওর বয়স মাত্র তেইশ বছর, এত দীর্ঘ পথ!

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই শ্বশুরমশাই বলেন— তোর কথা বুঝতে পারছি বাবা, ও এখন আমাদের মেয়ে, বউ বলে ভাবছি না আর, যদি সেরকম সুযোগ আসে তাহলে আমি নিজের হাতে কন্যাদান করবো, এখন ও আমার ঘরের পাগড়ি! তোমরা যাওয়া-আসা করবে, মেয়েও দুই ঘরেই যাওয়া-আসা করুক, যখন যেখানে খুশী থাকুক, কিন্তু ওর ঘর হলো এইটা!

বাবা পাগড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। যে উঠোনে আমার চন্ন ঘুরে বেড়াতো তা ছেড়ে আমিও কোথাও যেতে চাই না। ওর সঙ্গে কাটানো দুই বছরের স্মৃতি সম্বল করে চিনাবকে বড় করে তুলতে চাই। এখন এই ঘরের মানইজ্জতকে নিজের ভেবে চলাই আমার ধর্ম। স্মৃতি স্পর্শময়। সব কিছু বুকে আগলে আমি দিন কাটাতে চাই।

দুই তিনদিন পরপরই সোহন আসে। চন্ন ওকে ভাইয়ের থেকেও বেশী ভালবাসতো। শ্বশুর-শাশুড়ীও ওকে খুব ভালবাসেন। আমাকে ও 'বহনজী' বলে ডাকে। আমিও ওকে 'ভা-জী' বলি। ও একদিন বলে, — চরণজিৎ আমার থেকে পুরো ছয়দিনের বড়, আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারেন। কিন্তু আমি কখনোই তা পারি না। কথা বলতে বলতে ও জীবন-মৃত্যুর গভীর দর্শনে ডুবে যায়। কিছু বুঝি, অনেক কিছুই বুঝি না। ও নানারকম উদাহরণ দেয়। ওর কথা আমাকে ছুঁয়ে যায়। ওর কাছে বসতে ভাল লাগে। ও উঠতে চাইলে জোর করে বসিয়ে রাখি। চিনাবকে কোলে নিয়ে ও উঠোনে ঘুরতে থাকলে মাঝেমধ্যেই বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয় চন্নই ঘুরছে। এরকমই লম্বা চওড়া শরীর, বড় বড় চুল আর ঘন দাড়ি ছিল, গেরুয়া পাগড়িতে দারুণ লাগতো। আর যখন কালো পাগড়ি পরতো তখন ওর শরীর থেকে পৌরুষ বিচ্ছুরিত হতো। সোহনের ছোট চুল পাতলা দাড়ি কিন্তু চালচলনে এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাই আমি। চিনাবকে কোলে নিয়ে এমনি উঠোনে চন্নরই তো ঘোরার কথা ছিল!

চন্নর মতই সোহন এ বাড়িতে স-ব করে। ঘাস আর খড় কেটে কুচি কুচি করে মিশিয়ে মোষের খাবার তৈরী করে। গায়ের জামা খুলে খুঁটিতে টাঙিয়ে মোটর পাম্প-এ পাইপ লাগিয়ে পশুদের স্নান করায়। বাড়ির পেছনে মুলো,ফুলকপি ও বেগুন গাছে পোকার ঔষধ দেয়। তারপর হাতমুখ ভাল করে ধুয়ে রান্নাঘর থেকে গ্লাস উঠিয়ে এনে ফ্রিজ থেকে নিজেই জল বের করে খায়। শাশুড়ী এগিয়ে বলেন, আমি জল দিচ্ছি বাবা!

সোহন বলে, — চরণজিৎ কোনদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে হুকুম চালায়নি, উঠে নিজেই সব নিয়ে নিত!

একথা শুনে শাশুড়ীমা হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মোছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আমার অমৃতধারণের কথা শুনে সোহন বলে, কোন কষ্টকর নিয়ম পালনের কয়েদঘরে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া যদি ধর্মপালন হয় তা আমার কাছে নিরর্থক। ধর্ম মানুষকে সার্বিক বিকাশের পথ দেখায়। বাধানিষেধের অন্যনাম কখনো অমৃতধারণ হতে পারে না।

জানি না আমি নিজে এসবের পক্ষে কি না! কিন্তু সন্তের নির্দেশমতন চলাটাই ঠিক মনে করি। সবসময় ইষ্টনাম জপ করি। সকাল-সন্ধ্যা গ্রন্থসাহিব পাঠ করি। গুরুদুয়ারায় যাই। চিনাবকে স্নান করাই, রান্না করি, শ্বশুর-শাশুড়ীর দেখাশোনা করি। এভাবে ব্যস্ততায় দিনগুলি পেরিয়ে যায়। কিন্তু রাতগুলি আর কাটতে চায় না। অজান্তেই কখন সোহনের কথা ভাবতে শুরু করি। নিঝুম রাতে ওর আওয়াজ শুনতে পাই। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চিনাবের হাত এসে আমার বুকে পড়লে চমকে উঠি। পেটের উপর ও পা তুলে দিলে আমার চোখ খুলে যায়। সোহনের কথা ভাবলে আর ঘুম আসে না। শরীরে আগুন লেগে যায়। ভাবি, ও যদি এই গরম শরীরে হাত রাখে, কম্পিত ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায়!

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গতে থাকে। বুকের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া চারাগাছটি আবার সতেজ হয়ে এক অজানা ভাললাগা হাওয়ায় দুলতে থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। ও বোন বলে ডাকলে আমার ভাল লাগে না। কখনো ও চোখের সামনে তুড়ি মেরে জিজ্ঞেস করে, — কোথায় হারিয়ে গেছ?

জানি না কোথায় হারিয়ে যাই আমি। সেদিন সোহন গেরুয়া রঙের পাগড়ি পরে বাজারের আড়তিদের কাছ থেকে আমাদের ফসল বিক্রির টাকা দিতে এলে বিকেলের আলোয় ওকে দারুণ লাগে। উঠোনে মটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে ও এসে চারপাই-এ বসে। শ্বশুরমশাইকে হিসেব বুঝিয়ে দেয়। শাশুড়ীমা পিঁড়িতে বসে চিনাবকে কোলে নিয়ে আদর করেন। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের লয় বাড়তে থাকে। মাথা থেকে সারা শরীরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা বয়ে যায়। কান ঝা ঝা করে। ওর কোন কথাই আমি শুনতে পাই না। শুধু হাত কিম্বা মাথা নাড়ানো দেখতে পাই, ওর হাসি ও চোখ....

হঠাৎ শাশুড়ীমা আমাকে বেশ জোরে বলেন, — বেটি রবিন্দর, ওকে এক গ্লাস জল দে। আমি বাসনের টুকরি থেকে একটা ঝকঝকে গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে নলকূপ থেকে ভরে নিয়ে আসি। সোহনের দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে বলি, — এই নাও!

শাশুড়ীমা বলেন, — এই যে ছেলে, জল খাও!

সোহন ডাইরিতে কলম দিয়ে হিসাব করতে করতে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মুচকি হাসে। আমার হাত থেকে নিয়ে অর্ধেক জল খেয়ে গ্লাসটা আবার ফিরিয়ে দেয়। আমার শুকনো গলায় হঠাৎই পিপাসা তীব্র হয়ে ওঠে আর আমি গ্লাসের বাকি জলটা তখনই চো চো করে খেয়ে নিই। শেষ ঢোঁক গলা দিয়ে নামতেই আমার হুঁশ হয়। এ আমি কী করলাম! শাশুড়ীমায়ের খোলা মুখ খোলাই থেকে যায়। শ্বশুরমশাই অবাক হয়ে যান। সোহনের হাতে ধরা কলমও থেমে যায়। আমি দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে পড়ি। খালি গ্লাস চুলোর কাছে ফেলে দিই। আমার মাথায় কী যেন হয়। পাগুলি প্রাণহীন। না জানি কেমন করে শোবার ঘরে ঢুকে শাশুড়ীর নেওয়ারি খাটে শুয়ে পড়ি। তারপর থেকে নিরন্তর কাঁদতে থাকি। ভেতরে জমা কিছু যেন গলে গলে বেরিয়ে আসছে।

রাতে বিছানায় আবার সারা শরীরে আগুন জ্বলতে থাকে। গলা থেকে কৃপাণ বাঁধা ফিতেটা খুলে বালিশের নিচে রাখি। আজ শাশুড়ীমা চিনাবকে নিজের বিছানায় শুইয়েছেন। আমি তাই সারারাত ছটফট করতে থাকি।

পরদিন সকালে আমি স্নান করিনি, গুরুদুয়ারাতেও যাইনি। শাশুড়ীমা চুপচাপ। শ্বশুরমশাই'র চেহারায় চিন্তার রেখাগুলি গভীরতর হয়। সকালের খাবার খেয়ে তিনি মাঠে বেরিয়ে যান। শাশুড়ীমা বুকের ভার হাল্কা করতে প্রতিবেশীনির কাছে যান। আমি মুর্গীগুলিকে খাঁচা থেকে বের করে দিই। পাশের বাড়ির কাকিমার লাখা মুর্গাটা প্রাচীরের উপর থেকে উড়ে এসে আমাদের সাদা মুর্গীটাকে পেছনের সব্জিখেতের দিকে নিয়ে যায়। আমার ভীষণ মাথাব্যথা করে। ঠিক তখনই মোটর সাইকেলের আওয়াজ বাড়তে বাড়তে আমাদের দেউড়ি পেরিয়ে এসে উঠোনে থামে। আমার মাথা ঘোরায়। সোহনকে এগিয়ে আসতে দেখে পা কাঁপে। আঙ্গুলে মোটর সাইকেলের চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে ও বলে, কাল তুমি এটা কী করলে? ওর দিকে তাকাতে পারি না। আবার না তাকিয়েও থাকতে পারি না। আমি কী জবাব দিই? আমার হাত-পায়ের কাঁপন দেখে ও অবাক হয়ে যায়। একসঙ্গে অনেক কথা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমি কী আবোলতাবোল বলি তা নিজেই শুনতে পাই না। তবে সোহনের কিছু কথা শুনতে পাই, — তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আমি সবসময় তোকে বোন ভেবেছি, এখন তুই নিজের মধ্যে নেই! তোর শাশুড়ী কই? শ্বশুরমশাই? আমি কোন জবাব না দিয়ে সোজা ওর হাত জাপটে ধরি। ও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে সোজা দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট করে চলে যায়। তারপর আমার না জানি কী হয়! নাভির কাছ থেকে এক বিকট চিৎকার আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। পাশের বাড়ির কাকীমা আমার চিৎকাব শুনে ভেজা গায়ে দৌড়ে আসেন। তিনি বলেন, আমি স্নানঘরে ছিলাম, তোমার চিৎকার শুনে কোনমতে কাপড় জড়িয়ে চলে এসেছি, কী হয়েছে তোমার?

তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। কিন্তু আমি কী জবাব দেব? একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কী করতে পারি? শাশুড়ীমাও দূর থেকে আমার আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসেছেন। কাকীমা আমার শাশুড়ীকে বলেন, — আমি তো আগেই বলেছিলাম বহনজী, এখনও সময় আছে, আমার কথা শুনে পণ্ডোরী গ্রামের সাধুদের দিয়ে একবার ঝাড়িয়ে নাও!

প্রায় সপ্তাহখানেক সোহন আসেনি। আমার করুণ অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়েছে। শাশুড়ীমা বাদাম গুঁড়ো করে তা ঘিয়ে লেই করে আমার মাথায় লাগান। শ্বশুরমশাই বলেন, — মা সংযত হও, তোমাকে নিয়ে গ্রামে নানা কথা শুরু হয়েছে!

আমি কী বলি, নিজেকে নিয়েই ভীষণ কষ্টে আছি!

অবশেষে একদিন কালো আলখাল্লা পরা দুই সাধু আমাদের দেউড়ি দিয়ে উঠোনে ঢোকে। শাশুড়ীমা মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে ওদের স্বাগত করেন। ওদের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে অজান্তেই আমি জোরে ককিয়ে উঠি। এক সাধু নিজের চিমটাঅলা হাত উপরে তুলে বলে, আমরা দেখে নিয়েছি, উঠোনে পা দিয়েই দেখেছি। একটা তুড়ি মারবো ব্যস, এক তুড়িতেই পালাবি তুই! তারপর ওরা উঠোনে রাখা চারপাই-এ জমিয়ে বসে পড়ে। ওদের মধ্যে যার পাকা দাড়ি সে বাজখাই গলায় শাশুড়ীমাকে বলে, এই বাচ্চা মেয়েটার শরীরে এক মহিলা ভর করেছে। ওই ওকে দাবিয়ে রেখেছে। দেখিস্ মা, এক্ষুণি ঠিক করে দেব, তুই সামগ্রী সাজিয়ে দে!

শ্বশুরমশাইও অন্যদের সঙ্গে সামগ্রী সাজাচ্ছে দেখে আমার কান্না চলে আসে। সমস্ত উঠোন ক্রমে ধোঁয়াময় হয়ে উঠছে। দুই সাধুই এখন চিমটা বাজিয়ে বাজিয়ে উঠোনে চক্কর মারতে শুরু করে। বুড়ো সাধু ওর চিমটাটাকে আমার মাথায় ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে। তারপর গর্জে ওঠে, বল, যাবি কি না?

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে আমি একটু সময়ের মধ্যেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। আমার মাথা এখন নিজে নিজে ওদের চিমটার শব্দের তালে তালে দুলছে। চুলের বাঁধন আলগা হয়ে চুলগুলি গলার নিচে চলে আসে। চুলের একমুঠি সাধুর হাতে। দু'জনেই এখন আমাকে চিমটা দিয়ে জোরে জোরে মারে। ক্রমশঃ জ্ঞান হারাতে থাকি।

জোয়ান সাধু চিৎকার করে আমার ভেতর লুকিয়ে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞেস করে, বল, তুই কী চাস? প্রায় জ্ঞান হারাতে হারাতে বলি, সোহনকে চাই!

— সোহন আবার কে? সাধু গর্জায়!

শাশুড়ীমা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটেন। শ্বশুরমশাইর মাথা ঝুঁকে যায়। চারপাশ ঘিরে দাঁড়ানো মানুষজন পরস্পরকে কী যেন বলে।

— আমিই সোহন! দুই পা সামনে বাড়িয়ে সোহন বলে। এই কথাটা আমার অন্তঃস্থ নারীসত্তা হয়তো শুনে নেয়। আমার চোখ দিয়েই সে বিস্ফারিত চোখে সোহনকে দেখে। তারপর সেই-ই আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরকে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে দেয় না। শক্তি জোগায়। আর আমি ছুটে গিয়ে এবার দুই হাতে সোহনের গলা চেপে ধরে বলি, আরে এখনও কি তুমি চুপ থাকবে আর এই কসাইদের হাতে আরো মার খাওয়াবে আমাকে, বলো.... বলো!

সোহনের সারা শরীর ঘাম জবজবে।

সাধুরা চিমটা উঠিয়ে আমার দিকে তেড়ে এলে এবার সোহন বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলে, ব্যস! ব্যস! এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। বাবাজীরা এখন আপনারা চলে যান! এক্ষুণি!!

আমি সোহনের চোখে তাকাই। ওর দৃষ্টি বাষ্পারুদ্ধ। গালেও কান্নার দাগ স্পষ্ট। আমার ছড়ানো চুলগুলিকে ও আঙ্গুল দিয়ে সংযত করে। ওর ছোঁয়ায় আমার মাথার ধিকিধিকি আগুন বুজে যেতে থাকে। সমস্ত শরীরে চিমটার ক্ষতগুলি তখনও ভীষণ জ্বালা করছে।

রচনাকাল ☗ ১৯৯৫

মাখন মান

ঘুঁটে

লক্ষেওয়ালা একটি ছোট গ্রাম। সব মিলিয়ে বিশ-পাঁচিশ ঘর। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেতের মাঝে দ্বীপের মতন গ্রাম। গ্রামের মুখেই নম্বরদার* সুরেন্দ্র সিংহের বাড়ি। সুরেন্দ্র সিংহ কালেক্টর মনোনীত নম্বরদার। অন্যদের মতন ওর ঠাকুর্দা বা তাঁর ঠাকুর্দাকে কোন রাজা বা জমিদার 'নম্বরদার' নিযুক্ত করেননি। ওর বাড়ির পেছনেই বরযাত্রীদের জন্যে বারাতঘর। এই বারাতঘরটি গ্রামের যেকোন বাড়িতেই বিয়ে হলে তাদের বরযাত্রীদের শোয়াবসার জন্যে তৈরী হয়েছে। বারাতঘরের সামনেই এক ফকিরের মাজার। ওখানে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার গ্রামের লোকেরা চারমুখী প্রদীপ জ্বালায়। মাজারের পশ্চিমে তাকালেই মনে হবে কেউ বুঝি ওখানে দুধের বড় কড়াই থেকে অনেক অনেক দুধ ঢেলে দিয়েছে। আসলে সাদা সুতো টানটান করে মেলে রেখেছে তাঁতিপাড়ার লোকজন। তাঁতিপাড়া পেরুলেই ময়লার ঢিবি। ওখানে মুর্গী-র বাচ্চারা ঠোঁট ও নখের আঁচড়ে ময়লা ছড়াচ্ছে। দক্ষিণে এক অসম ত্রিভূজ তৈরী করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন মহীরুহ। পুবের হাওয়া জোরে বইলে বট আর অশ্বত্থের মাঝে দাঁড়ানো নিমগাছের নড়াচড়া দেখে মনে হয় এক কন্যা দুই যুবকের মাঝে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে কখনো একে জড়িয়ে ধরছে, কখনো ওকে বুকে টেনে নিচ্ছে।

পূর্বদিকে গ্রামের বুকে ফোঁড়ার মতন অনেকটা এলাকা জুড়ে এক ধ্বংসাবশেষ। ওখানে নাকি সিন্ধুসভ্যতার আমলের একটি জনবসতি ছিল। বিশাল আকারের কিছু মানুষের কঙ্কাল, হাড়িগুড়ি, মাটির বাসন আর পোড়ামাটির খেলনা পেয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা নিয়ে গিয়ে শহরের যাদুঘরে রেখেছেন। ঐ ধ্বংসাবশেষের পরেই রয়েছে একটি ছোট্ট টিলা। টিলার গা ঘেঁষে একটা পনের ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা কিছু দূর গিয়েই শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ঐ টিলায় এই গ্রামের মেয়েবুড়িরা গোবর ছেনে ঘুঁটে দেয়। প্রত্যেকের ঘুঁটে দেওয়ার জায়গা ভাগ করা রয়েছে। ঘুঁটে শুকিয়ে গেলে ওরা নিজস্ব জায়গায় সারি দিয়ে স্তূপ বানিয়ে রাখে। এতে হিসাব ঠিক থাকে। দূর থেকে ঐ সারিসারি ঘুঁটের স্তূপ দেখলে মনে হবে একটি ছোটখাট ঘুঁটের গ্রাম।

এখানে দীপো ঘুঁটে দিতে দিতে দেখে ভোলি ওকে লোভীদৃষ্টিতে দেখছে। কোন মেয়েকে মেয়েদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাতে দেখা যায় না। দীপো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে

এমনি হা করে কী দেখছিস?

দেখছি, দুদিন পরই কোথাকার কে এসে এই ঐশ্চর্য লুটেপুটে খাবে! এক্কেবারে ডাঁসা! আরে হতভাগী, পরশু তোর বিয়ে, এখনো সমানে গোবর ছেনে যাচ্ছিস! জামাইবাবুর নাকে সেদিন নির্ঘাত গোবরের গন্ধ লাগবে! তাহলে তোর দুঃখে ভগবানও কাঁদবে!

দীপো ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালে ভোলি বলে, — যদিও মধুর মধ্যে মোমের গন্ধ মিশলে ওর স্বাদ খারাপ হয় না!

দীপো একটা গোবরের লাড্ডু বানিয়ে ভোলির দিকে ছুঁড়ে মারে, — বদমাইশ কোথাকার এসব বলতে লজ্জা করে না? কেউ শুনলে কী ভাববে?

— মিথ্যে বলছি কি? প্রীতোবাবুর অবস্থাও জানি, কেমন অসহায়ের মতন তোর পেছন পেছন ঘোরে! বেচারা আর আড়াইদিনের অতিথিকে দু'চোখ ভরে যতটা পারে দেখে নিচ্ছে। আমি যদি প্রীতো হতাম তাহলে একবার তো তোকে হেস্তনেস্ত করে দেখতামই!

দীপো একটা আধলা ইট হাতে নিয়ে বলে, — আর ঘেউ ঘেউ করলে মেরেই ফেলবো! তোর শরীরে এত ভাপ থাকলে যা না কাউকে দিয়ে হাড়ি ফুটো করিয়ে নে!

ভোলি হেসে বলে, — হাড়ি তো পরশু ফুটো হবে, যখন লসাড়েওয়ালা একা পাবে! এইটুকু বলেই ও কিছু দেখে চমকে ওঠে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, — প্রীতো!

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রীতোকে উদাস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীপো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ও এখন আর কী করতে পারে? ওর স্বপ্নের দুনিয়ায় কোথাও প্রীতো নেই। সেখানে রয়েছে প্রাসাদোপম শ্বশুরবাড়ি, দিগন্তবিস্তৃত নিজেদের ফসলের ক্ষেত। সেই প্রাসাদের সামনে বাঁধানো চত্বরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক্টর, ট্রলী আর জীপগাড়ি। সেখানে দাস-দাসীরাই সমস্ত কাজকর্ম সামলায়। গ্যাসের চুলায় রান্না হয়।

দীপো বুঝতে পারে ওর মনে এই স্বপ্ন বাসা বাঁধার পর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রীতোর সঙ্গে ওর দূরত্ব বাড়ছে। ও নিজেকে বোঝায়, নিজের গ্রামের ছেলেকে কি কেউ বিয়ে করে? ও কখনো এমন বিয়ের কথা শোনেনি! এই ভালবাসার গোড়াতেই ভুল রয়েছে। অথচ ওর জীবনে প্রীতো এসেছিল বন্যার মতন। তখন পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথা অব্দি প্রীতো রক্তের সঙ্গে বইতো। কিন্তু সেদিন মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘটক যখন ওর হবু শ্বশুরবাড়ির বৈভবের বর্ণনা করছিল তখন থেকেই ধীরে ধীরে প্রীতো ওর দু'হাতের আঙ্গুলের ঝাঝরি দিয়ে বালির মতন ঝরে পড়েছে। ও ভাবতো, না, তা কেমন করে হবে? আমি তো প্রীতোকেই ভালবেসেছি! কিন্তু বারবার আবিষ্কার করতো শ্বশুরবাড়ির পাকা দেওয়াল ও শ্বেতপাথরের মেঝের আলোকচ্ছটায় ওর মনের কুঞ্জ থেকে প্রীতো কত দূরে ছিটকে পড়েছে।

ঘটক বলছিলেন, মেয়েরা তো গরুর মতন, যে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেবে তার চারপাশেই সংসার পাতবে! কিন্তু জৈলকৌর, যেখানে খাবার মতন ঘাস-খড় নেই সেখানে খুঁটি গেড়ে কী লাভ! মা-বাবার কর্তব্য হলো ভাল করে পরখ করে দেখা কোন্ খুঁটিতে পেটের ছা-কে বাঁধলে দানাপানির অভাব হবে না!

ঘটকের কথাগুলি শুনতে খারাপ লাগলেও ওগুলি বাস্তবের গন্ধমাখা। মেয়েদেরকে গরুর সঙ্গে তুলনা করায় ওর প্রতি রাগ তাই টেঁকেনি। বরঞ্চ ওর কথার অনুরণন দীপোর মনে প্রীতোর প্রতি ভালবাসাকে অর্থহীন করে তোলে। প্রীতোদের ভাঙ্গাচোরা বাড়িঘর ওর কাছে এখন পুতিগন্ধময়!

কী হলো তোর, হা করে কী দেখছিস্? প্রীতো কখন চলে গেছে! তুই কি অন্ধ না নিষ্ঠুর? ভোলির কথায় দীপোর চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর ও ঘুঁটের দেশে ফিরে আসে। প্রীতো এখন দূরে, ওর পিঠ দেখা যায়।

যেদিন দীপো প্রীতোকে নিজের মাঙ্গনীর** কথা শোনায় দেখতে না দেখতে বেচারার মুখ চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। মুহূর্তেই ওর চোখ কোটরে ঢুকে যায়, কাঁধ ঝুঁকে পড়ে। দীপোর নি:শ্বাস ভারী হয়ে আসে। অনুশোচনায় ওর বড় বড় করুণ চোখ দুটির দিকে দীপো আর তাকাতে পারে না। ও ছুটে পালিয়ে যায়। তারপর?

ওর চোখে আজও সেই সন্ধ্যার দৃশ্য ভাসে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ও এখানে ঘুঁটে সামলে পলিথিন দিয়ে ঢাকবে ভেবে এসেছিল। সামনের ধ্বংসাবশেষে বসে প্রীতো যেন ওরই অপেক্ষা করছিল। ও ভাবে ঘুঁটেগুলি ঢেকে এক্ষুণি ফিরে যাবে। কিন্তু পলিথিনের ভাজ খুলে ঘুঁটে ঢেকে নিজের অজান্তেই প্রীতোর দিকে এগিয়ে যায়। প্রীতো বলে, শেষ পর্যন্ত আমাকে মাঝনদীতে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস? ডুবে যাব যে।

ওর আওয়াজ যেন কুয়োর ভেতর থেকে উঠে আসছে। দীপো সব কিছু ভুলে প্রীতোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে— প্রীতুয়া ব্যস, শেষবারের মতন তোর দীপোকে আদর কর! দীপো ফুঁপিয়ে ওঠে। তারপর এই ধ্বংসাবশেষে অতীত ও বর্তমান যেন একটিমাত্র শরীরে পরিণত হয় যাতে দুটো হৃদয় ছটফট করতে থাকে। প্রীতো বলে, তুই নিজের হাতে একপুরিয়া বিষ দিস্, তারপর যাকে খুশী বিয়ে— দীপো কেঁপে উঠে ওর মুখ চেপে ধরে। তখন বিদ্যুৎ চমকায়। একবার বিদ্যুতের ঝলকানিতে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়। পরস্পরের নিবিড় বন্ধনে ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুত হয়। তবু কাঁপন থামে না।

— এই মেয়ে, তোর মা—

ভোলি দূর থেকে দিপোর মাকে আসতে দেখে গোবরে জল ঢেলে দেয়। দীপোর সুখস্মৃতিও গোবরের গন্ধে চাপা পড়ে। জৈলকৌর দূর থেকে ওদেরকে গোবর ছানতে দেখে রাগ আর আদর মেশানো আওয়াজে বলেন, আরে, ভোলি, লজ্জা নেই তোদের, দীপো তো উন্মাদ, তোর তো মাথায় ঘিলু রয়েছে, এই গাধীর পরশু বিয়ে আর আজ গোবর ছানছে! কী দরকার ছিলো? হাতগুলোর অবস্থা দেখেছিস্? ঈশ্বর না করুন, কোন লসাড়েওয়ালা চলে এলে মুখ লুকানোর জায়গা পাবো না। যা, গিয়ে ঘরে বস্!

এই যাচ্ছি মা, সামান্য গোবর বাকী রয়েছে, একা একা আর কত ছানবে? দীপো নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য আরো কিছু সময় এখানে থাকতে চায়!

সংসারের প্রতি ওর এত মায়া দেখে মায়ের চোখে জল চলে আসে। জৈলকৌর ভাঙ্গা গলায় বলেন, সারাজীবন কি তুই আমার চুলায় কাঠকয়লা ঠেলবি মা, তুই চলে গেলে এই হাতেই তো সব করতে হবে!

মা-বেটিকে সামলানোর জন্যে ভোলি বলে, জেঠি, তুমি ঘরে যাও, আমরা পেছন পেছন আসছি!

জৈলকৌর ওড়না দিয়ে চোখ মুছে বলেন,—পেছন পেছন কী করতে আসবে মা, আমি কুয়োর দিকে যাচ্ছি, তোমরা সোজা ঘরে চলে যেও!

জৈলকৌর কুয়োর পথে এগিয়ে গেলে ভোলি দীপোর বুকের উঠানামা দেখতে দেখতে লোভী হয়ে ওকে একটা চিমটি কেটে বলে, আরে দীপো, তোর শরীর কি ডাঁসা হয়েছে মাইরি!

— আবার শুরু করেছিস? দীপো রেগেমেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—আমি যাচ্ছি, তুই গোবর ছান আর—

— আরে পাগলী, পরশুই তো চলে যাবি ভাই! তখন মনে পড়বে দেখিস!

দীপোর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ওর চোখ দেখে ভোলির চোখেও জল চলে আসে। ওদের গাল গড়িয়ে মুক্তোর মতন অশ্রুবিন্দুগুলি নরম নরম ঘুটের গায়ে পড়ে হাতের ছাপের মধ্যে হারিয়ে

যায়। ওরা গোবর মাখা হাতেই একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতেই থাকে। একসময় ভোলি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,—চল যাই, জেঠি এলে বকবে!

তারপর ওরা গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়।

দু'দিন পর বিশাল বরযাত্রী বাহিনী দেখে দীপো বলে, কি রে তুই তো বলেছিলি পঞ্চাশ-ষাট জন আসবে, এ যে পুরো লসাড়া ভেঙ্গে পড়েছে!

ভোলি বলে,—ঘটক তো তোর মাকে এরকমই বলছিলো, এখন ওরা কনেবাড়ির ওজন মাপতে চলে এসেছে!

গ্রামের ইজ্জতে যাতে আঁচড় না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামবাসীরা হাতে হাত মিলিয়ে বরযাত্রীদের খাতিরদারী শুরু করে। বরযাত্রীরা চা মিষ্টি খেয়ে বারাতঘরে ঢুকে পড়ে। নাপিত মশাই সমস্ত জিনিস একটা ঘরে রেখে দেয়। বরযাত্রীরা পাঁচ-সাতজন করে তাসের আড্ডায় বসে। কয়েকজন চারপাইয়ে শুয়ে পড়ে। কেউ কেউ রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠে। কয়েকজন তরুণ গা আড়িমুড়ি দিয়ে বাইরে ক্ষেতের আল দিয়ে চলতে চলতে এক বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ে। সেই উঠোনে রোদ দেখে ওরা নিজেরাই চারপাই বিছিয়ে বসে পড়ে। বাড়ির মালিক এক ফৌজি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নতুন মুখ দেখেই বুঝতে পারেন, ওরা নিশ্চয়ই বরযাত্রী! ছুটিতে আসাব পর থেকেই বাড়িতে এই বিয়ের চর্চা শুনছেন। তিনি বরযাত্রীদের খাতিরদারী করে বলেন, আরে এ কী, এরকম খালি চারপাইযে বসেছেন! তিনি হাঁক দিয়ে ছেলেদেরকে ভেতর থেকে বিছানা আনতে বলেন। ওরা বলে, থাক থাক, বিছানা লাগবে না!

ফৌজি বলেন, তোমরা কী খাবে, চা না রাম?

টিণ্ডে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। মাগনা পাওয়া মদের লোভে সবার মুখে জল চলে আসে। ওদের চোখ দেখেই ফৌজি বুঝে যান। তিনি ঘরে গিয়ে আলমারি থেকে দুই বোতল রাম আর পাঁচ-ছটা কাচের গ্লাস বের করেন। আপেল ও নাসপাতি কেটে চিনেমাটির প্লেটে রেখে লবণ ও গোলমরিচ ছিটিয়ে দেন। তারপব ওদেরকে ভেতরে ডাকেন, লো ভাই জওযানো, নিজের হাতে ঢেলে যত ইচ্ছা খাও! আরো লাগলে আমাকে আওয়াজ দিও! উনি উঠোনে বেরিয়ে গেলে টিণ্ডে গেলীকে ইশারায় বলে, একটা বোতল তোঁর থলেতে ঢুকিয়ে নে, সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরে খাবো! এখানে তো লাগলে আরো পাওয়া যাবে! তারপর ও নিজের হাতে গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালে।

অন্যদিকে মেয়েদের মধ্যে আটকা পড়ে জামাইবাবাজী জুয়া খেলতে যেতে পারেনি বলে গুমসুম বসে আছে যেন বিড়ালের দলের মধ্যে এক বোবা কবুতব! ভোলি পাশে দাঁড়িযে থাকা মেয়েটিকে কনুই এর খোঁচা দিয়ে বলে, জামাইবাবুর হলো কী, হাঁচেও না কাশেও না!

সেই মেয়েটি বলে, জামাইবাবুর ঠাণ্ডাও লাগেনি যে হাঁচবে আর কাশিও হয়নি যে—

ভোলি বলে, তাহলে জামাইবাবুর সব শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? একথা শুনে মেয়েরা খিলখিলিযে হেসে ওঠে। চাচা অমলী জামাইকে উত্যক্ত করতে দেখে মোটা আওয়াজে বলেন,—মেয়েরা দুষ্টুমি করো না!

— আরে চাচাজী, এরকম দিন কি রোজ রোজ আসে? বীরো নামে মেয়েটি জামাইবাবুর কাঁধে একটা চিমটি কেটে ঠোঁট চেপে চুপচাপ বসে পড়ে। জামাইবাবু বড় বড় চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে ভোলি বলে, শুনেছি লসাড়ের লোকজন ভীষণ পাষণ্ড হয়, ঠিক নাকি জামাইবাবু? জামাই ওর দিকে ঘুরে তাকাতেই ওর চোখ লাল দেখে ভোলি হাত জোর করে বলে, আমাদের দীপোকে ভাল মতন রেখো দাদা!

একথা শুনে মেয়েরা একটু চুপ মেরে যায়। মিট্‌ঠ পরিবেশকে আবার রঙিন করার জন্যে গানের

লড়াই-র প্রস্তাব আনে। বরপক্ষ ও কনেপক্ষের বাচ্চা ও মেয়েরা আলাদা দলে ভাগ হয়ে একের পর এক মুখরা গাইতে থাকে। মিট্ঠুর মুখের সামনেই জামাইবাবু গান ধরলে ওর মুখ থেকে তীব্র মদের ঝাঝ সোজা ওর মুখে ঢুকে পড়ে। ও কোনমতে নাক বন্ধ করে ওখান থেকে দূরে সরে বসে। অন্য মেয়েরাও এখন বুঝতে পারে জামাইবাবুর চুপচাপ থাকার কারণ।

এভাবে রুটি খাওয়ার সময় হয়ে যায়। বরযাত্রীদের কয়েকজন মদের নেশায় নাচতে নাচতে টলতে টলতে খেতে বসে। এক ছাগলদাড়ি যুবক বেসুরো গলায় গান ধরে, — পাথনিয়া পাথে কাণ্ডে...... ঘুঁটেনি গোবর ছানে, ঘুঁটে বানায়.....! ঐ গান শুনে ভোলির চোখ ছলছল করে। নিম্মা দীপোর দিকে বদমাইশি দৃষ্টিতে তাকিয়ে গায়, — এখানে হৃদয় ছুঁয়ে যায়, মন আমার লক্ষেওয়ালীকে চায়!

দিশো নামে মেয়েটিও কম যায় না। সে বলে, এই ধেড়েটা গিরগিটির মতন অন্যের বউ‍ে দেখে কেন রে? ওর কথায় মেয়েরা খিলখিলিয়ে হাসে। বরপক্ষের মেয়েরাও হাসে। নিম্মা অপমানি‍ বোধ করে ওখান থেকে সরে পড়ে।

রুটি খাওয়ার পরই ববযাত্রীদের একজন কেউ বরের কানে ফিসফিস করে কী বলে। ব‍ তৎক্ষণাৎ উঠে ঘটকের কাছে গিয়ে রেগেমেগে বলে, নিম্মা মুর্গার ঠ্যাঙ পায়নি, এখুনি ওকে মুর্গা এনে দাও নাহলে তোমার মেয়েকে.....! ঘটক ওকে শান্ত হতে বলে। কিন্তু মদের নেশায় ও এমনকি মা বোন তুলে অশ্লীল গালিগালাজ করে বলে, এ বিয়ে করবোই না শালা, বরযাত্রীদেব ফেবৎ নিয়ে চলো!

এসব শুনে কনেপক্ষ জবুথবু হয়ে পড়ে। দীপোর এক শহরবাসী দাদা তখন মাঝখানে পড়ে না জানি কী ভুজুংভাজুং দিয়ে ওদেরকে শান্ত করিযে অবস্থা আয়ত্তে আনে। এভাবে বিয়েবাড়ি এক ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেও প্রত্যেক গ্রামবাসী শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর আগে এই গ্রামে এরকম ঘটনা কখনো হয়নি। বয়স্করা ফিসফিসিযে আক্ষেপ করে, বড়ঘর খোঁজার ফল দেখলে, উঁচু প্রাসাদের রঙ কেমন দেখিয়ে গেল!

— আমি বলি কি, বিয়ে সবসময় সমানে সমানে হওয়া উচিত! জৈলকৌর মেয়েটাকে শান বাঁধানো কুয়াতে ধাক্কা দিল! জামাইয়ের বয়সও অনেক বেশী!

এসব কথাবার্তার মধ্যেই ঘটকমশাই বলেন, কৈ গো, তাড়াতাড়ি করো, সন্ধ্যে হযে আসছে, দিনকাল ভাল না, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে! ওর কথায় ট্যাক্সি এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়ায়। কনেবাড়ির লোকজনের মনে ঘটকের চাইতে বেশী তাড়া। তাড়াতাড়ি কনে বিদায় করতে পারলেই ওরা বেশী স্বস্তি পাবে! হাতে হাতে মালপত্র বাসের ছাদে চড়িয়ে ভাল মতন বেঁধে দেয়। কনেকেও তাড়াতাড়ি চৌকাঠ পার করে বাইরে বের করা হয়। গায়ে লাল শাল জড়ানো দীপো যেন স্বর্গের অপ্সরা। ওর মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। দাদা-বৌদি, আত্মীয়া-বান্ধবীদের বুকে জড়িয়ে কাঁদে। ভোলির বুকে ও যখন আছড়ে পড়ে তখন ফুঁপিয়ে কান্না দেখে সবার চোখে জল চলে আসে।

বরযাত্রীরা এখনো নেশায় চুর। ছেলের বাবা মুঠো মুঠো খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দেয়। বাচ্চারা পয়সা কুড়োতে ঝাপিয়ে পড়ে, কাড়াকাড়ি করে। নিম্মা এখনো রেগে আছে। ও বকবক করছে, তোদের মায়ের নাগরদের ঠিক করে দেব, শালা! তারপর বন্ধুদের সঙ্গে টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘুঁটেস্থানে পৌঁছে গিয়ে ঘুঁটের প্রাসাদ ও পিরামিডগুলিকে লাথি মেরে মেরে ভাঙ্গতে শুরু করে। একটা খালি মটকা শূন্যে তুলে এত জোরে ছুঁড়ে ফেলে যে ধ্বংসাবশেষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রীতোর পায়ে লাগে। ও ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে দীপোর বুক ফেটে যায়। ও চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলে, প্রীতুয়া আমাকে ক্ষমা করিস, আমি তোকে ধোঁকা দিয়েছি। দেখ্, ভাগ্য আমার লোভী

চেহারায় কেমন কষে থাপ্পড় মারলো! তুই তো দেখলিই, আমার মতন মেয়ের কপালে এরকম সুখই লেখা থাকে! এখন তো এই একাকী আত্মা থেকে কেবল ভাপ উঠবে, কোন ফুল ফুটবে কি?

নিম্মা চিৎকার করে চরম আক্রোশে সমস্ত ঘুঁটেস্থানকে তছনছ করে দিচ্ছে দেখে প্রীতো গিয়ে ওকে বলে, দাদা, এগুলির কী দোষ, গরীবদের পরিশ্রম—

যাঃ শালা, ঘুঁটে কোথাকার! বলে ও দু'হাত বাড়িয়ে প্রীতোকে ধাক্কা মারতে যায়। কিন্তু প্রীতো একপাশে সরে দাঁড়ালে নিম্মা সোজা গিয়ে কাঁচা গোবরের স্তূপে পড়ে। তারপর উঠে আবার ঘুঁটের পিরামিডগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে।

নষ্ট করা ঘুঁটেগুলিকে দেখতে দেখতে দীপো ভাবে, ওগুলি ঘুঁটে নয়। ওগুলি ওর অতীত। ওর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ও মরে গেছে। ওর আত্মা এই ঘুঁটেস্থান ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজীবন কেঁদে মরবে। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ততক্ষণে ট্যাক্সি পূর্ণগতিতে শহরমুখি বড় রাস্তায় পৌঁছে গেছে।

রচনাকাল ঃ ১৯৯৪

* নম্বরদার ঃ রাজস্ব আদায় ও জমি জরিপকর্মে সনাক্তকরণের জন্য নিযুক্ত পরম্পরাগত পদ।

**মাঙ্গনী ঃ পাকাদেখা

বুটা সিংহ চৌহান

মেয়ের বিয়ে

নিমগাছের নিচে দুটি খাটিয়া। একটায় সরপঞ্চের* ছেলে বসে আছে, অন্যটায় দম্মন পঞ্চ। দু'জনের হাতেই বন্দুক। দু'জনেই প্রস্তুত। ওরা কথা বললেও কান বাইরের দিকে পাতা। একটা শুকনো পাতাও যদি পড়ে ওরা বাইরের দিকে তাকায়।

উঠোন উত্তেজনায় টানটান। প্রত্যেক মুহূর্ত কেঁচোর মতন বুক ঘষটে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। কখন কী হয় কে জানে! যাদের অপেক্ষায় সময় এত উত্তপ্ত তারা এখনো আসেনি। ওদের মেয়ে কাকভোরেই এসে গেছে। এসেই পুরো উঠোন ঝাড় দিয়েছে, কিছু জামাকাপড় ধুয়েছে, দুই প্রস্থ চা বানিয়ে সবাইকে খাইয়েছে। আর এখন বৈঠকখানার জানালার পাশে ইঁটের উনোনে রুটি শেঁকছে।

বৈঠকখানায় বসে থাকা সরপঞ্চ আর জগজীতের কানও বাইরের দিকে পাতা। জগজীত বলে, "আমি তো কাকা তোমার ভরসাতেই.... ডুবালে ডুববো....ভাসালে ভাসবো!"

—"তুই শুধু দেখে যা, শালাদের আসতে দে, তখন দেখবি কামাল!"

সরপঞ্চ ভোরবেলাতেই ছেলে আর দম্মন পঞ্চকে নিয়ে এসেছে। গতরাতেই মদ খেতে খেতে এই পরিকল্পনা পাকা হয়। আজ ভোরে এসে সরপঞ্চ প্রথমে গাড়ি-লোহার*'দের মেয়েকে পরিকল্পনার কথা বলে পাকা করে।

জগজীতের স্বভাব উড়ু-উড়ু। সময়-অসময়ে সরপঞ্চের চার-পাঁচ বস্তা মক্কা উঠিয়ে গুদাম থেকে গাড়িতে রাখতে বললে সে কখনো না করে না। থানায় সরপঞ্চের দহরম মহরম। জগজীত লুকিয়ে চোলাই মদ বানায় আর একথা গোপন রাখবে এমন গ্রাহকদের কাছে বিক্রীও করে।

হঠাৎ সরপঞ্চের ছেলের আওয়াজ শোনা যায়, "আরে, কোন্ দিকে মুখ উঠিয়ে আছিস?" ওর কথায় উঠোনের নীরবতা ছিৎরে পড়ে। সরপঞ্চ জানালা খুলে দেখে উঠোনে পাঁচজন লোক নিরস্ত্র। ওরা এমনভাবে থমকে দাঁড়িয়েছে যেন হঠাৎ সামনে কোন গভীর খাদ এসে গেছে। সরপঞ্চ গম্ভীর আওয়াজে বলে, "ওদেরকে ভেতরে পাঠা।"

গাড়ি-লোহাররা ভেতরে ঢুকলে অঙ্গুরী ঘুরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে। আতঙ্কে ওর গা গুলায়।

নিচে বসতে গিয়ে সরপঞ্চের ইশারায় ওরা খাটিয়ায় বসে। ওদের নম্বরদার আর অঙ্গুরীর বাপ সরপঞ্চের মুখোমুখি বসে। দুইভাই আর কাকা অন্যদিকে পাতা খাটিয়ায় বসে। জগজীত লজ্জায়

উঠোনে বেরিয়ে এসে দম্মন পঞ্চের খাটিয়ায় বসে। সরপঞ্চের ছেলে বলে, "কী রে শালা, ভয় পেলি? ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরে এখন আমাদের চামড়া খেতে এলি?" . '

জগজীত অপ্রস্তুত হেসে বলে, "ভয় পাব কেন, ওরা কিসের পিস্তল নিয়ে ঘোরে!"

দম্মন পঞ্চ বন্দুকটাকে খাটিয়ার উপর শুইয়ে তার পাশে তেরছা হয়ে শুয়ে পড়ে বলে, "কথায় আছে না, খুড়লাম পাহাড় আর বেরুলো ইঁদুর! না ডান্ডা না লাঠি, শালার পাঁচ কাঠঠোকরা, সরপঞ্চ বলছিলো কামারদের কাছে নাকি অনেক অস্ত্র থাকে, ওরা দল বেঁধে আসবে!" শুয়ে পড়ায় অঙ্গুরীর খালি পিঠে ওর নজর পড়ে। ও জগজীতকে জিঞ্জেস করে, "এই বটের*³টা তোর পায়েচাপা পড়লো কি করে রে?"

জগজীত-এর কাছে লোকটার নজর ভাল ঠেকে না। সে অপ্রস্তুত হেসে বলে, "কাকা, ওরা তিনচারজন দলবেঁধে জল ভরতে আসতো। এ আমার দিকে একটু বেশীই তাকিয়ে থাকতো। তারপর ও প্রতিদিন ভোর হতেই সবার আগে একা একা চলে আসতে শুরু করে, এভাবেই একদিন...!"

ভেতরে সরপঞ্চ এই কথাটাই নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে, "তোবা আমার কোন কথা শুনছিস না, কেবল নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছিস। কেউতো আর তোদের গাড়ি থেকে ধরে আনেনি, মেয়ে নিজের মর্জিতে এসেছে! বিশ্বাস না হয় ডেকে জিঞ্জেস কর! আমি তো নিরপেক্ষ, উচিত কথাই বলবো, এখন তোদের মেয়ে যদি যেতে চায়, উঠিয়ে নিয়ে যা!"

"ওর কথা কী বলবো সর্দার, হারামজাদী ঘাটে ঘাটে আমাদের মুখে কালি মাখিয়েছে, আগের গ্রামেও এরকমই করেছে। মাথার ঠিক নেই ওর!"

নম্বরদারের কথা শুনে অঙ্গুরীর একটা রুটি পুড়ে যায়। ও রেগে ঠোঁট কামড়ায়। নম্বরদার সরপঞ্চের চেহারায় চোখ বুলিয়ে নিজের কথার কোন প্রভাব দেখতে পায় না। সরপঞ্চ আগের মতই বুক চিতিয়ে বসে থাকে। মেয়ে ভাল না খারাপ তা শুনে ওর কী হবে? ওকে চুপ থাকতে দেখে নম্বরদার আবার বলে, সর্দার, তুমি ছেলেকে বোঝাও, আমরা মেয়েকে বোঝাই, তুমি জ্ঞানী মানুষ; মেয়েটার সগাই*⁸ হয়ে গেছে, ওর ননদের সঙ্গে আমাদের ছেলের সগাই হয়েছে। তুমি তো জানো আমাদের অদলা-বদলী বিয়ে হয়!"

অঙ্গুরীর বাবা বলে ওঠে, "সর্দার, আমরা তোমার কাছে মাথা নত করে এসেছি, আমাদের ইজ্জত বাঁচাও। জায়গা-জমির মালিক তোমরা, তোমাদের মেয়ের অভাব হবে না, আমরা গরীব, পথের দু'পাশের ঘাস আগাছার মতনই নগণ্য, আজ এখানে, কাল ওখানে! আমাদের লজ্জা বাঁচাও, এত কঠোর হয়ো না!"

ওর বকবক সরপঞ্চের কাছে ফালতু লাগে, তবু নিজের নিরপেক্ষতাকে প্রতিস্থাপিত করতে ও বলে, "তোর মেয়েকে ডাক, ও সাবালিকা, যা চায় তাই মঞ্জুর করবো, এর বেশী আর কিছু করা আইন বিরুদ্ধ!"

"আরে দয়া করো সর্দার!" ওর বাবা মিনতি করে বলে, "আমাদের কোন চাল চুলো নেই!" অন্যরাও গলা মেলায়। অঙ্গুরীর বাবা পাগড়ি খুলতে চায়।

সরপঞ্চ রেগেমেগে বলে, "ঘুরে ফিরে সেই এককথা, রোজ সকালে উঠে যখন ও এখানে আসতো তখন কি তোমাদের চোখে ঠুলি ছিল? দুধও এখান থেকে, জলও এখান থেকে! এখন আমি তোদেরকে শেষ কথা বলবো, গুরদুয়ারায় গিয়ে যদি নন্দ*⁵ দিতেই হয়, নিজে থেকে দিয়ে দে। যদি বলিস, আমি বলে মহারাজকে*⁶ ঘরে নিয়ে আসছি! যদি না মানিস, কাছারী গিয়ে আমাদের ঘন্টাখানেক লাগবে, জজসাহেবের সামনে বয়ান করিয়ে দেব, তারপর যত খুশী টক্কর মারতে থাকিস!"

গাড়ি-লোহারদের মাথায় যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। মনের পুকুরে পাথরবৃষ্টি হতে থাকে। দেওয়ালগুলি সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। মুখে তালা লেগে যায়। ওদের নীরবতায় সরপঞ্চ আশার কিরণ দেখতে পায়। ও চাপ সৃষ্টি করার জন্যে বলে, "তোরা মূর্খ, বুঝতে পারছি না তোদের লোকসান কিসের? ছেলেটা দুই একর জমির মালিক, দুটো মোষ আছে, আধা বিঘা জমির উপর এই বাড়ি, — তোদের আর কী চাই?"

অঙ্গুরীর বাবা কাঁপা আওয়াজে বলে, "দোহাই সর্দার, দু-একদিন চিন্তা করার সময় তো দাও, এমনি কেন মাথায় লোহার ডান্ডা মারছো, এ তো আর গরু-বাছুর কেনা নয়, মেয়ের বিয়ে বলে কথা!"

সরপঞ্চ ব্যঙ্গের হাসি বলে, "এক দু-ই দিন? তোদেরকে দশ মিনিট দিচ্ছি, নিজের হাতে বিয়ে দিতে চাস তো পরামর্শ করে ঠিক করে নে!" এটুকু বলেই সরপঞ্চ বাইরে বেরিয়ে আসে। ওকে দেখেই দম্মন পঞ্চ জিজ্ঞেস করে, "কী দাদা, উট কোন্ দিকে পাশ ফিরে বসছে?"

—"উট এখন আমাদের মর্জিমতনই ওঠাবসা করবে, ওদের মেয়ে আমাদের পক্ষে, এখন যত খুশী বকবক করে করুক না!"

জগজীত বলে, "আমি বলি কি কাকা, চলো কাছারিতেই যাই, আমাকে অঙ্গুরী বলেছে ওরা ভীষণ জালিম, কখনোই মানবে না!"

"না মানুক, আর কিছুক্ষণ দেখি!" তারপর গলা নামিয়ে বলে, "এখানেই মিটিয়ে ফেলতে পারলে ভাল, কাছারিতে গিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কী লাভ? সেখানে বিশটা গ্রামের মানুষ থাকবে, সবাই আমাকে চেনে! তাছাড়া সেখানে গেলে ঘাটে ঘাটে ভালই খরচ হবে, তাড়াহুড়ো করে মাথা গরম করিস না। নন্দ দেওয়া ছাড়া ওদের আর কোন্ন উপায় নেই!"

ঠিক তখনই অঙ্গুরীর বাবা বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গম্ভীর মুখে ওদের পাশ কাটিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়ে। জগজিত আশ্চর্যজনক প্রশ্ন করে, "ও কেমন করে চলে গেল?" সরপঞ্চের ছেলে বলে, "পিস্তল আনতে যাচ্ছে!"

একথা শুনে সবাই হেসে ফেলে।

অঙ্গুরীর মন কেমন করে। নিজের লোকেদের অপমান ওকে কষ্ট দেয়। ও এমন করে এখানে এসে ভুল করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে, এজন্যে ওরা নিজেরাই দায়ী, আমার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে ঠিক করালো কেন? ঐ কালো ভূতটাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না! ঠিক তখনই তেমনি ঝড়ের বেগে অঙ্গুরীর বাবা আবার ফিরে আসে। সরপঞ্চকে বলে, "ভেতরে চলো সর্দার!"

সবাই চুপ। একটা পাতা পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে। সরপঞ্চ ভেতরে যেতেই অঙ্গুরীর বাবা বলে, "ঠিক আছে সর্দার, তোমার আদেশ শিরোধার্য! কিন্তু কালই যদি এ আমাদের মেয়েকে রুটি দিতে মানা করে, অত্যাচার করে?"

—"ওর ঘাড়ে কটা মাথা? জুতিয়ে লম্বা করে দেব শালাকে!"

—"তাহলে আমাদের একটা শর্ত, নম্বরদার বলে, "আমরা মাঝেমধ্যেই মেয়েকে দেখতে আসবো!"

—"চিন্তা করিস না, সব আমার উপর ছেড়ে দে!"

—"তাহলে এই নাও টাকা!" অঙ্গুরীর বাবা কোমরে বাঁধা থলি থেকে একটা রূপোর টাকা বের করে সরপঞ্চের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

—"আমাকে কেন? আমার উপর তোদের কোন অধিকার নেই; আমি তোদের শুভাকাংখী মাত্র; তোদের জামাই-এর ঝোলায় ফেল, ওর উপর তোদের অধিকার!"

সরপঞ্চ জগজীতকে ডাকে। ও ভেতরে গেলে অঙ্গুরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাওয়ার উপর শেঁকতে থাকা রুটির ভাপ ওর শ্বাসের সঙ্গে বুকে চলে যায়।

সরপঞ্চ তার কাঁধ থেকে অঙ্গোছাটা১ নিয়ে জগজিতের হাতে দেয়। জগজিত অঙ্গোছা পাতলে অঙ্গুরীর বাবা তাতে রূপোর টাকা ফেলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নম্বরদার বলে—

—"আমাদের শর্ত বুঝিয়ে দাও সর্দার!"

সরপঞ্চ জগজীতকে বলে, "নে ভাই, এখন তুই সংসারী, এখনও সময় আছে, তোর মনে কিছু থাকলে বল, ওরা মেয়ে নিয়ে চলে যাবে, বিয়ের দুদিন পর কারো উস্কানিতে মাথা গরম করে ভাল-খারাপ, উঁচু জাতি, নিচু জাতির দক্ষযজ্ঞ শুরু করলে আমার থেকে বড় শত্রু আর কেউ হবে না!"

জগজীত সরপঞ্চের ভাষা বোঝে। ও উঠে দাঁড়ায়। নম্বরদার বলে, " আমরা তাহলে যাই সর্দার, ওকে বিয়ের শাড়ি পরিয়ে আনি, মহিলারাও দুচারটে বিয়ের গীত গেয়ে নিক!"

— "না! তোমরা যাদেরকে ডাকতে চাও এখানেই ডাকো!"

—"আরে সর্দার, আমরা তো আর পাখি নই যে উড়ে যাব, এই তো কাছেই বসে আছি, যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ঐ বাইরে বসা বন্দুকধারীদের আমাদের সঙ্গে পাঠাও!" সরপঞ্চের কাছে তখন নিজের জেদ ফালতু মনে হয়। ও বলে, "শোনো কথা, আমি তোদেরকে বিশ্বাস করবো না কেন? তাহলে, একদম দেরী করিস না। তোরা এলে তারপর আমি বিয়ের কাজ সেরে থানায় যাবো, আজ যেতেই হবে!"

অঙ্গুরীর বাবা বলে, "একদম চিন্তা করো না, আমরা দেরী করবো কেন?" তারপর এগিয়ে গিয়ে অঙ্গুরীর হাত ধরে বলে "চল্ আমার রাণী বেটি, বড় ঘরে বিয়ে হবে, ঘরে এত এত জিনিস হবে, তোর বর তোকে চোখে হারাবে! চল্ মা বিয়ের শাড়ি পরে আসবি!"

এবার অঙ্গুরী উঠে ওদের পেছন পেছন চলতে থাকে। দরজার চৌকাঠ পেরুনোর সময় ও যখন ফিরে তাকায় জগজীতের বুকে মোচড় দেয়। ওরা গাড়ি অব্দি নিঃশব্দে হেঁটে যায়।

ওদের আসতে দেখে মহিলারা জড়ো হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কাছে আসতেই নম্বরদার বলে, "আরে, তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছো কি, গীত শুরু কর, মেহেন্দী নিয়ে এসো, আজ অঙ্গুরীর বিয়ে!"

মহিলাদের চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। ওরা হা করে তাকিয়ে থাকে। নম্বরদার বলে, কী হলো বিশ্বাস হচ্ছে না? কোন ব্যাপার নয়, এখুনি বিশ্বাস করবে!"

অঙ্গুরীর মা এগিয়ে এসে মেয়ের মাথা থেকে পা অব্দি দেখে। অঙ্গুরী মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন আকাশ থেকে পড়েছে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার আগে ওর সব কিছু অন্যরকম ছিল, কত তাড়াতাড়ি সব বদলে গেছে। মাকেও পর পর লাগছে, বাপ্-ভাই সবাই যেন পর হয়ে গেছে। ও দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওর মা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ওখানে কেন গেছিলিস?" নম্বরদার বলে, "ওকে আজ কিছু বলো না, আজ ওর বিয়ে, বিয়ের দিন মেয়েকে বকতে হয় না!" বলেই ও অঙ্গুরীর বাবা ও দুই ভাইকে চোখে ইশারা করে।

ওরা অপেক্ষায় ছিল। ওদের চোখ টকটকে লাল। বড়ভাই অঙ্গুরীর হাত ধরে ক্ষিপ্রগতিতে নিয়ে খাটিয়ায় ফেলে। ছোটভাই দ্রুত ওর মুখে কাপড় ঠুসে দেয়। ওদের বাবা গাড়ি থেকে মোটা দড়ি খুঁজে আনে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা সেই দড়ি দিয়ে ওর হাত দুটি খাটিয়ার দুই পায়ে আর পা দুটি খাটিয়ার দুই বাজুতে শক্ত করে বাঁধে।

মহিলা আর বাচ্চারা ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। মাঝেমধ্যে কেউ জোরে চিৎকার করে ওঠে। পুরুষরা চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। নম্বরদারের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার হিম্মত কে রাখে। নম্বরদার ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিচিয়ে বলে, "তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, এই পেত্নীগুলিকে

চুপ করা!" ওর আদেশ শুনতেই ওরা নিজের নিজের পরিবার খুঁজে ধাক্কা দিয়ে পেছনে হটাতে থাকে।

বড়ছেলে অঙ্গুরীর গলায় দড়ি ফাঁসালে অঙ্গুরীর মা এসে নম্বরদারের পায়ে পড়ে, "মেরো না গো, ওকে মেরে ফেলো না। এবারের মতন ছেড়ে দাও!" কয়েকজন বৃদ্ধাও এগিয়ে এসে হাতজোর করে মিনতি করে। নম্বরদার একটি অকথ্য গালি দিয়ে ওদের দিকে তেড়ে এলে ওরা একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়। অঙ্গুরীর মা নম্বরদারের পায়ের ধাক্কায় একবার উল্টে পড়ে। সে আবার উঠে ধূলিধূসরিত শরীরে আবারও নম্বরদারের পায়ে পড়ে বলে, "মেরো না গো, ঈশ্বরের দোহাই ছেড়ে দাও ওকে!"

— "কেন মারবে না?" নম্বরদার গর্জে ওঠে, " বল, কেন মারবে না? আজ এ গিয়ে জাটের ঘরে বসবে, কাল তোর দ্বিতীয় মেয়েটা যাবে, তারপর দেখাদেখি আমাদের সব মেয়েরা জমি জিরেত অলা জাটদের ঘরে গিয়ে বসবে, তখন এই ছেলেগুলিকে কে মেয়ে দেবে?"

অঙ্গুরীর ভাইদের একটা করে পা মাটিতে আর অন্যটা খাটিয়ার বাজুতে। ওরা দাঁত খিঁচিয়ে কুয়ো থেকে জল তোলার ভঙ্গীতে দড়ি ধরে টানছে। ওদের ফুলে ওঠা মাংসপেশীর শক্তিতে অঙ্গুরীর গলা কেটে দড়ি ওর শরীরে ঢুকছে। কেউ পৃথিবীর কোন বিয়ের কণের চেহারা এরকম কল্পনা করতে পারে না। দেখতে দেখতে ওর চোখ দুটি ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

রচনাকাল ঃ ১৯৯৬

*১ সরপঞ্চ - গ্রামপ্রধান, *২ গাড়ী লোহার - গরুর গাড়ি কিম্বা মোষের গাড়ি নিয়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো যাযাবর - কামার। *৩ বটের - বড়জাতের তিত্তির, গায়ের রঙ ধূসর। পাঞ্জাবে মুর্গীর লড়াই-এর মতন বটের বাজরা বাজী ধরে বটের পাখির লড়াই লড়িয়ে লোকের মনোরঞ্জন করে। *৪ সগাই - পাকাদেখা, *৫ নন্দ -বিবাহের ঔপচারিক উপঢৌকন। *৬ মহারাজ -গুরদুয়ারার পূজারী। *৭ অঙ্গোছা - দামী গামছা জাতীয় পাতলা চাদর।

জোগে ভঙ্গল

হারানো হাসি

বউমার মনে একদিন খটকা লাগে। ও আমার কাছে চুপিচুপি বলে, "ডাডি, আজকাল মাম্মি একদমই কথা বলে না!.... কিছু একটা হয়েছে!" ওর আওয়াজে উৎকণ্ঠা।

আমি মুচকি হেসে বলি, না না, এরকম কিছু না, ও তো এরকমই, শুরু থেকেই চুপচাপ খুব কম কথা বলে!

"কিন্তু এখন তাও বলে না!"

"আচ্ছা আমি দেখছি, তুমি নিজের কাজে যাও!" আমি ওর কথা উড়িয়ে দিই। আমি ভাবি, আমি কি সরোজকে চিনি না, সরোজও আমাকে ভালমতন চেনে! ঊষা তো সেদিনের মেয়ে, এই তো ক'মাস আগে এবাড়িতে বউ হয়ে এসেছে। ও আর কতদূর চেনে!

কিন্তু বিকেলবেলায় ঊষা আবার এসে কাঁদো কাঁদো আওয়াজে বলে, "ড্যাডি! ওতো আজ রুটিও খায়নি!"

—"কী, রুটি খায়নি?" আমার চোখ কপালে ওঠে। কী হয়েছে সরোজের? কিছুই মাথায় ঢোকে না। ঊষা আমার সামনে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে।

—"আমি তো অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি। হাত লাগিয়ে দেখতে গেলে বাগী চোখে এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিয়েছে!"

ওর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ি। আমি উঠে ওকে খুঁজতে শুরু করি। "সরোজ, সরোজ, তুমি কোথায় সরোজ?" কই, ও কোথায়? সারা বাড়ি খুঁজে আমি উঠোনে বেরিয়ে দেখি ও গোয়ালের সামনে পাতা একটা খাটিয়ায় বসে মাটিতে কাঠি দিকে দাগ কাটছে। আমি ওর পাশে বসে হাত ধরে জিঞ্জেস করি, "শরীর ভাল তো?"

ও কোন জবাব দেয় না। থমথমে চেহারায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে। আমি অবাক হয়ে জিঞ্জেস করি, "কোথাও ব্যথা করছে?... কেউ কিছু বলেছে? .... কিছু বলবে তো?" আমি ডাক্তারের মতন ওর কপাল, গলা, পেট ও পিঠে হাত লাগিয়ে হাতুড়ের মতন কিছু বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। ঊষা কিছু বলেনি তো? না না, আমি এ কী ভাবছি! ও তো বউ নয়, আমাদের মেয়ের মতন হয়ে গেছে, ও সরোজকে তেমন কিছু বলতেই পারে না, আর কিছু বললেও মেয়ের কথায় কি মায়ের রাগ করা উচিত? না কি অন্য কেউ কিছু বলেছে? না, তাও কেমন করে

হবে, ওকে ইদানীং কারো বাড়িতে যেতেও দেখিনি। তেমন কেউ আসেও নি, আমি কি কিছু বলেছি? কই, না তো? সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না! আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

আমাদের এখানে কাউকে নিজের দুঃখের কথা বললে সে এত সুন্দর উপদেশ দেয় যে শুনে মনে হবে ওর কথা শুনলেই সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তারপর সারা গাঁয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। মাগনা পরামর্শ দিতে অনেকেই এগিয়ে আসে। কয়েকজন বলে—"কুয়োওয়ালা বাবার সামনে মাথা ঠেকিয়ে আসুন!"

আমি এসব বাবাটাবায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু এখন? সরোজকে সারিয়ে তোলার জন্যে আমি সব করতে পারি! লোকের কথা মতন সরোজকে নিয়ে গিয়ে কুয়োর বাবার সামনে মাথা ঠেকাই। ওর কাছ থেকে মন্ত্রপুত ভস্ম নিয়ে আসি! কিন্তু এতে কোন লাভ হয় না।

তারপর কয়েকজন শুভাকাঙক্ষী আমাদেরকে এক চ্যালার কাছে যেতে বাধ্য করে। সে নাকি একেবারে ঈশ্বরের বরপুত্র। আমি গিয়ে তার কাছেও শ্রদ্ধানত হয়ে মাথা ঠেকাই।। চ্যালা অনেকক্ষণ ধরে নানারকম যন্ত্র-মন্ত্র করে। বড় লোহার চিমটা হাতে নিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে সরোজের ভেতর থেকে কিছু বের করতে চায়। কিন্তু সেটা বেরিয়ে না এলে ও সেই চিমটা দিয়ে সরোজকে পেটাতে শুরু করে। আমার রাগ হয়, কষ্ট হয়। তবু ওর সামনে ভদ্রলোকের মতন হাতজোড় করে বসে থাকি। অবশেষে চ্যালার হাত থেকে চিমটা নিচে পড়ে যায়। যেন ও সরোজের ভেতরের বস্তুকে তাড়াতে তাড়াতে নিজেই পালিয়ে বাঁচতে চায়।

তবু বিনে পয়সার পরামর্শদাতাদের আনাগোনা চলতে থাকে। কিন্তু আমি আর ওদের কথামতন কোথাও যেতে চাই না। 'হু' কিম্বা 'হ্যাঁ' বলে ওদেরকে এড়িয়ে যাই। উষাও তাই করে। ওর কাছেই বেশীর ভাগ মহিলারা পরামর্শ দিতে আসে। আমরা আলোচনা করে ঠিক করি যে শহরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাবো। পরদিনই আমি সরোজকে নিয়ে বাসে করে শহরে যাই। ডাক্তারবাবু ওকে ভালমতন চেকআপ করে বলেন, "আর ওর কোন রোগ নেই, শুধু দুর্বলতা!" তারপর ডাক্তারবাবু আমাদের দু'জনকে আলাদা আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। সরোজের বন্ধ মুখ আর মাথা নাড়ানো কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখে বোঝা যায় যে ও 'হুম, হ্যাঁ' ছাড়া আর কোন কিছুই বলেনি। তারপর ডাক্তার আমাকে কাছে ডাকে আর ওর সামনেই কানে কানে কিছু বলে। ডাক্তারের কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্তায় পড়ে যাই। তিনি দুর্বলতার ঔষধ লিখে দেন। আমরা দোকান থেকে সেই ঔষধ কিনে বাসে চড়ে গ্রামে ফিরে আসি।

বাসে বসে অতীতের কথা মনে পড়ে। ছেলের বিয়ে, উষা আসার পর বাড়িতে হৈ-হুল্লোড়, খুশী, গল্পগুজব সবকিছু মনে পড়ে। বাড়ি ফিরে আমি বৈঠকখানায় ঢুকে চেয়ারে বসে ডাক্তারের বলা পদ্ধতির কথা ভাবি। এসময় জগদীশ থাকলে কত ভাল হতো! ও দুতিনবার পরীক্ষা দিয়েও মেট্রিক পাশ করতে না পেরে নিজের মর্জিমতন গিয়ে আর্মীতে ঢুকে পড়ে। আমি ব্যাঙ্কের কর্মচারী। ও আর্মীতে ঢুকলে আমাদের বাড়ি শ্মশানের মতন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সরোজ চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতে পছন্দ করে। কথার জবাব 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' দিয়েই সেরে নেয়। শুরুতে আমার বেশ অস্বস্তি হতো। ধীরে-ধীরে অবশ্য অভ্যাস হয়ে যায়।

ছেলে প্রথমবার ছুটিতে এলেই ওকে বিয়ে করিয়ে দিই। উষা এ বাড়িতে পা রাখতেই সারা বাড়ি যেন ঝলমলিয়ে ওঠে। ও যখন চুমকি লাগানো সালোয়ার কামিজ পরে এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়ায় আমার মনে হয় যেন পুরো আকাশটাই আমাদের টিমটিমে ঘরগুলিতে নেমে আসে। ওর কথা বলা, ছুটে ছুটে কাজ করা, ওর হাসিমজা আমাকে আনন্দে মাতিয়ে রাখে। জগদীশ দুমাসের ছুটি কাটিয়ে ইউনিটে ফিরে গেলে দুই একদিন সামান্য ঝিমিয়ে থাকলেও ওর স্বভাব মতন

তারপর থেকেই ও ধীরে ধীরে আমার আর সরোজের পুত্রবধূ থেকে মেয়ে হয়ে পড়ে। এখন আর সরোজের নিজেকে নিয়ে খুশী থাকার পরামর্শ আমাকে কষ্ট দেয় না। প্রতিদিন উষার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়েই চলে। অফিস থেকে ফিরতেই না জানি কি করে উষা টের পেয়ে যেত, আমি ঘরে ঢোকার আগেই ওর আহ্লাদী আওয়াজ শোনা যেত,

—"এই নাও ড্যাডী, জল!"

—"দাও! তোমাদের শরীর-টরির ভাল তো?"

—"জী ড্যাডী!"

আমি পোশাক পাল্টাতেই ও চা নিয়ে আসে। ও সবসময় আমার ফাইফরমাশ খাটতে থাকায় আমি যেন ভুলেই যাই যে এ বাড়িতে সরোজ নামেও কেউ আছে। এটা আমার ভুল। আমি এখন সেটা অনুভব করি।

আসলে ওকে পেয়ে আমি যেন আবার শৈশবে ফিরে গেছিলাম। ভোরে ও যখন আমার ঘুম ভাঙ্গাতো মনে হতো যেন অনেকদিন পর মা আমাকে ডাকছে। 'গুড মর্নিং ড্যাডী! শুনতেই আড়িমুড়ি ভাঙ্গি, আর উঠে বসে বলি, 'গুড মর্নিং মামণি!' আমি জানি ওর এখন পা ভারী। ও আমার কথা শুনে লাজুক লাজুক চেহারা নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে গিয়েই হয়তো ওর মনে পড়ে যে আমি এখন স্নানঘরে যাবো, ও চেঁচিয়ে বলে, "বাথরুমে কাপড়জামা রাখা আছে ড্যাড!"

স্নান করার পর অফিসের জামাকাপড় পরে যদি দেখি কোন বোতাম ছেঁড়া আমি উষাকে আওয়াজ দিই, 'ওহো! জামার বোতাম হাপিস যে!' ও তক্ষুণি সুঁইয়ে সুতো ভরতে ভরতে আসে আর আমাকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার উপযুক্ত করে দেয় হাসিমুখে। আমি অজান্তেই বলে ফেলি, "আগের জন্মে তুমি আমার মা ছিলে!"

ও লাজুক হেসে বলে, "আর এ জন্মে মেয়ে!"

সন্ততি প্রতীম পুত্রবধূর মিষ্টি জবাব আমার দারুণ লাগে। আমি ওর কথা জগদীশকে চিঠিতে লিখে জানাই। এখন এমনি কোথাও বেরুলেও অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, "উষা, পাঁচ মিনিটে ঘুরে আসছি!"

আমি আজ অনুভব করছি অনেকদিন ধরে সরোজের নাম ধরেই ডাকিনি। এজন্যে কি ও ঘরের মধ্যেই পর হয়ে গেছে? কিন্তু ওর স্বভাবই তো একা একা থাকা! ডাক্তার বলেছেন "কিন্তু আপনার স্বভাব তো আর এরকম নয়, আপনার উচিত ওর সঙ্গে আগের মতন ব্যবহার করা!"

হয়তো ওর কথাই ঠিক। সেজন্যেই হয়তো আমাদের সঙ্গে কথা না বললেও ও গাইবাছুরদের সেবাযত্ন ঠিকমতনই করে যেত।

আমি বৈঠকখানার চেয়ারে বসেই হাঁক দিই, "সরোজ! চা আনো ভাই, একটু নিজের হাতে কড়া করে বানিও! মাথাটা ভীষণ ধরেছে!"

মিনিট খানেক পরই ও চা নিয়ে আসে। ও চা রেখে ফিরে যাচ্ছে দেখে আমি বলি, "সরোজ! জামাকাপড় দিয়ে যাও!" ও আমার কথা শুনে একবার দাঁড়ায়, তারপর মাথা নেড়ে চলে যায়। আমি এপাশ ওপাশ তাকাই। কোন বাহানায় এখন ওকে এখানে বসাতে পারলে হয়। তখনই ভাবি, ধ্যাৎ কী অন্যমানুষের মতন ভাবছি, ওতো আমার স্ত্রী, ওকে বাহানা করে বসাতে হবে কেন? সরাসরি বসতে বললেই তো হয়। আসলে আমি অনেকদিন এরকম বলিনি বলে আজ সংকোচ হচ্ছে।

সরোজ আমার জামাকাপড় নিয়ে এলে, আমি বলি, "সরোজ, এখানে এস, আমার পাশে বসো!" ও গুটি গুটি কোনরকম শব্দ না করে আমার কাছে এসে বসে। ওর চেহারা লজ্জায় লাল

হয়ে ওঠে। আমি ভাবি, সত্যিই তো একই বাড়িতে থেকে পরস্পরের থেকে কত দূরে সরে গেছিলাম। এখন কাছে আসতে ও লজ্জা পাচ্ছে।

আমি বলি, "আমার দিকে তাকাও!" আমার আওয়াজ কাঁপে। সরোজ একবার চোখ তুলে আমার চোখে তাকিয়ে একেবারে নতুন বউ-এর মতন মাথা ঝুকিয়ে নেয়। আমিও ওর সঙ্গে নজর মেলানোর চেষ্টা করে বলি, 'একটু হাসো ভাই!" এবারও আমার গলা কাঁপে।

সরোজ আমার এই অপ্রস্তুত ভাব দেখে নাকি আমার আব্দার রাখতেই ফিক করে হেসে ফেলে নিঃশব্দে।

আমি অজান্তেই হা হা করে হেসে উঠি। সারা ঘরের সমস্ত আসবাব তৈজসপত্রে আমার হাসি ছড়িয়ে যায়। সরোজ বলে, 'পাগল হয়ে পড়োনি তো?"

'না, হতে হতে বেঁচে গেলাম!"

রচনাকাল: ১৯৯৬

বলবীর পরওয়ানা

ভুলে যাওয়া

বিয়ের একমাস পরই মলকীত দুবাই চলে যায়। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে দুবাই-এর এজেন্ট যেন দেবদূত! ও মাসখানেক পর থেকেই টাকা পাঠাতে শুরু করে। অনেক অনেক টাকা! ওর পাঠানো টাকায় বাড়ির অবস্থা ভাল হয়। নতুন পাকাবাড়ি তৈরী হয়। ছোটভাই ছিন্দর মোটর সাইকেল কেনে। আরো নানা সুখ সুবিধা; একেবারে বড়লোকদের মতন। কিন্তু পালী? ওর খবর কে রাখে? ও মলকীতকে লম্বা লম্বা চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকে। প্রতি চিঠিতেই মিনতি করে একবারটি দু'চোখ ভরে দেখার জন্যে, 'ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো!'

কিন্তু ও আসতে পারে না। দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ছিন্দরের সঙ্গে পালীর বন্ধুত্ব নিবিড় হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, মার্কেটিং করতে যেখানে দেখ ছিন্দরের মোটর সাইকেলের পেছনে পালী। ওদের কথাবার্তা, ওদের ব্যবহার, স্কুটারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দেখে-শুনে বাইরের কেউ বুঝতে পারবে না যে ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়।

বাড়ি পাহারার বাহানায় বৃদ্ধা শাশুড়ির খাটিয়া বৈঠকখানায় পাতা হয়। ক্রমে তিনি সেখানেই শুতে শুরু করেন। ছিন্দর বৌদির ঘরেই শুতো। এমনিতে একটা আলাদা খাটিয়া ওর জন্যেও পাতা ছিল। কিন্তু ও পালীর সঙ্গেই শুতো। শাশুড়ি দু-চারদিন একা একা বকরবকর করে তারপর ধীরে ধীরে চুপ হয়ে যান।

চার বছর পর হঠাৎ একদিন মলকীতের ফেরার তারিখ জানিয়ে চিঠি আসে। চিঠি পেয়ে পালী কেঁপে ওঠে, "আরে আমি তো ভুলেই ছিলাম!"

সেদিনই ছিন্দরের খাটিয়া বাইরের বৈঠকে চলে যায়। ও প্রতিদিন কোন চাকুরীর খোঁজে হন্যে হয়ে এই অফিস ঐ কোম্পানী ঘুরতে থাকে। এখন বাড়িতে প্রতিদিন মলকীতের গল্প চলতে থাকে। শাশুড়ী ওর ছোটবেলার গল্প বলেন। পরিবারের জন্য ওর অবদান-এর কথা বলেন। কিন্তু পালী সবসময়ই একটা অস্বস্তিতে ভোগে। মলকীত ফিরলেই ওর শাশুড়ী গত চার বছরের সমস্ত ভেদ খুলে দেবে না তো? এই ভেবে রাতে বিছানায় ছটফট করে। ঘুম আসতে চায় না। শালার বুড়ি মরে না কেন?

একদিন সন্ধ্যায় ওর শাশুড়ী রাক্ষী গভীর চিন্তামগ্ন পালীকে ডেকে কাছে বসিয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে বলে, "দেখ মা, ভুলেও কিন্তু ছিন্দরের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা মলকীতকে বলো না, তাহলে দু'ভাই পরস্পরের শত্রু হয়ে পড়বে। ঐ বছরগুলি তুমি ভুলে যাও!"

সেই রাতে অনেকদিন পর পালী নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

রচনাকাল ঃ ১৯৯২

ডাঃ অজয় শর্মা

ছাব্বিশ ইঞ্চির কালো সাইকেল

যখনই গ্যারেজে ঢুকি একবার ঐ সাইকেলের উপর আমার নজর পড়ে। বাচ্চাদের হৈ-হুল্লা, অফিস যাওয়ার তাড়া থাকায় মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ি। এটা কোন সাধারণ সাইকেল নয়, এটাকে যদি বিশেষ সাইকেল থেকেও উপরে স্থান দিই তো ভুল হবে না।

যদিও দুটো চাকা থেকেই হাওয়া বেরিয়ে গেছে, রিম দুটোয় জং লেগে গেছে, ব্রেক-লেদার ইত্যাদির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়েছে। তবু ওর কালো ফ্রেম আর সবুজ সিট-কভার আজো একে জীবন্ত করে রেখেছে। এর বেলের ক্রিং ক্রিং শুনে মনে হবে এখনো ওর হৃদয়ের ধুকপুকানি দ্রুতলয়ে চলছে। অনেক বছর ধরে বেকার দাঁড়িয়ে থেকে গতিহীন কিন্তু তবু এক বিশেষ পরিচয় নিয়ে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঝেমধ্যেই ভাবি এটাকে একদিন পরিষ্কার করবো। কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় তা আর হয়ে ওঠেনি। বাচ্চাদের পরীক্ষা হয়ে গেলে ওরা ওদের মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি গেছে। আজ রবিবার। সকাল সাতটা নাগাদ শ্যামলালকে চা বানিয়ে গ্যারেজে আনতে বলে গাউনের পকেটে সিগারেট ও লাইটার নিয়ে সোজা গিয়ে শাটার উঠিয়ে গ্যারেজে ঢুকি। গাড়ির পেছনে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাই। তারপর জানালার কাঁচ নামিয়ে স্টিরিও অন করে দিই। তারপর একটা ন্যাকড়া দিয়ে সাইকেলটাকে মুছতে শুরু করি। একটু পরেই শ্যামলাল চা নিয়ে ঢোকে। ওকে বলি কারো ফোন এলে বা কেউ দেখা করতে এলে বলো আমি ঘরে নেই।

চা খেয়ে আবার সিগারেট ধরাই। একবার জোরে টেনে ধোঁয়াটা জোরে চেনের দিকে ছাড়ি। তখন আমার নজর ওর চেনেই আটকে যায়। ওর গ্রীজের উপর না জানি কতটা ধুলোর পরত জমেছে! তা দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ে। তিনি নিয়মিত সপ্তাহে দুই-তিনবার সাইকেলে গ্রীজ লাগাতেন। এর ফ্রেমের দিকে চোখ পড়তেই আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে। আমাকে আর আমার কয়েকজন বন্ধুকে এই সাইকেল চালাতে দেখে বাবার চোখ চকচক করে উঠতো। তিনি খুশী হয়ে বলতেন, যেদিন এটাকে নতুন কিনেছি দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে লোকে দেখতে এসেছিল! লোকে বলতো, মাস্টারমশাই এমন একটা কালো ঘোড়া কিনেছে যে ঘাস খায় না!

শুরুতে মনে হতো বাবা গপ মারছেন। শুনে হাসি পেত, বিশ্বাসই হতো না। কিন্তু কিছুদিন পরই বাবার এক প্রবাসী ছাত্র বিদেশ থেকে একটা টি. ভি. সেট এনে বাবাকে উপহার দেয়। তখন

পাড়ার সমস্ত লোক আমাদের বৈঠকখানায় ভিড় করে আর ওটাকে নিয়ে অদ্ভুৎ সব মন্তব্য করে। আমার ভালমতন মনে আছে দূরদর্শন থেকে প্রথম সিনেমা 'পাকিজা' দেখানো হয়েছিল। সেদিন সিনেমা চলতে চলতে এক জায়গায় একটা গাড়ি যখন পুরো স্ক্রীনে চলে আসে প্রতিবেশী এক তাগড়া জোয়ান ভয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছিল। এরকমই আরো কিছু ব্যাপার দেখে বাবার কালোঘোড়ার গল্প আমার এখন সত্যি বলে মনে হয়।

আমার দৃষ্টি সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে পড়তেই মনে পড়ে যে এতে একটা ব্যাগ ঝুলতো, তার ভেতরে একটা ডাইরি, স্কুলের হাজিরা খাতা, কয়েকটি বই আর একটা ছোট গোল লাঠি। লাঠির কথা মনে পড়তেই বাবার রাশভারী চেহারা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তিনি প্রায়ই বলতেন, বিগড়িআঁ-ডিগড়িআঁ দা পীর ডাণ্ডা! — বিগড়ানো ছেলেদের ঠিক করার মোক্ষম উপায় হলো লাঠ্যৌষধ! আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। কিন্তু কোনদিনই ওকে কারো উপরে এই মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে দেখিনি।

বড় হওয়ার পর কয়েকবার বাবাকে বলেছি, চলুন, সাইকেলটাকে বিক্রি করে দিই, কিছুতো হাতে আসবে! দুনিয়া এতো এগিয়ে গেছে! কিন্তু আপনার মায়া এই ভাঙ্গা বাহনে আটকে রয়েছে! আপনার বন্ধু সোহন সিংকে দেখুন, অটোমেটিক গীয়ারওয়ালা স্কুটার নিয়ে স্কুলে আসেন। ...... মোপেড তো প্রায় সব শিক্ষকই নিয়ে নিয়েছে! ..... সময় দ্রুত পাল্টাচ্ছে, কিন্তু আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনি তো জানেন, পরিবর্তনই প্রকৃতির নিয়ম, সময়ের সঙ্গে মানুষকেও পাল্টাতে হয়, না হলে আপনি অসম্পূর্ণ ও একা রয়ে যাবেন, পেকে যাওয়া ফল যেমন একসময় পচতে শুরু করে!

বাবা আমার কথা শুনে শুরুতে চুপ করে থাকেন। কিন্তু এক দুইবার শুনে একদিন বলেন, বাবা আমি তোর সঙ্গে একমত যে পরিবর্তন আসা জরুরী, আমিও তাই চাই। কিন্তু .. .... কিন্তু কোন কিছুতে মোহ থাকলে, ভাল লাগলে, তাকে এই পরিবর্তনের ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রাখো। ভালবাসা কোন প্রকৃতির নিয়মকেই মানে না। ভালবাসা অজর অমর অক্ষয়। ভালবাসা আত্মা, ভালবাসাই পরমাত্মা, ভালবাসার পরিবর্তন হয় না। ভালবাসা কখনো পচে না। এর উপর কোন নিয়ম খাটে না। কাউকে কখনো বলতে শুনেছিস যে আগে একে ভালবাসতাম আর এখন ভালবাসি না?! কখনো শুনিসনি !

বাবা এভাবেই নিজের বক্তব্য স্থাপন করে, এটাই ভালবাসা, আগে যাকে ভালবাসতাম, এখনও তাকে ভালবাসি, ... ভালবাসা পাল্টায় না! এজন্যেই ভালবাসা আত্মার নামান্তর, ভালবাসা পরমাত্মার পরিচায়ক, পরমাত্মার বিনাশ হয় না...... তার মানে ভালবাসারও বিনাশ হয় না। এখানে কোন নিয়ম খাটে না, চেঞ্জ হয় না!

বাবা একই কথা বারবার বলতে থাকেন। বুড়ো মানুষদের স্বভাবই এরকম। সেদিনের পর আর কোনদিন ওকে সাইকেল নিয়ে কিছু বলিনি। এখন হঠাৎ আঙ্গুলে সিগারেটের ছ্যাকা লাগতেই আমি চমকে উঠি। সিগারেট ফেলে ভাবি, রিটায়ারমেন্টের পর বাবা যেদিন সাইকেল ছাড়েন তারপর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন।

এখন আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা প্রায়ই সাইকেলটাকে ভাঙ্গা পুরনো জিনিসের দোকানে কিম্বা কবাড়িএ-কে বিক্রি করতে বলে। আজ আমি এটাকে বাইরে ফেলতে পারতাম, কবাড়িএ-কেও দিতে পারতাম। কিন্তু আমি ঝেড়ে মুছে এর চেনে গ্রীজ লাগাই। চাকায় হাওয়া ভরার কথা ভাবি। আমিও কি এখন বাবার মতন মোহগ্রস্ত? আমার উপরেও কি প্রকৃতির কোন নিয়ম খাটে না? নাকি এই মোহই প্রকৃতির নিয়ম?

রচনাকাল: ১৯৯৭

বীণা ভার্মা

লেপ

ও নাক মুখ ঢেকে শুয়ে রয়েছে। বেলা এগারোটা। রোদও উঠেছে। কিন্তু ও লেপ থেকে মুখ বের করেনি। বুড়ি মরে যায়নি তো? পুত্রবধূ কেইথী এসে কয়েকবার লেপ তুলে দেখে গেছে। কিন্তু ওর শ্বাস ঠিক মতন চলছে দেখে ও প্রত্যেকবারই আবার ওর মুখ ঢেকে দিয়ে গেছে। নটা নাগাদ একবার জাগিয়ে চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় হরবন্স কৌর চোখ বন্ধ করেই মাথা নেড়ে মানা করে পাশ ফেরে।

কেইথী ওকে বেশী কিছু বলে না। ভাষা সমস্যা! হববন্স কৌর ইংল্যান্ড এসেছে প্রায় কুড়ি বছর আগে কিন্তু এখনো ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারে না। ছেলে আর বউ সারাদিন ইংরেজীতে খটরমটর করে বলতে থাকে. কিন্তু ও কিছুই বুঝতে পারে না। কেইথী কোন প্রশ্ন করলে ও কিছু না বুঝেই "ইয়েস ইয়েস," অথবা "নো, নো" বলে দেয়। এই "ইয়েস ইয়েস. নো-নো" কয়েকবাব ঘরে ঝগড়ার সৃষ্টি করেছে।

সৎবীর আর কেইথীর বিয়ে বেশীদিন হয়নি। বিয়ের পরপরই একদিন ও ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে হরবন্স কৌর-এর ঘরে ঢুকে পড়ে। হরবন্স কৌর গুরুদুয়ারায় গেছিল। কেইথী ওর ঘর পরিষ্কার করে শাশুড়ীর পুরনো বিছানা উঠিয়ে নতুন বিছিয়ে দেয়। ফিরে এসে নিজের ঘরেব নতুন চেহারা দেখে হরবন্স কৌরেব মাথা খারাপ হয়ে যায়। ও পুত্রবধূকে বলে, "মী নো রজাই* ?"

"ইয়েস মেম, ইউ ডোন্ট নীড দ্যাট ব্যাগ এনী মোর। দ্যাট ইজ টু ওল্ড! আই ব্রট দিস নিউ ব্ল্যাঙ্কেট ফর ইউ!" কেইথী বিছানায় পাতা নতুন বেডশীটে বিছানো গরম কম্বলটাকে হাতে নিয়ে দেখায়।

"নো কম্বল... মী রজাই!" হরবন্স কৌর বাচ্চাদের মতন কাঁদতে শুরু করে। কেইথী ঘাবড়ে গিয়ে বলে, ... হোয়াট হ্যাপেন্ড?... হোয়াই আর ইউ ক্রাইং?

"নো নো ... মী রজাই।" ও কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। হতবাক কেইথী ওর পেছন পেছন ছোটে।

হরবন্স কৌর বাইরে রাখা নোংরার ব্যাগ থেকে নিজের লেপটা বের করে আনে। বিছানা থেকে নতুন কম্বলটা তুলে কার্পেটের উপর রেখে দেয়। কেইথী হরবন্স কৌরের এই ব্যবহারে নিজেকে

অপমানিত ভাবে। রেগেমেগে শাশুড়ীর হাত থেকে লেপ কেড়ে নেয়। ও চিৎকার করে বলে, "দিস্ ভেরী ওয়ের ডার্টি... নট গুড ফর ইয়োর হেল্থ..!"

"নো নো—সৎবীর......... সৎবীর........ ও সত্তে !"

সৎবীর অন্য কামরা থেকে মায়ের আর্ত চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখে হরবন্স কৌর লেপের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কাঁদছে আর কেইথী ওর নীচে থেকে লেপটাকে টেনে বের করার জন্য টানাটানি করছে। ওকে দেখতে পেয়ে হরবন্স কৌর হাউমাউ করে কেঁদে বলে, "দ্যাখ বাবা, আমার লেপ!"

মায়ের চোখে জল দেখে সৎবীরের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ও বাঁহাতে কেইথীর সোনালী চুল মুর্গী ধরার মতন খাবলে ধরে বলে, হাউ ইউ ডেয়ার্ড? তারপর ডান হাতে ওর গালে দুই থাপ্পড় কষে। কেইথী বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "হোয়াটস রঙ উইথ ইউ?"

সৎবীর ওকে ছেড়ে দিয়ে মাকে মেঝে থেকে ওঠাতে ওঠাতে কেইথীর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "ডোন্ট ট্রিট মাই মাদার লাইক আ শিট্, ইউ বীচ!" কেইথীর বাদামী চোখ জলে ভরে ওঠে, "আই ওয়াজ জাস্ট ক্লীনিং হার রুম!" সৎবীর দাঁতে দাঁতে ঘষে বলে, "ডোন্ট টাচ্ হার থিংস, লেট হার লিভ এজ শী লাইকস.....!"

কেইথী অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "হাউ শী ক্যান লিভ ইন সাচ্ আ ডার্টি রুম? অ্যান্ড হাউ উই ক্যান লীভ উইথ হার?"

ওর কথা শেষ হতে না দিয়েই সৎবীর আবার গিয়ে ওর চুল ধরে বলে, "দ্যান গো টু হেল;; আই অ্যাম গোইং টু লিভ উইথ মাই মাদার ইন দিস ডার্টি প্লেস, ইউ গেট লস্ট!" ও আবার থাপ্পড় মারতে গেলে হরবন্স কৌর এসে ওর দুর্বল হাত দিয়ে আটকায়।

"না ওয়ে পুত্তর, ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করিস না। ও আমার কথা বুঝতে পারেনি, ওকে ভালবাসা দিয়ে বুঝিয়ে বল।" ও সৎবীরকে ঠেলে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। সৎবীর বলে, "আর তো কিছু বলিনি মঁম, শুধু বলেছি এই বাড়ীতে থাকতে হলে মঁমকে সম্মান করতে হবে।"

"আমার সম্মানের দরকার নেই, ব্যস কেবল আমার ঘরে হাত না দিলেই হলো, ওকে ইংরেজীতে ভাল করে বুঝিয়ে দে, আমার ঘরের কোন জিনিস যেন বাইরে না ফেলে, ... আমি তোদের কাছে আর কিছু চাই না।" ও হাতজোড় করে বলে।

"এখন থেকে ও তোমার ঘরে নক করে ঢুকবে মঁম তোমার অনুমতি নিয়ে, আই উইল টিচ হার হাউ টু বিহেব!"

"না বাবা, লড়াই করো না, বউকে মেরো না, বেচারীর কী দোষ? আমিই ওর কথা বুঝতে পারি না, বোঝাতেও পারি না!"

কেইথী চোখের জল মুছে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যায়। সে তো সৎবীরকে ছেড়েই চলে যেত, এদেশে কেউ গায়ে হাত তোলা পছন্দ করে না। কিন্তু সৎবীর পরে ঠান্ডা মাথায় আদর করে অনেক কষ্টে ওকে মানায়। সত্যি মেয়েটি খুব ভাল। সেদিনের পর হরবন্স কৌরের অনুমতি না নিয়ে আর ওর ঘরে ঢোকেনি।

নক করে ঢোকে, ঘর পরিষ্কার করে, জামাকাপড় ধুয়ে দেয়, ওকে স্নানটান করিয়ে ওর পছন্দ মতন খাবার দিয়ে যায়; কিন্তু ওর ঘরের কোন জিনিসে জিজ্ঞেস না করে ছুঁয়েও দেখেনা।

কেইথী ভীষণ শান্ত ও বিচক্ষণ। বিয়ের আগে সৎবীরের অফিসেই কেরানীর কাজ করতো। সৎবীর ইঞ্জিনীয়ার। মেয়েটির মিষ্টি স্বভাবে আকৃষ্ট হয়। ওই আকর্ষণ থেকেই বন্ধুত্ব ও ক্রমে ভালবাসা নিবিড় হলে বিয়ের কথা ওঠে। সৎবীর বলে, "আমি আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলি।"

কেইথী হেসে জিজ্ঞেস করে, "বিয়ে তুমি করবে না তোমার মঁম?"

"শাট আপ কেইথী, আমি জানি তুমি বিচক্ষণ, সামান্য বিষয় নিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করো না। এই দুনিয়ায় মাকেই সবচাইতে বেশী ভালবাসি। মনে রেখ, তুমি যদি কোনদিন আমাদের ভালবাসার মাঝখানে আসো তাহলে তোমার আমার সম্পর্কও ভেঙ্গে যাবে। সত্যি, আমি মজা করছি না।"

ওর কথা শুনে কেইথীর গোলাপী ঠোঁট কাঁপে, যদি তোমার মা আমাকে পছন্দ না করে!

সৎবীর ওর কাঁধ থপথপিয়ে বলে, ডোন্ট ইউ ওরি! মা আমাকে ভালমতন চেনে, তোমাকে খালি হাতে ফেরাবে না!

কেইথীকে দেখে হরবন্স কৌরের সামনে ওর সতীন, কুলদীপ সিংহের দ্বিতীয় পত্নীর চেহারা ভেসে ওঠে। কেইথী কেন, যে কোন ইংরেজ মহিলাকে দেখলেই ওর সতীনের কথা মনে পড়ে, যে ওর স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল আর হাজার কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও নির্বিকার ছিল। সেই শ্বেতাঙ্গিনী ওকে অবোধ শিশু দুটিকে নিয়ে পথে বের হতে বাধ্য করেছিল। সে জন্যে ও শ্বেতাঙ্গিনীদের ভয় পায়। সৎবীরের সঙ্গে কেইথীকে দেখে ওর মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু ও ছেলের চেহারায় উদ্ভাসিত খুশীকে মিটিয়ে দিতে চায়নি বলে নিজেকে সামলায়। তারপর বলে, "মেয়েটি খুব সুন্দর, তবে ওকে বলিস আমাকে যেন ইংরেজীতে গালি না দেয়! যা বলার পাঞ্জাবীতেই বলবে!"

সৎবীর মুচকি হেসে বলে, "কিন্তু এ যে পাঞ্জাবী জানেই না মঁম।"

"শিখিয়ে দে, নাহলে তোকে সারাজীবন অনুবাদ করে যেতে হবে, যেমন তোর বাবা করতো। কিন্তু বাবা লক্ষ্য রাখবি ঝগড়াঝাটি যেন না হয়।" একথা বলে হরবন্স কৌর কোথায় হারিয়ে যায়, মনের কোন সে গহন অন্দরে ডুবে যায়।

বউ হয়ে এ বাড়িতে এসে কেইথী বাড়ির চেহারাই পাল্টে দেয়। পুরনো কাগজ, কারপেট, বিছানা এমনকি রান্নাঘরের জিনিসও পাল্টে ফেলে। শুধু হরবন্স কৌরের ঘরটাই পাল্টাতে পারেনি।

হরবন্স কৌরের কামরায় ওর নিজস্ব দুনিয়া। ও যখন এসে নিজের বিছানায় শোয়, মাঝেমধ্যে নিজের জীবনগাঁথা ওর সামনে ফিল্মের মতন ভেসে ওঠে। কুড়ি বছর আগে ও এই বাড়ীতে এসেছে—অনাহূত। শুধু এই বাড়ি কেন, এ দেশেই ও অনাহূত। ছেলের বয়স তখন সাত বছর আর মেয়ের পাঁচ। তারও পাঁচ বছর আগে মেয়েটি যখন পেটে, ওর স্বামী জলপথে এদেশে এসেছে, ওকে বলে এসেছে, "গিয়ে ঘরটর ঠিক করতে যতদিন, তারপর এসে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো।" কিন্তু এদেশে এসে ওদেরকে আনা তো দূরের কথা কুলদীপ সিংহ বউ ও বাচ্চার ভরণপোষণ বাবদও কিছু পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করে না। প্রথম দিকে মাসে দুমাসে একবার বাবা-মার কাছে চিঠি লিখতো। কিন্তু তারপর থেকে তাও বন্ধ করে দেয়।

যতদিন হরবন্স কৌরের মা-বাপ বেঁচেছিল ও চারমাস বাপের বাড়ি তো ছয়মাস শ্বশুরবাড়ি পালা করে থাকতো।। কিন্তু ওদের মৃত্যুর পর দাদা-বৌদিরা গলগ্রহ ভাবতে শুরু করলে ওর আত্মসম্মানে বাধে। ও আর বাপের বাড়ির পথে পা বাড়ায় না। এদিকে দেওর ভাসুররাও বদমাইশি শুরু করে। একমাত্র স্নেহের উৎস শ্বশুরমশাই তখন বাধ্য হয়ে কুলদীপ সিংহের ভাগের জমিজিরেত বিক্রী করে ওর ও বাচ্চাদের টিকিট করে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেন, আর নিজের এক বন্ধুকেও চিঠি পাঠিয়ে দেয় যাতে ওদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যান। ওর মতে, বউ বাচ্চাদের সামনে দেখলে নিজে থেকেই ও নিজের কর্তব্য সামলাবে।

কিন্তু কুলদীপ সিংহ বাবার বন্ধুর সঙ্গে দুই বাচ্চা নিয়ে ওকে পৌঁছুতে দেখে ঘাবড়ে যায়। তুই এখানে কী করতে এসেছিস?

আর কোথায় যাব? তুমি তো দেশের কথা ভুলেই গেছ!

তুই ফিরে যা!

ফিরে কার কাছে যাব? বাবা মা মারা গেছেন, তোমার দাদা-ভাইরাও কুদৃষ্টিতে দেখে, এই দুটো

অভাগা শিশুকে নিয়ে কোথায় যাব? তোমার বাবা বলেছে, এখন যে যার নিজের পরিবার সামলাক!

কিন্তু এখানে যে আমি আবার বিয়ে করেছি, এই শীতল দেশে একা পুরুষ থাকি কেমন করে। আমার বউ ইংরেজ, দুটো বাচ্চাও আছে!

বলার ঢঙ এমন যেন দরজায় দাঁড়ানো ভিখিরিকে বলছে, ভাই আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। হরবন্স অন্ধকার দেখে। ওর মাথা ঘুরতে থাকে। মুখে কোন শব্দ জোগায় না। ওকে চুপচাপ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুলদীপ সিংহ বলে, "তুই ফিরে যা, ভাড়া আমি দিচ্ছি।"

হরবন্সের পৃথিবী বনবন করে ঘোরে। কোনমতে একটা দরজার পাল্লা আঁকড়ে ধরে ও কেঁদে ফেলে, "এখন ফিরে কোথায় যাব? এখানেই তোমার সেবা করবো, অনেকেই তো দুটো বিয়ে করে, আমাকে দাসী ভেবেই কাছে রাখো।"

কুলদীপ সিংহ চুপ হয়ে যায়। ওকে ও বাচ্চাদেরকে কয়েক টুকরো রুটি ও এককাপ করে চা খেতে দেয়। কিন্তু ছটফট করতে থাকে। সারা ঘরে পায়চারী করে বেড়ায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। ওর দ্বিতীয় পত্নী অফিস থেকে ফিরে আসে। তারপরই মহাহুলুস্থুল। কুলদীপ সিংহ যতই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, হরবন্স ওর বিয়ে করা বউ, ওর বাবা জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে, ও শীঘ্রই ওদেরকে ইন্ডিয়া ফেরৎ পাঠাবে। মেম সাহেবের গোঁসা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ছিটকে বাইরে ফেলতে থাকে। আর কেবলই বলে, "হয় ও থাকবে না হয় আমি!" কুলদীপ সিংহ গোবেচারার মতন অনুবাদ করে শোনায়। হরবন্স তখন মেমের পা জড়িয়ে ধরে বলে, "আমি তোর বাসনপত্র ধুয়ে দেব, রান্না করে খাওয়াব।"

কুলদীপ ওর প্রস্তাব অনুবাদ করে মেমবউকে শোনায়। জবাবে ও ইংরেজীতে গালি দেয়। কুলদীপ ওর গালির অনুবাদ না করলেও হরবন্স কৌর মেমের ভাবভঙ্গীতে তা বুঝতে পেরে বলে, তোমার মেমবউকে বলো আমি ওর চাকরানী হয়ে থাকবো, কখনোই কোনরকম ভাগ চাইবো না।

জবাবে কুলদীপ সিংহ ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ও তোর নামও শুনতে চায় না, তোর সঙ্গে আমাকেও ঘর থেকে বের করে দিতে চায়। ও আরও কিছুক্ষণ মেমবউকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ওদেরকে গাড়িতে উঠিয়ে অনেক বড় বড় রাস্তা পার হয়ে অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এক বন্ধুর খালিবাড়িতে নিয়ে তোলে। ওকে বলে, আজ রাতটা কোনমতে এখানেই কাটিয়ে নে, কিছু একটা ব্যবস্থা করে আগামীকাল এসে তোদেরকে নিয়ে যাব!

হরবন্স কৌর কী বলবে ভেবে পায় না। পুরুষ মানুষের উপর বেশী চাপ দিয়ে কি লাভ হবে? যৌবনের দোষে ভুল করে বসেছে, এখন তার ফল ভুগছে। এখন যদি ওর জন্যে একটা আলাদা বাড়ি ঠিক করে দেয়, আর মাঝেমধ্যে এসে দেখে যায় তাহলেই যথেষ্ট!

কিন্তু পরেরদিন কেন তার পরেরদিনও কুলদীপ সিংহ ফিরে আসেনি। ঐ বাড়িতে আলো-জল কিম্বা আগুনের কোন ব্যবস্থা নেই। ঠান্ডায় বাচ্চাদুটি কুলফির মতন জমে যায়। খাওয়া-ঘুম ছাড়া বাচ্চা দুটিকে বুকের সঙ্গে লেপ্টে কতক্ষণ আর থাকা যায়। বাইরে বরফ পড়তে শুরু করে। ও কোথায় রয়েছে, কুলদীপ সিংহের বাড়ি কোথায়, সেখানে কেমন করে যাওয়া যায়, কে জানে! তৃতীয় রাতে ক্ষিদে, তৃষ্ণা ও ঠান্ডা ছাপিয়ে তুষারঝড় শুরু হলে ও আর থাকতে না পেরে প্রতিবেশীর দরজা খটখটায়।

এক প্রৌঢ় শিখ ভদ্রলোক দরজা খুলে জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার?" সামনেই এক অপরিচিতাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কে ভাই?" হরবন্স মরিয়া হয়ে হাতজোড় করে বলে, "আমি,... আপনার পাশের বাড়িতে দুদিন আগে এসেছি, আমার স্বামী আমাদেরকে এখানে রেখে গেছে কিন্তু দুদিন হলো আর ফিরে আসেনি, এখন বাচ্চাদুটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। প্রচন্ড শীতে ওদের ঘুম আসে না: আপনার কাছে কোন ফালতু লেপ থাকলে দু-একদিনের জন্যে ধার দিন, বাখরু*

আপনার মঙ্গল করবে!

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "পাশের বাড়িতে? গত দশ বছর কোন ফড়িঙও ঐ বাড়িতে ঢোকেনি!"

ও অসহায়ের মতন মাথা নেড়ে বলে, "জানি না, এদের বাবা রেখে গেছে। বাচ্চা দুটির মাথায় তখন বরফ পড়ছে, ওরা মায়ের পায়ের সঙ্গে লেপ্টে নাক কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে। ভদ্রলোক কী ভেবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "এসো এসো, ভেতরে চলে এসো, ভেতরে চলে এসো, ঠান্ডায় জমে যাবে নাহলে!"

ভদ্রলোক পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। হরবন্স কৌর বাচ্চা দুটির হাত ধরে ভদ্রলোকের ঘরে ঢোকে। আঃ কী গরম। ভেতরে ঢোকার একটু পরেই ওর দাঁত ঠকঠকি বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রলোক ওদেরকে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলে। সেখানে গ্যাসের অঙ্গীঠী উনুনের মতন জ্বলছে। বাচ্চাদুটি দৌড়ে অঙ্গীঠীর কাছে গিয়ে বসে হাত সেঁকতে শুরু করে। হরবন্স কৌর দরজার কাছে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই দেখে ভদ্রলোক ওর মলিন সোফার দিকে ইশারা করে বলে, "এসো ভাই, তুমিও বসে পড়ো!"

কুণ্ঠিত হরবন্স এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে। ভদ্রলোক উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বিস্কিটের প্যাকেট এনে বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। বাচ্চারা একবার মায়ের মুখের দিকে তাকায়, তারপর বিস্কিটের উপর হামলে পড়ে। কতদিনের ক্ষিদে! ভদ্রলোক আবার রান্নাঘরে গিয়ে কেটলীভরা গরম চা নিয়ে আসে। হরবন্স কৌর মানা করতে পারে না। ও নিজেই উঠে বাচ্চা দুটিকে কাপে চা ভরে দেয়।

ভদ্রলোক বলে — "তুমিও নাও ভাই!"

"না না, আমার চাই না, বাচ্চা দুটি...." ও আর বলতে পারে না। গলা শুকিয়ে যায়। সামনে চা বিস্কিট দেখে ওর ক্ষিদে প্রবল হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোক এবার উঠে এসে আরেক কাপে চা ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "লজ্জা করো না, তুমিও নাও। হরবন্স বাধ্য মেয়ের মতন কাপ উঠিয়ে চুমুক দেয়। এক ঢোঁক চা পেটে যেতেই ওর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও কাপ খালি করে দেয়।

ভদ্রলোক ভেতর থেকে একটা কম্বল বের করে এনে বলে, "লেপতো আমার একটাই, হ্যাঁ, পুরনো ফৌজি কম্বল রয়েছে, যদি কিছু মনে না করো... তোমাদের ঘরে হীটার রয়েছে তো?"

হরবন্স কিছু বুঝতে না পেরে বলে, "হীটার আবার কী?"

ভদ্রলোক গ্যাসের অঙ্গীঠীটাকে দেখিয়ে বলে, "এইরকম অঙ্গীঠী!"

হরবন্স ওর হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে বলে, " না, ওখানে বিজলী-পানী কিছুই নেই।"

"তাহলে?" ভদ্রলোকের চোখ কপালে ওঠে, "বাচ্চা দুটিকে মারবে নাকি?"

"আর কি করবো বলুন।" ও বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে দেখে ওরা সামান্য উষ্ণতা পেয়ে ফ্লোরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভদ্রলোক বলে, "আহা বেচারারা ক্ষিদেয় জেগে ছিল, পেটে খাবার পড়তেই..... !" ও হরবন্সের হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে ওদের গায়ে চাপিয়ে দেয়। হরবন্স কৌর মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, এখন কি ওদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাব? ও এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার হাত ধরতেই ভদ্রলোক বলে, "জাগাচ্ছো কেন, আহা ঘুমুতে দাও! ওখানে নিয়ে গেলে ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়বে!"

হরবন্সের গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় না। অগত্যা সে নিজেও বাচ্চা দুটির পাশে বসে পড়ে। ভদ্রলোক একবার বাচ্চা দুটির চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে উঠে দাঁড়ায়। পাশের ঘর থেকে ওর লেপটাকে তুলে এনে হরবন্সের পাশেই মেঝেতে রেখে বলে, তুমিও পা ঢেকে নাও!

হরবন্স হতচকিত হয়ে বলে, "কিন্তু আপনার কাছে তো একটাই লেপ!"

"কোন ব্যাপার না। আমিও এখানেই বসে রাত কাটিয়ে নেব। যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় ন'জন!" বলতে বলতে ও নিজের বালিশটাও এনে মেঝেতে রাখে। তারপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে ও নিজের ও হরবন্সের পা ঢেকে দেয়। এবার নিজের পরিচয় দেয়, "আমার নাম কর্ণেল সিংহ, বাড়ি ফরিদকোট, ব্রিটিশ আর্মি থেকে অবসর নিয়ে এখানেই থেকে গেছি। বিয়ে-শাদি করিনি! এই হলো আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এবার তোমার কথা শুনি।"

হরবন্স কৌর নিজের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। ও কাঁদতে কাঁদতেই এই দেবদূতের মতন মানুষটিকে নিজের দুঃখের কথা খুলে বলে। ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তুমি না বললেও, তোমার দশা দেখে আমি ব্যাপারটা ঠাহর করেছি, যে লোক ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সী যুবতী-স্ত্রী ও বাচ্চাদের রাতের আঁধারে একা রেখে চলে যায়, তার ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। সে অমানুষ। তুমি নিজেকে সামলাও।"

হরবন্স কৌর পাথরের মূর্তির মতন ওর কথা শুনতে থাকে। এভাবে মাঝরাত পেরিয়ে গেলে বসে বসেই কখন ওর চোখ লেগে যায়; না জানি কতদিনের ক্লান্তিতে সে অবশ হয়ে তলিয়ে যায় গভীর নিদ্রায়।

ঘুম ভাঙ্গে একেবারে সকালবেলায়। তখন বাইরে রোদ উঠেছে। চোখ খুলতেই ও আলগোছে উঠে পড়ে। ছিঃ, ও ভদ্রলোকের হাতে মাথা রেখে গায়ে পা তুলে একই লেপের তলায় রাত কাটিয়েছে। বাচ্চা দুটি যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকের মতন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ও সাবধানে লেপ থেকে পা বের করে তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোকেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ও ঘুম চোখে বলে, "একটু আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে, এত ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলে যে মায়া হলো, তাই ডাকিনি!"

লজ্জায় হরবন্সের কান ঝা ঝা করে, শরীর কাঁপতে থাকে, ছিঃ। সারারাত ও এক পরপুরুষকে জড়িয়ে শুয়েছে। ও আর ভদ্রলোকের দিকে তাকাতে পারে না। ও কাঁপা হাতে বাচ্চা দুটিকে জাগাতে যায়। ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে এরকম করতে দেখে বলে, "আরে আরে কী করছো! বসো, ওদেরকে ঘুমুতে দাও, নিজে থেকে যখন জাগে জাগুক, মুখ হাত ধুয়ে এসো, তারপর চলো তোমাকে রান্নাঘরে ইংরেজী উনুন জ্বালাতে শেখাবো।"

হরবন্স কৌর চুপচাপ ওর আদেশ পালন করে। বাথরুম ঘুরে এসে ভদ্রলোকের কাছে উনুন ও রান্নাঘরের অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করা শিখে নেয়। দুজনে মিলে চা বানায়। কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে ও বলে, "আমি তো কেবল একটা লেপ চাইতে এসেছিলাম!"

ভদ্রলোক স্নেহময় হেসে বলে, "তো কী হয়েছে, ছোট্ট বাচ্চা দুটিকে নিয়ে এই প্রবল শীতে কোথায় ধাক্কা খেয়ে ফিরবে? যতদিন তোমার নিজস্ব কোন উপায় না হবে, এখানেই থাকো, আমি ওদের বাবার খোঁজ করে কথা বলে দেখি। তোমার কাগজপত্রগুলি দিও তো!"

হরবন্স গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে ওর ব্যাগ উঠিয়ে আনে। নিজের ও বাচ্চাদের পোশাক পাল্টানোর জন্যেও ব্যাগটার প্রয়োজন ছিল। ওর পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট ও ভিসা পরীক্ষা করে কর্ণেল সিংহ কুলদীপ সিংহের ঠিকানা পেয়ে যায়। তারপর জামাকাপড় পরে ও বাচ্চাগুলি জাগলে কী খেতে দেবে, ও কী খাবে আর রাতের খাবার কী করে বানাবে সেসব নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

তারপর দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে আবার রাত হয়ে যায়। দুপুর নাগাদ বাচ্চারা ওঠে। সারা বিকেল ও সন্ধ্যা খেলা করে। হরবন্স ওদের দিকে মন দিতে পারে না। ও দরজায় চোখ লাগিয়ে থাকে কখন লোকটা কুলদীপ সিংহকে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু হায়! বেশ রাতে ভদ্রলোক খালি হাতে ফিরে আসে। নিরাশ আওয়াজে বলে, "ওরা ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। রাস্কেল!"

"অন্য কোথায়?" হরবন্স ঢোক গিলে জিঞ্জেস করে। ভদ্রলোক ধপাস করে সোফায় বসে জুতো খুলে পা দুটি সোফার উপর তুলতে তুলতে বলে, "জানি না কোথায়। আজ পুরো দিন অনেক ঘুরেছি, তোমার শ্বশুরের বন্ধু থেকে শুরু করে ঐ এলাকার সমস্ত ভারতীয়দের দরজায় দরজায় ঘুরেছি, কিন্তু কোনই খবর পাইনি !"

হরবন্স কৌর কপাল চাপড়ায়, "তাহলে আমাদের কী হবে এখন?"

ভদ্রলোক ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হরবন্স কপাল চাপড়ে চাপড়ে বিলাপ করতে থাকে, "হায় ও রব্বা, হে ঈশ্বর, এ কোন পাপের শাস্তি দিচ্ছ? জন্ম হতেই কেন মরে যাইনি, মাগো, জন্মের সময়ই গলা টিপে মেরে ফেলোনি কেন? এক পাষন্ডের সঙ্গে কেন বিয়ে দিলে!" ওর কান্না শুনে বাচ্চা দুটি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। তারপর ওরাও কাঁদতে শুরু করে।

"না রে, কাঁদিস না, তোদের কান্না আমি সইতে পারছি না!" ভদ্রলোক ইংরেজ সৈন্যদলে পুরো চাকুরীজীবন কত না যুদ্ধ লড়েছেন, কত না গোলাগুলি ছুঁড়েছেন শত্রুকে লক্ষ্য করে! কিন্তু আজ, বোমা-বারুদ নিয়ে খেলতে থাকা লোকটি এক অসহায় মহিলার দুঃখকে সইতে পারলো না, ও মেঝেতে উবু হয়ে বাচ্চা দুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, "চলো চলো ওঠো, বাচ্চাদুটিকে কিছু খেতে দাও। এদের কী দোষ বলো?"

হরবন্স তবু কাঁদতে থাকে।। অগত্যা ভদ্রলোক বাচ্চাদুটিকে ওর কাছে বসিয়ে রান্নাঘরে যায়। ওখান থেকে খাবাব ও পানীয় এনে বাচ্চাদেবকে খেতে দেয়। নিজেও খায়। ওর চাপে হরবন্সও দুটো মুখে দেয়।

তারপর বাচ্চারা গতকালের মতন হীটারের পাশে মেঝেতে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লে, ও একা একা বকরবকর কবতে থাকে, "এই বাচ্চা দুটি না থাকলে আমি কুয়োয় ঝাঁপ দিতাম। পুরুষরা কী সুন্দর চাইলেই স্বাধীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মহিলারা খুঁটিতে বাঁধা পশুর মতন সন্তানের মায়ায় বাঁধা পড়ে!"

সময় নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যায়। দেখতে দেখতে সপ্তাহ, মাস, বছর পেরিয়ে যায়। ভদ্রলোক দৌড়ঝাঁপ করে হরবন্স কৌর আর বাচ্চাদের জন্যে সোশ্যাল সিকিউরিটির মাসিক ভাতা মঞ্জুর করায়। ও কোন ফ্যাক্টরী থেকে ইলেকট্রিকের প্লাগ জোড়ার কাজ নিয়ে আসে, হরবন্স অবসর সময়ে সেগুলি জুড়ে জুড়ে সপ্তাহে দশ বিশ পাউন্ড রোজগার করে। বাচ্চারা স্কুলে ভর্তি হয়। হরবন্স বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজস্ব দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘরেব বাইবে বেরোয় না। ঐ ভদ্রলোক আর বাচ্চা দুটি নিয়েই ওর সংসার। ও সব সময় ভদ্রলোকের প্রতি কৃতঞ্জতায় নুয়ে থাকে। একদিন এই বোঝাও অসহ্য হয়ে উঠলে ও ভদ্রলোককে বলে, "আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলবো?"

ভদ্রলোক ওর দিকে মাথা তুলে বলে, "বলো!"

"আপনি আমার মাথায় চাদর দিয়ে দিন, বিয়ে করে নিন।" ও প্রথমবারের মতন একদৃষ্টে ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সোফায় বসে পড়ে। বন্সোকে একবার ভালমতন দেখে, সোনার মতন গায়ের রঙ, সুন্দর গড়ন আর জ্বলজ্বলে চোখ। ওর মনে হয় যেন বন্সোর শরীরে যৌবনের ঢল নেমেছে। হরবন্স কৌর এবার মুচকি হেসে বলে, "এমনিতেও রোজই একই লেপের তলায় ঘুমাই!"

দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, অবশেষে ও পাথরের মতন সপাট হয়ে জবাব দেয়, "বন্সো, প্রথম রাতেই দুধের শিশুর মতন আমার বুকে মাথা রেখে শুয়েছিলে,

পরদিন তোমার বরের খোঁজ না পেয়ে ফিরে এলে যখন বিলাপ করে কাঁদছিলে তখনই তোমার মাথা চাদর দিয়ে ঢাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমি এর যোগ্য নই!"

"কেন, তোমার কী হয়েছে?"

"ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে আমার তলপেটে শত্রুর গুলি ঢুকেছিল। অপারেশান করে ডাক্তাররা গুলি বের করেছে ঠিকই... কিন্তু আমি কারো স্বামী হওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ি। যুদ্ধে আসার আগে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ফিরে না গেলে মেয়েপক্ষ কণেকে অন্যখানে পাত্রস্থ করে। আমি গিয়ে কী-ই বা করতাম! আমার শালারা অনেক খবর পাঠিয়েছে। এমনও বলেছে যে আমি ইন্ডিয়া গেলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। যার ভাগাই কেটে গেছে তাকে...!" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বলে, "ব্যস, বসো, আমি আর ফিরে যাইনি। ইংরেজ সরকার এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছে। পেনশানের পয়সা আর টুকটাক কাজ করে যা পাই তা দিয়ে দিন চলে যায়!"

হরবন্স কৌর মাথা ঝুঁকিয়ে ওর কথা শুনতে থাকে।

"তুমি চাদর দিয়ে মাথা ঢাকার কথা বলছো, যে রাতে প্রথম আমার সঙ্গে শুয়েছিলে, আমি দেবতা নই যে এমনি শান্ত ছিলাম, শাস্ত্র বলে নারী হলো অগ্নিকন্যা, বড় বড় মুণিঋষিকেও জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। আমি জীবনে প্রথম সারারাত আগুন দিয়ে গা ঢেকে শুয়েছিলাম। উত্তপ্তও হয়েছিলাম, কিন্তু সেই আগুন বোজানোর কোন স্রোত আমার কাছে ছিল না!"

বলতে বলতে ভদ্রলোকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তবু তিনি বলতে থাকেন, "তুমি যুবতী, কথায় আছে যুবতী যেদিক দিয়ে যায় সেখানকার সুরভী ও দুর্গন্ধ দুটোই ওকে ঘিরে চলতে থাকে, আর লোকে তার জন্যে যুবতীকেই দায়ী করে। সাবাজীবন রামের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরেও সীতা বদনামের হাত থেকে বাঁচেনি। আদিকাল থেকেই পুরুষবা মহিলাদের ব্যবহার করে ত্যাগ করে আসছে, তুমিই প্রথম দুয়োরাণী নও!"

"কিন্তু ... কিন্তু...!" হরবন্স কৌর কিছু বলতে গিয়ে ঢোঁক গেলে।

কর্ণেল সিংহ বলেন, "আমি জানি তোমার বয়সী প্রত্যেক মহিলাই পুরুষের সঙ্গ চায়। আমি ভাল বর দেখে তোমাকে পাত্রস্থ করে দেব, তার আগে তোমাকে ডাইভোর্স করাতে হবে। তারও আগে তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করতে হবে।"

ডগোরস আবার কি?

ডগোরস না ডাইভোর্স, মানে তালাক!

আমার তালাক চাই না। এহেন পুরুষ তো মৃত স্বামীর থেকেও বেশী কষ্টদায়ক। মৃত স্বামীর জন্য মহিলারা সারাজীবন কাঁদে কিন্তু এহেন চরিত্রহীনকে দুদিনেই ভুলে যেতে পারে, ঘৃণা করে!

কর্ণেল সিংহ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তাহলে তো কোন কথাই নেই, আমি তোমার জন্যে ঠিক সুযোগ্য বর খুঁজে আনবো।"

"কিন্তু আমি তো তোমার কথা বলছি সাহেব। আমার আর কোন পুরুষের দরকার নেই। তুমি যেমন করে আমাকে ও বাচ্চা দুটিকে আগলে রেখেছ, তোমার পা ধুয়ে জল খেতে ইচ্ছে করে। অন্য পুরুষ নিয়ে আমি কী করবো, সামান্য উষ্ণতারই প্রয়োজন ছিল, তা তোমার কাছে পেয়েছি। আমি তো কেবল একটা লেপ চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু পেয়েছি মনের মানুষ, আপনজন—যৌনতাই কি ভালবাসার একমাত্র মাধ্যম? তাহলে তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি, তাকে কী বলবে? তোমাকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে থাকার কথা আমি এখন ভাবতেই পারি না। আসলে চাদর ঢাকার কথা এজন্যে বলেছিলাম, তাহলে আমার বাচ্চা দুটি তোমাকে বাবা বলতে পারে!"

"তার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি বাচ্চাদেরকে বলো যে আমরা বন্ধু! ইংরেজদের দেখো, ওরা

নিজের বাবা ছাড়া আর কাউকে বাবা ডাকে না, সবাইকে নাম নিয়ে ডাকে। আমরা অহেতুক সম্পর্ক মন্থনে ব্যস্ত থাকি। অনেক সম্পর্ক রাতারাতি তৈরী হয় আর সকাল হতেই বুজে যায়, ঝরে যায়, কোন কোন সম্পর্ক তো কষ্টই দেয়, তড়পায়, কোন সম্পর্ক নিজে থেকেই মরে যায় আবার কোন সম্পর্ক অহেতুক মারক হয়ে ওঠে। কোনরকম সম্পর্ক তৈরী না করে কি আমরা বাঁচতে পারি না? কারো ভাই অপদার্থ, সে বাইরের কাউকে ধর্মভাই বানায়! মায়ের বন্ধুকে মামা বলে ডেকে কী লাভ? বাবা বলারও দরকার নেই বলে আমি মনে করি!"

কর্ণেল সিংহের এই অভিমত হরবন্সের সমস্ত সত্তায় ছেয়ে যায়। সেদিনের পর থেকে তাই আর কখনো এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি। কিন্তু ও বাচ্চা দুটিকে ছোটবেলা থেকেই 'বাপুজী' বলে ডাকতে শিখিয়েছে। কে কি বলবে এতে হরবন্সের কিছু আসে যায় না। ও কর্ণেল সিংহের কাছে ধীরে ধীরে গুরুমুখী পড়া শিখে নেয়। কর্ণেল সিংহের ইচ্ছে অনুসারে ও সুন্দর জামাকাপড় পরে থাকে। ওর হাতের ছোঁয়ায় কর্ণেল সিংহের ইটকাঠের বাড়ি এক সাজানো গোছানো প্রাণবন্ত সংসারে পরিণত হয়।

কর্ণেল সিংহ কতবার বলেছে, "বন্সো, একা মানুষের জীবনের কী মূল্য। মহিলারা না থাকলে পু রুষকে অনায়াসে একঘেয়েমির পোকায় কুরে কুরে খায়। ঈশ্বর মহিলাদের মূলত: পুরুষের মা বানিয়ে পাঠিয়েছে, যারা সারাজীবন পুরুষকে লালন করে কখনো মা, কখনো বোন, আবার কখনো পত্নীরূপে। কিন্তু পুরুষ এত কৃতঘ্ন যে অবলীলায় মহিলাদের অত্যাচার করে!"

সময়ের প্রয়োজনে এ বাড়িতে প্রতিবছরই অনেক নতুন জিনিস আসে, অনেক শপিং হয়, কিন্তু বন্সো আর কর্ণেলের লেপ আলাদা হয় না। এক রাতে কর্ণেল সিংহ ফিসফিস করে বলে, "এখন বাচ্চারা বড় হয়েছে বন্সো, তোমার জন্যে একটা আলাদা লেপ কিনে আনবো!"

হরবন্স কৌর বলে, "ফালতু পয়সা খরচ করবে কেন, চলে তো যাচ্ছে!" হরবন্স কৌর যা বলেনি কর্ণেল সিংহ তাও বুঝতে পারে। এভাবেই এক লেপে সপ্তাহ মাস বছর পেরিয়ে যায়।

হরবন্সের মেয়ের বয়স সতের পেরুতেই কর্ণেল সিংহ ওর এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়। ও এখন শ্বশুরবাড়িতে সুখে সংসার করছে। মাঝেমধ্যে বরকে নিয়ে এসে মাকে দেখে যায়। ছেলে সৎবীরও ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পেয়েছে। বাইরে ওরা কেতাবী শিক্ষা নিতে যেত, জীবনেব শিক্ষা ওরা কর্ণেল সিংহের কাছেই পেয়েছে। সে জন্যেই সৎবীর আজও মায়ের পুজো করে। ওর মা কত কষ্ট কঁবে ওদেরকে বড় করেছে তা ও ভোলেনি। কর্ণেল সিংহ ওর বাবা নয় অথচ সঙ্গে থাকে বলে মায়ের উপর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ওর মনে কখনো জাগে নি, বরঞ্চ এহেন দৃঢ়তা নিয়ে সমাজের মোকাবিলা করায় ও গর্বিত।

একদিন সকালে মর্নিংওয়াক সেরে এসেই কর্ণেল সিংহের হার্ট অ্যাটাক হয়। কয়েকদিন হাসপাতালের বিছানায় ওকে বাঁচানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু ও হরবন্স কৌরের জীবনের আলো সঙ্গে নিয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। হরবন্সের মাথায় আবার আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কর্ণেল সিংহের সঙ্গে ওর হৃদয় আর আত্মার সম্পর্ক যেন মা আর সন্তানের সম্পর্কের থেকেও বেশী নিবিড় ছিল। তাই ওর আকস্মিক প্রয়াণে ওর দুনিয়া আবার অন্ধকারে ডুবে যায়, দিনের পর দিন রাতের পর রাত ও পাগলের মতন কাঁদে। অহর্নিশ বিলাপ করতে থাকে।

একদিন কর্ণেল সিংহের উকিল কিছু কোর্টের কাগজপত্র দিয়ে যায়। সন্ধ্যায় সৎবীর ঘরে এলে ও সেগুলি দেখায়। সৎবীর বলে, "এটা উইল, বাপুজী নিজের বাড়ি আর ব্যাঙ্কে জমানো সমস্ত টাকা তোমার নামে করে গেছেন।"

হরবন্স কৌর বিলাপ শুরু করে, "আরে বেঁচে থাকতে আমি তোমার ঋণ চুকাতে পারবো না, তুমি মরে গিয়েও আমার মাথায় ঋণের বোঝা বাড়িয়ে গেলে! আমি তো কেবল অসহায় বাচ্চাদুটির

জন্যে একটা লেপ চাইতে এসেছিলাম, আর তুমি বাড়িঘর টাকা-পয়সা সব আমার নামে করে গেলে। হায়..., বাচ্চা দুটির জন্যে দানা খুঁজতে বেরুনো পাখির জন্যে তুমি পাকা আশ্রয় বানিয়ে গেলে, তোমার স্থান স্বর্গে হোক, আমার হৃদয়ের ব্যথার মলম তুমি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন ?"

ওর বিলাপে সৎবীরের বুক ফেটে যায়। ও মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "চুপ করো মঁম, এত কাঁদলে বাপুজীর আত্মা কষ্ট পাবে। তিনি আমাদের কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না!"

একথা শুনে হরবন্স কৌর সৎবীরের বুকে মাথা গুঁজে কাঁদে। ওর মনে হয় সৎবীর আর আমার দুঃখ আজ একাকার, পার্থক্য কেবল এটুকুই যে আমি বিলাপ করছি আর সৎবীর সহ্য করছে।

তারপরও অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। বছর কেন, হরবন্স কৌরের পুরো জীবনটাই ফুরিয়ে এসেছে কিন্তু এখনো কর্ণেল সিংহের বিয়োগ ব্যথা ওকে বিষাদ সাগরে ডুবিয়ে রাখে। ও আজও ভুলতে পারেনি। সৎবীরও অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু মায়ের এই মানসিক কষ্টের কোন উপশম ও করে উঠতে পারেনি। ধীরে ধীরে ওর মা দুনিয়ার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। রান্না করা, খাওয়া কোন কিছুই ওর আর ভাল লাগে না। মাঝেমধ্যে সৎবীর নিজেই কিছু ইংরেজী খাবার বানিয়ে খেয়ে নেয়। মাকে পারতে কষ্ট দেয় না।

হরবন্স কৌর ভাবে, " ও যেন ওর বাপুরই মতন শ্রবণপুত্র...!" ভেবেই করুণ হাসে। ও মনে মনেও সৎবীরকে কর্ণেল সিংহের সঙ্গে তুলনা করছে। যদিও ওর বাবা ছিল কুলদীপ সিংহ।

সৎবীর নিজে পছন্দ করে বউ আনলে অনেকদিন পর আবার যেন বাড়িটাতে প্রাণ ফিরে আসে। কিন্তু বন্সোর জন্যে নিজের কামরাটাই স্বর্গ। ও সময় অসময়ে মুখ অব্দি লেপঢাকা দিয়ে কর্ণেল সিংহের কথা ভাবে। লেপটা যেন সেতু, গায়ে দিয়ে শুলে আজো মাঝেমধ্যে ফৌজীর বাহু-পাশে শুয়ে থাকার অনুভূতি হয়। ওর শরীরের সুরভি আর স্পর্শ ওর শরীরের প্রতিটি কোষে শিহরিত হয়। ওর অস্তিত্বে ছড়িয়ে যায়।

আজ এগারোটা বাজার পরও বন্সো না জাগায় কেইথীর চিন্তা বাড়ে। ও সাহস করে আবার ওর মুখ থেকে লেপ সরায়। বন্সো চোখ খোলে। কেইথী বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। বন্সো ধীরে জিজ্ঞেস করে, "ইয়েস?" যেন ও জানতে চায় কেন বারবার বিরক্ত করছো ?

কেইথী হাত দিয়ে লেপ সরিয়ে সামান্য জায়গা বানিয়ে বসে। তারপর ওর কপালে হাত বুলিয়ে বলে, "আই নো মঁম, ইওর বয়ফ্রেন্ড গেভ ইউ দিস কুইল্ট! সৎবীর টোল্ড মী দ্যাট হী লাভড ইউ সো মাচ, অ্যান্ড সো ইউ ডিড!" কেইথী ভাবে হয়তো এ পথেই ও শাশুড়ীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

বন্সো অনেকক্ষণ চুপ থাকে। কেইথী আবার নিজের কথাগুলি বলে। বন্সো তখন উকিলদের মতন তর্জনী নেড়ে বউকে শাসায়, "যদি আমি ইংরেজী বলতে পারতাম তাহলে তোকে বোঝাতাম বউ, তোদের কাছে ও আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল কিন্তু আমার কাছে ছিল পৃথিবীর ঈশ্বর। যে লেপটাকে দেখে তুই নাক ও ভ্রু ট্যারা করিস, সেটা আমার কাছে সেই ঈশ্বরের চাদর,তার দামনের আশ্রয়। যে এহেন ঈশ্বরের দামনের উষ্ণতা ভোগ করে, তার কাছে অন্য সমস্ত সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে!"

ও জানে এই কথাগুলির বিন্দুবিসর্গও কেইথী বুঝতে পারেনি। কিন্তু অনেকদিন পর ঝড়ের মতন এতগুলি কথা বলে ওর মনে হয় আজ সমস্ত ইংরেজীবলা মানুষের উপর বদলা নিয়ে ফেলেছে!

রচনাকাল : ১৯৯৭

রজাই (পাঞ্জাবী/হিন্দী) — লেপ, বাখরু- বাহে গুরু — ঈশ্বর, দামন : স্বামীর হাতে স্ত্রী-কে পরানো গা-ঢাকা চাদর।

বিন্দর বাসরা

ডানপাশ

বাবার মৃত্যু আমার চিন্তাধারাকে যে এমনি আমূল পাল্টে দেবে তা কখনো ভাবিনি। চিন্তাধারা পাল্টাতে তো মানুষের সারাজীবন লেগে যায়। কিন্তু আমাকে একটা হঠাৎ অনুভব এসে তোলপাড় করে দেয়। ফলত আমি নিজের মধ্যে সমস্ত সম্পর্কের পেছনে লুকিয়ে থাকা জানার ক্ষমতা আবিষ্কার করি।

গ্রামের বদনাম-মহিলা সরজোর প্রতি আমার পরিবর্তিত ব্যবহার নিজেকেই অবাক করে। ওকে কেবল একটিবার ছুঁয়ে দেখার জন্য একসময় আমি লালায়িত হতাম, কিন্তু এখন আর ওর প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করি না। ঘ্রাণশক্তিও যেন পাল্টে যাচ্ছে, দৃষ্টিশক্তির গভীরতা বেড়েছে। যদিও আগের মতই দারুণ সুন্দর চুমকি বসানো কালো ঝলমলে কামিজটা পরে ঝমরঝমর করে আকর্ষিত করতে চায়। কিন্তু আমার মনে কোনই ঢেউ ওঠে না। না জানি কেন শত চেষ্টা সত্ত্বেও ওর ওড়না আমার কাছে সাদা লাগে। অথচ আমাদের বন্ধুদের কাছে ও এখনো দারুণ আকর্ষণীয়। কিন্তু আমার মনে হয় ওর গালে যেন অজস্র বলিরেখা, ওর কালো কামিজে যেন এক সুফীআনার ছাপ।

তখন সরজোকে পাওয়ার জন্যে কত না ফন্দী এঁটেছি। বন্ধুদের কাছে ওর ভারী নিতম্ব আর অন্তিম মুহূর্ত অব্দি সঙ্গ দেওয়ার নানা রসালো গল্প শুনে কত না অস্থির হয়েছি। কিন্তু ওর কাছে গেলে আমাকে একদম ঘাস দিত না। আমি ভাবতাম, গ্রামের সবার জন্যে ওর দরজা অবারিত শুধু আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? আজ এতদিন পর আমি ওর ঐ ব্যবহারের কারণ বুঝতে পেরেছি। হাজার লাফিয়ে ঝাপিয়েও কোন কুলগাছ থেকে কুল না পারতে পারলে যেমন হয় ওকে না পেয়ে সেসব দিনে তেমনি আমার আকাঙ্ক্ষা প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো। আমার তৈরী প্রত্যেক চক্রব্যূহ থেকে ও অবলীলায় মাছের মতন পিছলে বেরিয়ে যেত আর আমি হাত কচলাতাম।

একদিন ওকে পাটোয়ারির হাবেলীতে ঢুকতে দেখে আমি ছিটকিনি লাগিয়ে হৈ-হল্লা করে প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু ও এবং জমা-হওয়া লোকজনও ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেয়। শুধু পাটোয়ারির বউ একদিন আমাকে ডেকে মিষ্টি খাইয়েছিল।

বাবা বেঁচে থাকতে যেসব কথা খুবই সরল বলে মনে হতো, এখন সেগুলি থেকে অনেক অর্থ

আমি খুঁজে পাই। প্রত্যেক কথা থেকে একটা নতুন গিঁট খোলে। আমি কত না ডিম আর মুর্গী চুরি করে সরজোকে দিয়ে আসতাম এই ভেবে যে একদিন ও আমাকে কাঙ্ক্ষিত স্বর্গে পৌঁছে দেবে।

বাবার মৃত্যুর পর বুঝি যদি সত্যি সত্যি ও আমার সঙ্গে কিছু করতো তাহলে সারাজীবন আফশোষ করেও কূলকিনারা পেতাম না। বছরখানেক পরপর মুম্বাই থেকে ফিরে বাবা যখন দুধসাদা জামাকাপড় পরে কানে আতরভেজানো তুলো গুঁজে গ্রামের অলিগলিতে ঘুরতো তা আমার কাছে কত না স্বাভাবিক লাগতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে অর্ধেক শরীর প্যারালিসিসের রুগী মা কেন এনিয়ে কাটকাট করে, বকরবকর করে তা আমি বুঝতে পারতাম না। বাবা মাকে এত ভালবাসে, এমনকি মুম্বই থেকে নিয়মিত চিঠি লিখে মায়ের খবরাখবর নেয়, চিকিৎসার তাগাদা দেয়, টাকা পাঠায়। যখনই বাড়ি ফেরে ঘরের সব কাজে হাত লাগায়। মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখায়। মাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়েই অভ্যাসমতন পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন একজন আত্মীয় এসে বাবাকে খুঁজতে শুরু করলে আমি গিয়ে ওর সমস্ত বন্ধুর বাড়িতে খুঁজে হয়রান হয়ে একসময় সরজোর বাড়ির কাছে গিয়ে ওর গলার আওয়াজ পাই। তিনি সরজোর স্বামী তারুর সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিলেন।

লোকে বলে বিয়ের দু'তিন বছর পরই ট্রাক চালাতে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় তারু ড্রাইভারের দুটো পা-ই কাটা পড়ে। সেই থেকে ও বিছানায়। বাবার সঙ্গে তারুর বরাবরই খুব মনের মিল। ওরা নাকি একই গুরুর কাছে ট্রাক চালানো শিখেছে। সে জন্যেই বুড়ো বিশন বাবা আর সরজোর সম্পর্ক নিয়ে আমার সামনেই হাসিঠাট্টা করলে আমি তাকে পাত্তা দিই না। ওর মন্তব্যকে আমি ঈর্ষাপ্রসূত মনে করি। আমার প্রতি সরজোর ব্যবহার থেকেও আমি তেমন কিছু আঁচ করিনি।

না জানি কতবার ও আকারে ইঙ্গিতে আমাকে কিছু বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু আমি বুঝিনি। একদিন আমি অন্য অভিসন্ধি নিয়ে তারুকে মদ খাওয়াতে গেছিলাম। আমরা গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করছি তখনই সরজো ভেতর থেকে এসে বলে, "আরে এইসব ছাইপাশ দিয়ে কেন নিজেকে শেষ করছো, এই মদের পয়সা দিয়ে ড্রাইভারকে এক জোড়া জামাকাপড়, নিদেনপক্ষে একটা গেঞ্জী তো কিনে দিতে পারতে!" একথা বলেই ও সেই যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে আর বেরিয়ে আসে না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় আমাদের বোতলটাই ফুরিয়ে গেলে একসময় উঠে টলতে টলতে দরজার কাছে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খাই। উল্টে পড়ে নাক মুখ থ্যাঁতলে পড়ার আগেই সরজো আমাকে ধরে ফেলে বলে, — "একটু কম খেলে কী চলতো না?"

আমি ওকে কাছে পেয়ে বলি, —"পরের বার ড্রাইভারের জন্য গেঞ্জি নিয়ে আসবো, তোমার জন্যেও আনবো, তোমার সাইজটা কত জানি? তোমাকে আমি দুটো এনে দেব!"

ও বলে, —"সবসময় উল্টোপাল্টা কথা, পাগল কোথাকার, আলফাল না বকে এখন চুপচাপ ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, আর এরপর থেকে শুধু তাই-ই করবে যাতে তোমার ফায়দা হয়। আমার বাড়িতে আড্ডা মেরে কী পাবে তুমি?" আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। কী জবাব দেব? হঠাৎ ওর গলা জড়িয়ে ওর গালে 'চকাস্' করে একটা চুমু খেয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসি।

বাবার মৃত্যুর পর অনেক সম্পর্ক আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। বাবা চোখ বুজতেই কাকা বলেন, বাবার অংশের টাকা নাকি ওর চিকিৎসাতেই খরচ হয়ে গেছে। তাই তিনি আমাদেরকে ব্যবসা থেকে আলাদা করে দেন। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, এখন নিজের ধান নিজেকেই ভাঙ্গাতে হবে। নিজের বাঁশিতে নিজস্ব রাগেই সুর সৃষ্টি করতে হয়।

কাকা আমাদের কষ্টের দিনে বুকে টেনে নেওয়া তো দূরের কথা আমাদেরকে দুমড়ে মুচড়ে হটিয়ে দেয়। সেই কঠিন এবং বিপরীত পরিস্থিতিতে সরজো আমাদের পাশে দাঁড়ায়। ওই আমাকে

বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

তখন প্রতিবেশী মহিলারা উচ্চরোলে কাঁদতে শুরু করলে, মাও একটা কী বলে ওদের সামনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন সরজোই ওকে সামলায়। আমিও ছুটে যাই। কিছুক্ষণ পরই মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন দু-একজন ছেড়ে সবার চোখই প্রায় শুষ্ক। সবাই বলাবলি করে, "তোদের মা পুণ্যবতী, স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় চড়বে।" আমার কাছে ওদের এই আপ্তবাক্য সেদিন একটা চপেটাঘাতের মতনই ঠাট্টা বলে মনে হয়েছিল।

বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। সরজোর রং-রূপও আবার অনেকটা আগের মতনই হয়ে এসেছে। বাবার মৃত্যুর পর সবচাইতে বেশী পরিবর্তন ওর চেহারা ও চলাফেরায় লক্ষ্য করতাম—ওর স্বভাবের বিপরীত এক আশ্চর্য শিথিলতা।

আমার সঙ্গীরা অনেকেই আজও ওর জন্যে ফকীর। কিন্তু না জানি কেন আমি যখনই ওকে দেখি, মনে হয় ওর ডানপাশটা মরে গেছে।

বাবার মৃত্যুর পর মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আমার অনুভব পাল্টেছে। আমি আরো গভীরভাবে ভাবতে শিখেছি।

রচনাকাল: ১৯৯৯

কেসরা রাম

অসুস্থ মানুষ

স্কুটারটাকে বারান্দায় উঠিয়ে ও সোজা নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ এক থাকা দরকার। ওর এই বিচিত্র দশা কেউ দেখে না ফেলে! এ কী করলো ও? এখন নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে! মেয়েটাকে আর মুখ দেখাবে কেমন করে? নিজের উপর ঘৃণা ও লজ্জায় ওর রক্তচাপ বাড়তে থাকে। মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে সবাইকে বলে দেবে না তো? তাহলে কী হবে? ওফ্, ও আব ভাবতে পাবছে না!

দুই পরিবারের মধ্যে কী দারুণ সম্পর্ক! খাওয়া-দাওয়া, হাসি-মজা, দহরম মহরম। সাক্সেনা পরিবারের কোন মেয়ে বা বউ বমেশের বাড়িতে এসে গল্পে গল্পে দেরী হয়ে গেলেও স্কুটারে করে পৌঁছে দিয়ে আসে, তেমনি রমেশের বাড়ির কেউ সাক্সেনার বাড়ি গিয়ে কথায় কথায় অন্ধকার হয়ে গেলে সাক্সেনা নিজে অথবা ওর ছেলে স্কুটার বের করে ছেড়ে যায়।

এমনিতে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। সেবার চণ্ডীগড় যাওয়ার বাসে রমেশ সীট পায়নি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলার পর এক ভদ্রলোক ওকে ডেকে পাশে বসিয়ে নেয়। তারপর সৌজন্যমূলক কথাবার্তা। ক্রমে গল্প জমে উঠে। তখনই জানতে পারে ওরা পরস্পরকে না চিনলেও দু'জনেই এই জেলা সদরেব বাসিন্দা। দু'জনের পাড়া শহরের দুই দিকে। সেই পরিচয়।

তারপর একদিন সব্জি বাজারে পেছন থেকে ওর হাত টেনে ধরে বলে, — আবে রমেশজী, কী ব্যাপার, না দেখেই চুপচাপ চলে যাচ্ছেন? রমেশ সাক্সেনাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দেয়। হেসে জিজ্ঞেস করে, — আপনি এখানে?

— এখানে আবার কী আমার বাড়ি তো কাছেই! চলুন যাবেন!

— আজ থাক, একটু তাড়া আছে!

— থাকুক তাড়া, এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে? ভদ্রলোক ওব হাত ধরে টানে। ওর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না তখন।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে সাক্সেনা ওকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, শ্রীমতী সাক্সেনা, সিম্মী, ছোটু, আর বোন সুষমা। সুষমা সরকারী হাসপাতালে নার্স! সবাই বেশ হাসিখুশী! সামান্য পরিচয়েই রমেশের খুব ভাল লাগে। ফেরার পথে ভাবে, এতো সম্পন্ন ও ভদ্র পরিবার, এতবড় বাড়ি ও ব্যবসা, তাহলে বোনকে নার্সের চাকরিতে পাঠালো কেন? নার্সদের চরিত্র তো শুনেছি ... যাক্!

কিছুদিনের মধ্যেই দুই পরিবারের মধ্যে আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। এত মিল তো আজকাল দুই ভাই এর পরিবারেও হয় না। সপ্তাহ-দশদিনে একবার তো সবাই একই খাবার টেবিলে বসেই — কখনো এর বাড়িতে, আবার কখনো ওর বাড়িতে। রমেশের ছেলেমেয়েরাও সিম্মী আর ছোট্টুর সঙ্গে খেলা করতে করতে পরস্পরের দারুণ বন্ধু হয়ে পড়ে।

রমেশের বাড়ি হাসপাতালের কাছেই। সুষমা প্রায়ই আসা-যাওয়ার পথে ওদের বাড়ি চলে আসে। সুষমা 'দাদা, দাদা' ডেকে কাছে এলে রমেশ তটস্থ থাকে। না জানি কেন শুধু ওর সঙ্গেই রমেশ সহজ হতে পারে না। ওকে দেখলেই নার্সদেব চরিত্র নিয়ে শোনা কথাগুলি মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকে।

আর তখুনি হয়তো সুষমা ঘড়ি দেখে বলে উঠে, এ মা বৌদি, লেট হয়ে গেল, দাদাকে বলো না আমাকে হাসপাতালে ছেড়ে আসতে! রমেশ তক্ষুণি স্কুটার বের করে হাসপাতালে ছেড়ে আসে। এরকম চলতে থাকে। মাঝেমধ্যেই সুষমা হাসপাতাল ফেরৎ ওদের বাড়িতে বসে আড্ডা মারে। হাসিখুশী প্রাণচঞ্চল মেয়েটির গল্প আর হাসি যেন অফুরাণ। বাচ্চাদের সঙ্গে যখন খেলে তখন নিজেও বাচ্চা হয়ে পড়ে। কখনো হাসপাতালের অসুস্থ কিম্বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুগীদের কষ্টের কথা, তাদের পরিবারবর্গের আদিখ্যেতা কিম্বা অনেকক্ষেত্রে স্বার্থপরতার কথা বলতে বলতে কখন অন্ধকার হয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়লে এ বাড়ি থেকে ফোনে জানানো হয়, — চিন্তা করবেন না, ওর দাদা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

অগত্যা রমেশ স্কুটার বের করে ওকে ছেড়ে আসে, আর সেই সুযোগে সাক্সেনা পরিবারের সবার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়। কখনো তো চা-ও খেয়ে আসতে হয়, আর বহন করতে হয় সব্জির বাটি। — কোন স্পেশাল ডিশ্!

এই বাড়ি থেকেও তেমনি সুষমা মারফৎ যায়। দেখতে দেখতে সপ্তাহ মাস পেরিয়ে যায়।

* * * * *

— হে ভগবান, নাজানি এই দুনিয়ার কী হবে!

সুষমা এসেই ওদের সোফায় বসে পড়ে। পার্সটা টেবিলে রাখে। মিনিট খানেক দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকে। তারপর বলে, — বৌদি একগ্লাস জল খাওয়াও না গো!

— আনছি ... ! কী ব্যাপার ? আজ আমার ঠাকুমার চোখমুখ শুকনো কেন?

— চোখমুখে কী দোষ বৌদি, দিনকালই এমন পড়েছে যে

— ও ঢকঢক করে পুরোজলটা গলাধঃকরণ করে বলে, — আজ হাসপাতালে—

— কোন অ্যাকসিডেন্ট কেস?

— অ্যাকসিডেন্ট হলে আর কী, বড়জোর লোক একবারে মরে যায়; এর থেকে অনেক মারাত্মক সামূহিক ধর্ষণ! বলতে বলতে সুষমার মুখের চামড়া কুঁচকে ঘৃণা জেগে ওঠে। রমেশের স্ত্রীও আঁতকে উঠে বিস্তারীত শোনার জন্যে ওর পাশে সোফায় বসে। সুষমা একটু হাফ ছেড়ে বলে, — দাদা এখনো আসেনি?

— এসেছে, আবার কোথায় গেছে, আমাকে কেউ বলে যায় নাকি ! কবে হয়েছে ধর্ষণ?

— গতকাল ... মেয়েটির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, বেচারী বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, জ্ঞান ফিরতেই আবার ফুঁপিয়ে কান্না, হিক্কা তুলতে তুলতে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে! একটু থেকে ঢোক গিলে সুষমা বড়বড় চোখ করে বলে, তিন তিনটে লোক ... কী নির্মমভাবে মেয়েটাকে খুবলে ... আর দেশের আইনকানুন দেখ, উল্টো পুলিশ এসে ওকেই জেরা করছে, ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট চাইছে ! ও আবার ঢোক গেলে। ওর চোখে জল। বৌদিরও চোখ ছলছল। কোন ভাষা খুঁজে পায়

না।

সুষমা বলতে বলতে বারবার শিউরে উঠছে, জানো বৌদি, ডাক্তারবাবু পুলিশের কথামতন ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে মেয়েটি দু'হাত দিয়ে নিজের গলার কাছ থেকে কামিজটাকে এক হ্যাঁচকায় ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলে, — নাও চেক করে দেখ, এখন আমার আর কী বাকি রয়েছে! তারপরই আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

— হে ঈশ্বর ! লোকগুলি কী জালিম!

— তা আর বলতে! ওর শরীরে অসংখ্য আঁচড় কামড়ের গভীর ক্ষত, রক্ত জমাট বেঁধে জায়গায় জায়গায় নীল—

— কারা করলো, জানা গেছে?

— একজন নাকি পরিচিতই, ... ওদের সন্দেহ এই মেয়েটার ভাই-এর সঙ্গে নাকি ওদের কোন আত্মীয়ার প্রেম টেম চলছে ... তারই নাকি বদলা ...!

-- বাহ্, কী বাহাদুরের মতন বদলা...!

—জান বৌদি, মেয়েটার কষ্ট দেখে আজ, প্রথমবার আমি ডাক্তারবাবুর চোখে জল দেখেছি, তিনি চিকিৎসা ছাড়া আর কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেননি, এমনি অত্যাচারের রিপোর্ট লিখে দিয়েছেন।

সুষমা বলতে বলতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলো যেন কাছে পেলে এক্ষুণি লোকগুলিকে ফাঁসি দিত।

— রিপোর্ট লিখে আর কী হবে সুষমা, ... ওর তো সব কিছু লুট হয়ে গেল!

— তা নয় তো কী! পরে জ্ঞান ফিরলেও আমাকে বলেছে, দিদি আমি এমনি এমনি মরে যাব না ... এখন তো একটা কারণেই বেঁচে থাকবো, .. এই লোকগুলির কুৎসিত আর বীভৎস চেহারাকে উলঙ্গ করে দেখাবো, ... এই লোক কেন, . যেখানেই মহিলাদের উপর অত্যাচার হবে। আমি কী বলবো বৌদি, জড়বৎ দাঁড়িয়ে থাকি! মেয়েটা পাগল না হয়ে যায়।

— পুরুষপ্রধান সমাজে এটা বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়, রোজই খবরের কাগজে পড়ি, পুরুষরা কুকর্ম করে আর অসহায় মেয়েগুলি তার ফল ভোগে! এ কেমন পৌরুষ, নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া হলেও গালি দেবে মা-বোন তুলে!

বলতে বলতে বৌদিও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মেয়ে মানুষের কষ্ট মেয়েমানুষের থেকে বেশী কে বুঝবে!

তখনই ডোরবেল বেজে ওঠে। রিঙ্কু উঠোনে খেলছিল, ও গিয়ে দরজা খুলে দেখে ওর বাবা। রমেশ ওর স্ত্রীকে কিছু বলতে গিয়ে ওখানে সুষমাকে বসে থাকতে দেখে অপ্রস্তুত হেসে চুপচাপ গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। এসব ঘটনাই লোকে কাউন্ট করে সুষমা, না হলে কি এমনি জন্মের আগেই মেয়েদের মেরে ফেলতে চায়।

— সেটাও পলায়নবাদী মানসিকতা, এই মানসিকতা যে কবে বদলাবে, বা আদৌ কোনদিন বদলাবে কিনা কে জানে বৌদি!

একথা বলতে বলতেই দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়ায় ও চমকে উঠে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে, — বাপ্‌রে দেরী হয়ে গেছে, আজ উঠি! — ঠিক আছে, অন্ধকার হয়ে আসছে, সাবধানে যেও।

দু'দিন পরই সুষমা এসে ব্যাগ থেকে একটা কাশির সিরাপ, কিছু আয়রণ আর ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ট্যাবলেট বের করে বলে, — নাও বৌদি, এগুলি বাচ্চাদের কাজে লাগবে।

— সে কী, আজ আবার এতগুলি ঔষধ!

— ডাক্তারবাবুর আলমারী ভরে গেছে, সব মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা স্যাম্পল দিয়ে যায়, কাল বিকেলে হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেছে তাই আর এখানে হয়ে যাইনি।

— ডাক্তারবাবু কিছু বলবেন না?

— আরে বলবেন কি, নিজেই দিয়েছেন, ডেট এক্সপেয়ার হওয়ার আগে বাড়ির কারো কাজে যদি লাগে!

— তুমি আমাদের ঔষধের খরচ কমিয়ে দিয়েছো! কাউকে অসুস্থও হতে দাও না! — আচ্ছা বৌদি আসি, দেরী হয়ে গেছে!

ও বেরুতে যাবে তখনই রমেশের সঙ্গে দেখা। ও স্কুটার বের করছে দেখে সুষমা বলে উঠে,

— দাদা দাঁড়ান দাঁড়ান, ভালই হয়েছে, আমাকে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবেন, দেরী হয়ে গেছে ভীষণ!

রমেশ হেসে চুপচাপ স্কুটার স্টার্ট করে। সরু গলি দিয়ে বেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছায়। পাঁচ ছশো মিটার এগিয়ে হাসপাতাল রোড-এ চলতে শুরু করে রমেশ বলে, — শুধু বৌদিকে ঔষধ দিলে চলবে, মাঝেমধ্যে আমাকেও দিও!

সুষমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, — আপনার আবার কী রোগ?

— একটু আধটু রোগ তো সবারই থাকে!

— তবু, কী রকম রোগ সেটা তো শুনি।

— কিছুটা শারীরিক, কিছুটা মানসিক, এই হৃদয়সংক্রান্ত ...!!!

একথা বলতে বলতেই ও স্কুটারের গতি কম-বেশী করে আর একটু পেছনে সরে বসে। ফলতঃ ওর পিঠে দু'একবার সুষমার বুক চেপে যায়। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ওব সাবা শরীবে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। তবু সুষমা চুপ থাকে। ততক্ষণে ওরা হাসপাতালে পৌঁছে গেছে।

সুষমা নেমে দাঁড়ালে রমেশ মুচকি হেসে বলে, — জবাব দিলে না? সুষমার ফর্সা মুখ লাল হয়ে পড়ে। রমেশ এক অজানা পুলকে শিহরিত।

— না দাদা, এ ধরনের রোগের চিকিৎসা আমার কাছে নেই, আমি নার্স, পীড়িত কাতর মানুষের সেবা করি...!

— তাহলে আমার কী হবে?

— বেশ্যাবাড়ি যান! বলেই সুষমা হনহন করে হেঁটে সোজা হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ে।

রাজীব শেঠ

সুরভির সন্ধানে

অরণ্যে ঢুকতেই ওর শরীর ও মনে কিছু হয়। ও আয়না হয়ে পড়ে। ঘন গাছগাছালির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় ও যেন নিজের বুকের ভেতরে হাঁটছে।

অরণ্য ওর অতি আপন ও সমব্যথী। গাছেরা ওকে চেনে। ওর স্বভাবের প্রত্যেক রঙের পাতার মতন পরিচিত বাহু প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে। তখন ভেতরে জমাট সমস্ত কান্না গলে বেরিয়ে আসে। গাছের পাতায় পাতায় জমা কুয়াশারা ওর অশ্রু। ওকে দেখে ফুলেরা শিশুর মতন হাসে। বৃক্ষলতার চুম্বনে সেও শিশুরই মতন খিলখিলিয়ে হাসতে শুরু করে।

জ্যোৎস্নারাতে ও গিয়ে কোন উঁচু পাথরে বসে। তখন পশুপাখিরা এক এক করে কাছে এসে ওকে ঘিরে বসে। ও পাহাড়ি নদীর মতন কথা বলে। বলতে বলতে চোখ গভীর হয়। ও নিজের ভিতরেই নেমে পড়ে। বাতাস থেমে যায়। চাঁদ একটা গাছের ডাল ছুঁয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। পুরো অরণ্য ওর নীরবতাকে অনুভব করে। নীরবতার চাদর মুড়ে সবাই ওকে ঘিরে থাকে।

অরণ্যের সঙ্গে এই সখ্যতা অনেকদিনের। না জানি কেন, নিজস্ব বস্তি ওর কাছে বরাবরই আজব লাগে। ও ঠিক মতন বুঝতে পারে না। জঙ্গলের নিয়মে ও একটা পরম্পরা খুঁজে পায়। কিন্তু বস্তির নিয়ম অর্থহীন লাগে। অনেক লোকের মাঝে থাকলেও কাউকে এমন সব প্রশ্ন করে যার উত্তর তিনি নিজের মুখোশ না খুলে দিতে পারবেন না। সেজন্যে সবাই ওকে এড়িয়ে যায়। একাকীত্বই ওর নিয়তি। বস্তিবাসীদের দৃষ্টি, বুদ্ধি ওকে অবাক করে। ওদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান থাকে। এই সন্দেহ বাড়তে বাড়তে কখনো সব কিছু নিরর্থক লাগলে ও গিয়ে শ্মশানে বসে। চারপাশের সবাইকে মরা মানুষের মতন নিষ্প্রাণ মনে হলে ও আকাশের নিচে গোলাপ বাগানে ছুটে যায়।

বস্তির শিশুরাই শুধু ওর প্রিয়। পশুপাখি গাছগাছালির সঙ্গে ওর গভীর বন্ধুত্ব। কখনো মনে হয় মানুষের ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশী দুর্বোধ্য। বস্তির পরিণত মানুষদের সঙ্গে ওর আওয়াজ মেলে না। এই দুঃখ ওকে কুরে কুরে খায়। রক্তাক্ত করতে থাকে। ওদের মধ্যে থেকেও ওদের থেকে অনেক আলাদা বলে বস্তিবাসীরা ওকে অসামাজিক ভাবে।

ওর ইচ্ছে করে পুরো বস্তিকে নিজের বুক চিরে ওদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থান দেখায়। মাঝেমধ্যে সবার সঙ্গে মিশতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু ওদের সঙ্গে মেলামেশার শর্তটা পছন্দ হয় না। এখানে সবাইকে মুখোশ পড়তে হয়। মুখোশ না পরলে কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

সে জন্যেই ওদের মতন সামাজিক মানুষ হওয়া আর হয়ে ওঠে না। ও যে নিজের চেহারাটাকে ভীষণ ভালবাসে! মুখোশের আড়ালে এই চেহারাটা ঢেকে রাখতে চায় না। তাই এমনি শাঁখের করাতের বুকে জীবনযাপন করাটাই স্বীকার করে নিয়েছে। কখনো মনে হয় বস্তির মানুষেরা সবাই মৃত অথবা ওর নিজের হৃৎপিণ্ড প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধুকধুক করে। ও যতই চুপ থাকে না কেন নিজের নিশ্চল, নির্দোষ দৃষ্টিই ওকে সবার শত্রু বানিয়েছে। বস্তিবাসীরা তাই ওকে 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' আখ্যা দিয়েছে। এক নীরব ষড়যন্ত্রে ও এখন বস্তি থেকে নির্বাসিত।

সেই দিনগুলিতে যাযাবরদের একটা টোলা ওর বাড়িব কাছেই কোত্থেকে এসে ডেরা বাঁধে। ছাদে দাঁড়িয়ে ও ওদের হৈ চৈ গানবাজনা-ঝগড়া-চিৎকার দেখে শুনে এক অনাস্বাদিত জীবনের স্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করার চেষ্টা করতো। এ যেন ভেতরের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কোন সুঁইকে বাইরের আলোকে খোঁজা। ওর এই একাগ্রতা লক্ষ্য করেই হয়তো ঐ কবীলার এক যুবতী ওকে ইশারায় ডাকে। একটা জংলী ফল খেতে দেয়। তারপর ওর মাথায় গাট্টা মেরে পৃথিবী আর আকাশের মাঝে নিজের হাসির মণিমুক্তো ছড়িয়ে দেয়। ফল খেতে খেতে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল পর জ্ঞান ফিরলে দেখে যুবতী তখন অস্তগামী সূর্যের কিরণে নিজের দীর্ঘ কটা চুল খুলে খুলে ধরছে। সেই রাতে ও সারারাত ঐ রাত্রির সঙ্গে জেগে থাকে।

বস্তি ওকে অনেক ক্ষত দিয়েছে। কবীলা দিয়েছে বাঁশের বাঁশী। বাঁশীর ধুন ওকে উন্মাদ করে দেয়। ও বাঁসুরীর ধুনে নিজের চেহারা দেখে, মুচকি হাসে। সমস্ত বস্তিতে সঙ্গীত ছড়িয়ে দেয়। বস্তি ওকে উপহারস্বরূপ ঢেলা ছুঁড়ে ব্যথা দেয়। ঢেলাটাকে কপালে ঠেকিয়ে সে নিজের ঝোলায় পুরে নেয়। তারপর ওর জন্যে প্রতীক্ষারত বাচ্চাদের সঙ্গে 'ভণ্ডো ভণ্ডারিয়া' খেলতে থাকে। ওর সঙ্গে শিশুরা সারা মাঠে ছুটতে থাকে। তাই দেখে বড়রা হাততালি দেয়। হাততালির তোড়ে বাচ্চারা খেলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওদের আর খেলতে ভাল লাগে না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে সেও ফিরে এসে ঘরে ঢুকে পড়ে।

একদিন সে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল। কবীলার শিকারী কুকুর ওকে ডেকে নিয়ে যায়। কবীলার লোকেরা অরণ্যে যাচ্ছে। ও জিজ্ঞেস করে, শিকার খেলতে যাচ্ছেন? কবীলার সর্দার রহস্যময় আওয়াজে বলেন, হ্যাঁ, শিকার খেলতে এবং জিততে!

— জিততে? কার সঙ্গে জিততে?

— নিজের থেকে জিততে!

সর্দারের রহস্যময় চোখ দেখে ও যাযাবরদের পেছন পেছন চলতে থাকে। বস্তি পেছনে থেকে যায়। চলতে চলতে একসময় ওরা এক বালুকাময় ময়দানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তারপরই ঘন অরণ্য শুরু হয়ে যায়। কবীলার সর্দার ওকে থামিয়ে বলে, তোমার হাতে কোন অস্ত্র নেই, খালি হাতে জঙ্গলে ঢুকলে অনেক বিপদ হতে পারে। ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে। কবীলার লোকেরা জঙ্গলে ঢোকে। ও পেছন পেছন জঙ্গলে ঢোকে। বৃক্ষ ও লতার নিবিড় স্পর্শে ওর অস্তিত্বে শিহরণ জাগে।

দুপুর অব্দি ওরা সারিবদ্ধভাবে একজনের পেছনে আরেকজন চলতে থাকে। তারপর একসময় শিকারের জন্যে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ওদের হুটোপুটিতে অরণ্য উত্তপ্ত হয়। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ে। খিদে পেয়েছে। এদিক-ওদিক তাকায়। ফলের গাছ খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে গন্ধ শোঁকে। মৌমাছির ওড়াওড়ি অনুসরণ করে। অবশেষে একটা টসটসে সবেদার ভারে নুয়ে পড়া গাছ পেয়ে ও কিছু ফল পেড়ে খায়। কবীলা সুন্দরীর কথা ভাবে। ওরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। ইস্, ও এখানে এলে এই দারুণ স্বাদের সবেদা খেতে পারতো! ভরাপেটে সবেদা গাছের তলায় শুয়ে মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে। একটা অদ্ভুত শব্দে

ওর ঘুম ভাঙ্গে। চারপাশে নীলাভ নীরবতা। কবীলা সুন্দরী সামনের গাছগুলির নীচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। ওকে তাকাতে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবীলার কুকুর বাতাসে থুতনি উঠিয়ে কী যেন শুকছে! ও তৎক্ষণাৎ একটি কুকুরের রূপ ধারণ করে লেজ নাড়াতে নাড়াতে বাতাসে মুখ উঁচিয়ে শুকতে শুকতে ওখানে যায়। এক আজব সুরভি ওর ভেতরে উত্তাল জোয়ারভাটা জাগিয়ে তোলে। ও সুরভির স্রোতে গা ভাসিয়ে উৎসের সন্ধানে ছোটে।

অরণ্যের মাঝামাঝি পৌঁছে এক আজব দৃশ্যে ও এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এক রহস্য যেন নিজে থেকে ওর সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। তখন অন্তরের সুরভিতে উন্মত্ত কস্তুরি মৃগ বারবার এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায়।

এক মুহূর্তের জন্যে সে নিজেকে উন্মোচিত হতে দেখে। অরণ্যের চমৎকারকে প্রণাম করে। অন্তরের সুগন্ধী অরণ্যে ঢুকে পড়ে।

এখন অন্তরে-বাহিরে আসা যাওয়া সহজ হয়ে পড়ে।

রচনা কাল : ১৯৯৬

ভগবন্ত রসুলপুরী

কীট

চেঁচামেচিতে জেগে উঠে প্রীতু। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোয়। নীচু দেওয়াল টপকে ওর দাদা লক্ষের ঘরে চলে আসে। ওদের রুটিপানী আলাদা হলে কী হবে, দুইভাই-এর মধ্যে এখনও আগের মতন ভাব-ভালবাসা রয়েছে। ও এসে দেখে প্যারী শ্বশুরের খাটিয়ার কাছে নিজের খাটিয়া বিছিয়েছে। বাচ্চা দুটিও ওর সঙ্গে ঘর থেকে বেবিয়ে এসেছে। এই ঘরটা গোয়ালের কাছে বলে মশার উৎপাত বেশী। ওদের কান্নায় বাকীদেরও ঘুমের বারোটা বাজে।

প্রীতু রোশনের ঘরে চুপি দিয়ে দেখে ও শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে। প্রীতু জিঞ্জেস কবে, কী রে ঘুমাসনি? রাত হলে তোর কী হয়?

রোশন বলে — না কাকা, আমার মাথায় বর্ষার ব্যাঙ ডাকছে — টরর-টরর! কানে শো শো শব্দ.... কাছে এসো... দেখো তো এটা কি আমারই মাথা? কান দিয়ে ঢুকে কানপট্টির পাশে যে পোকাগুলি কিরকির করছে ওদেরকে কী করি?

ততক্ষণে সিগারেট জ্বলতে জ্বলতে ওর আঙুলে ছেঁকা লাগতেই ও সেটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। এভাবে যে-কোনদিন বিশাল অগ্নিকান্ড হয়ে যেতে পারে।

প্রীতু আর কী করবে? ও নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। কী করলে এই নিত্যদিনের হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা ও ভেবে পায় না। রোজই প্যারী ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়ে আর রোশন পাড়া জাগিয়ে চেঁচায়, "হারামজাদীর পা ভেঙ্গে দেব, এরকম বউ আমি সহ্য করবো না, শালী নিজেকে কী ভাবে?"

পরদিন সকালে প্যারী চা বানিয়ে আনলে ও উঠে চায়ের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। প্যারীকে ভাঙ্গা গ্লাস উঠিয়ে মারতে গেলে ও ছুটে শ্বশুর লক্ষার পেছনে লুকায়। রোশন তখন সবক'টা চায়ের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে সব চা উঠোনে ফেলে দেয়!

প্রীতু হৈচৈ শুনে আবার দুইবাড়ির মাঝের নীচু দেওয়াল টপকে গিয়ে ওকে আটকায়। দাদা লাক্ষার শরীরে এখন আর এত জোর নেই। প্রীতু রোশনকে নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ে। ওর হাত ধরে টানতে টানতে নহরের* কাছে নিয়ে যায়। নহরের বাঁধানো কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে প্রীতু জিজ্ঞেস করে, "রোশন, তুই সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিস, নিজের বউ-এর সঙ্গে কেউ এমন করে? নিত্যদিনের ঝামেলা আর ভাল লাগেনা!"

রোশন বলে, "তুমিই বল কাকা, আমি কী করি, রুটি চাইলে এমনভাবে পালায় যেন কারেন্ট লেগেছে...... ওর বেশী কী ভেঙ্গে বলবো... নিজেই বুঝে নাও........ তারপর মানুষ হাত ওঠাবে না তো কী করবে? বিছানায় বাচ্চাদেরকে মাঝে শুইয়ে ও গিয়ে ওপাশে শোয়, আমিও তো পুরুষ....... আমারও তো ইচ্ছে করে, কিন্তু ও কিছুই শোনে না....... সবসময় আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়!" রোশন বকবক করেই যায়। প্রীতু চুপচাপ শোনে। তারপর ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়।

প্রীতু ঘরে ফিরে ওর স্ত্রীকে সব বলে। ওর স্ত্রী লক্ষার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে। লক্ষার স্ত্রী তার পুত্রবধূকে ডেকে বলে, "মাঝরাতে খাটিয়া উঠিয়ে ঘুরতে লজ্জা করে না? দুই বাচ্চার মায়ের এরকম ঢঙ শোভা পায় না। ও তো তোমার স্বামী, মাঝরাতে তোমার বিছানায় কোন্ কালনাগ এসে ঢোকে? বয়স বাড়ছে না কমছে? শরীকরা কী বলবে?"

প্যারী লাজুকভাবে বলে, "আপনারা কি জানেন না মা? বিদেশ থেকে কী সব ছাই ভস্ম খাওয়ার অভ্যাস করে এসেছে। রোজ মদ খায় —সবসময় মুখে জর্দা থাকে। কে ওর কাছে যাবে? ও কেমনতরো পুরুষ... এই দেখুন আমার সারা শীরে ওর নখের দাগ, এই দেখুন রোজ কীরকম অত্যাচার করে! ঐ সময়কার কথা ভাবলে বুক কাঁপে আমার ... না জানি কোথাকার প্রেত এসে ভর করেছে! ও আমাকে মেরে ফেলবে, আর কোনদিন ওর সঙ্গে শোব না বাবা!" ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। ওর কথা শুনে শাশুড়ী চুপ করে যায়। আর কী বলবে ও?

কিছুদিন পর থেকে দিনের বেলাতেও রোশনের শরীরে শয়তান ভর করে। ও আজকাল কাজে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। সবসময় সিগারেট ফুঁকতে থাকে, আর জর্দা খেয়ে থুতু ফেলে ফেলে পুরো উঠোন নোংরা করে রাখে। প্যারী বারবার ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে।

রাতে বিছানায় শুয়ে বড় বড় চোখে ছাদের কড়িবরগার দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। বাল্বের চারপাশে বসা পোকাগুলিকে টিকটিকিরা ঝাপটে ধরলে ও দারুণ উত্তেজিত হয়। ওর খুব ভাল লাগে। একদিন মাঝরাতে ও লক্ষার খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, "আরে তুই কেমন বাবা, নিজের কাছে প্যারীকে শোয়াতে লজ্জা করে না? নিজের পাকা চুলের কথা ভেবে ওকে তোর কাছ থেকে তাড়া!" ওর চেঁচামেচিতে লক্ষা সহ সবাই জেগে ওঠে। বাচ্চা দুটি কাঁচাঘুম ভেঙ্গে উঠে কাঁদতে শুরু করে।

রোশনের বাবা মাথায় হাত দিয়ে ভাবে ছেলেটা আরব দেশ থেকে ফিরে অব্দি সুস্থ নেই। ওখানে যে ক'বছর ছিল, ও গাধার মতন কাজ করতো। সেখানে নাকি স্ত্রীলোকের মুখ দেখা ঈদের চাঁদ দেখার মতনই দুর্লভ ব্যাপার। ব্যস, সন্ধ্যায়, বন্ধুদের সঙ্গে বসে ভিডিওতে ব্লু ফিল্ম দেখতো। মেয়েদের নানানরকম পোজঅলা রঙিন পত্রিকা পড়তো, বুকে নিয়ে ঘুমাতো। এসব দেখেই হয়তো ওর মনে বিকৃত কামের উদ্ভব। ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও ব্লু ফিল্মের ঢঙে পাশব রমন করতে চায়। আঁচড়ে দেয় কামড়ে দেয়। ওর বউ কতদিন আর এসব সহ্য করবে, ও উঠে চলে আসে। এই নিয়েই ওর যত রাগ। শরীকরা ওকে নিয়ে উপহাস করলে রোশন বলে, — এই যে ঘড়িটা দেখছো, এ থেকে আমি সারা পৃথিবীর মহিলাদের কথা শুনতে পাই, তোমরা আমাকে কী ভাবো? হা-হা-হা! পাকিস্তানের নাম শুনেছো? সে দেশের লোকেরা চারটে করে বউ রাখেন, আমাদের দেশের রাজারাও নাকি তাদের হারেমে অনেক অনেক স্ত্রী রাখতো, এই অয়ারলেসে আমি খবর পেয়েছি দিল্লীর রেডলাইট এলাকা জী বী রোডের সীমা নাকি বেড়েই চলেছে, সমস্ত দিল্লীই ক্রমে রেডলাইট এলাকা হয়ে পড়ছে, টাকা থাকলে যার ঘরে খুশী ঢুকে পড়ো, যেকোন মহিলার সঙ্গে—হা-হা-হা!

ওর কথা শুনে সবাই হাসে। এতে ও আরো মজা পায়। বাড়ি এসে প্যারীর উপর অত্যাচার করে। দুপুরবেলাতেই সবার সামনে ওর কামিজ ছিঁড়ে উলঙ্গ করতে চায়। প্যারী রেগেমেগে বাপের

বাড়ি চলে যায়। তারপর ও আর এক মিনিটের জন্যেও শ্বশুরবাড়ি ফেরে না। পঞ্চায়েত মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে। কিন্তু দু'পক্ষই পরস্পরকে গালিগালাজ করে, অবশেষে ওদের দু'জনের তালাক হয়ে যায়।

সেদিন থেকে রোশন নিজের ঘরেই পড়ে থাকে। বিছানায় শুয়ে বসেই মায়ের দেওয়া চা রুটি খায়। চা ঠান্ডা করে খায়, রুটি শুকিয়ে বাসি হয়ে যায়, তারপরও সেগুলি টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়। বিদেশে ব্লু ফিল্ম দেখতে দেখতে গোঁফে তা দিয়ে দিয়ে যে বিশাল কুন্ডলী পাকিয়েছিল সেটা এখন আলগা হয়ে পড়ে। গোঁফের লোম ঝরতে থাকে। ওর হাতে তা দেওয়া গোঁফের কুন্ডলী না এলে ও আরো হয়রান হয়ে পড়ে।

একদিন ছোটভাই-এর ছেলেকে ঘরে ডেকে এনে ওকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে ওর মুখে চুমু খেতে থাকে। মুখের দুর্গন্ধ ও অতর্কিত কিছুর ভয়ে ও চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। ছোটভাই-এর বউ আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এসে অনেক কষ্টে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায। তার আগেই রোশন কামড়ে ছেলেটার গালের মাংস খুবলে নিয়েছে, ভ্রাতৃবধূকেও অশ্লীলভাবে আক্রমণ করে ওর সালোয়ারের নাড়া খুলে দিয়েছে। ও বাইরে গিয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। রোশন তখন উন্মাদের মতন গর্জাচ্ছে, ওর মুখ দিয়ে ব্যর্থতার গ্যাজলা বেরুচ্ছে।

রোশনের ছোটভাই, প্রীতো ও আরো কয়েকজন তখন ওকে ধরাধরি করে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পাগলের ওয়ার্ডে ভর্তি করে ফিরে আসে। পথে ও ওযার্ডে গিয়ে ও এতই উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে ওর হাত পা খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। ও অনেক ছটফট করে। দু-একদিনের মধ্যে ঔষধ আর ইঞ্জেকশানের প্রভাবে ও ভীষণ শিথিল হয়ে পড়ে। বাড়ির লোকজন দেখতে এলে ওদেরকে গালিগালাজ করার ইচ্ছে হলেও ওর গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় না, ও উঠে সবাইকে মারতে চায়। কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়তে পারে না। নিজেকে মৃত মনে হয়, ওর মস্তিষ্ক কি আকাশে উড়ে গেছে? ও এখন আর কোন মহিলা সংক্রান্ত খবর শুনতে পাচ্ছে না কেন? হাতের আঙুল পায়ের আঙুলগুলি অবশ হয়ে ফুলে গেছে। পা থেকে মাথা অব্দি সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন কুঁকড়ে গেছে, রক্তও জমে যাচ্ছে নাকি, ওর কাছে সব ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে।

তারপর যখন মাথার দুপাশে বিজলীর ঝটকা লাগায়, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রীতু হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। ইয়া বিশাল চেহারার রোশনকে চার-পাঁচজন লোক অনেক পাছড়াপাছড়ি করে নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়। ডাক্তারবাবু ইলেকট্রিক শক দিতে শুরু করলে রোশনের চেহারা টকটকে লাল হয়ে পড়ে, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হাত কব্জির ওখানটায় মুড়ে যায়। সারা শরীর বারবার লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে........তারপর কিছুক্ষণ আছাড়িবিছাড়ি করে ও যখন একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে ওরা আবার ওকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

এমনি করে প্রায় ২০ দিন ওকে ওখানে রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ছেড়ে দেয়, ডাক্তারবাবু প্রীতো ও রোশনের ছোটভাইকে ডেকে বলে, এ রোগ কোনদিনই একেবারে সারবে না! আপনারা নিয়মিত ঔষধ খাইয়ে যাবেন। এবার বাড়ি ফিরে রোশন শুধু ঔষধ খায় আর চুপচাপ থাকে। শরীর ভীষণ কান্ত। ও আর কোনদিন বাচ্চাদেরকে দেখে আগের মতন চুমু খাবে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ যাত্রায় ওর জীবন বেঁচে গেছে। ও আর কোনদিন ছোটভাই-এর বউকে জবরদস্তি আদর করতে যাবে না। এসব ভাবতে ভাবতে ও কানের কাছে ঝি ঝি পোকার ডাক শুনতে পায়। ও বুঝতেই পারে না কখন ঘুম এসে ওর ভাবনাগুলিকে ওর মস্তিষ্কের কুন্ডলী থেকে আলাদা করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। ও এলিয়ে পড়ে।

প্রীতু ভাবে, গ্রামের কোন ছেলেকে আর আরব দেশে যেতে দেবেনা।

রচনাকাল: ১৯৯৩

আজমের সিদ্ধু

ডাইনোসর

প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে দেখি তখনো নাটক শুরু হয়নি। উদ্যোক্তারা মন্ত্রীর অপেক্ষায়। দরজা দিয়ে ঢুকতেই আমাকে দেখে দত্তা সাহেব মুচকি হাসেন। আমি উইশ করি। স্টেজ সেক্রেটারী আমার পরিচয় ঘোষণা করেন। অনায়াসে মাটি থেকে আকাশে পৌঁছে দেন। 'আনবর্ণ চাইল্ড' সিনেমাটির প্রশংসা করতে থাকেন। আমি স্টেজের কাছে পৌঁছুতেই ওর ইশারায় পুরো হলে হাততালির ঢেউ ওঠে। সামনের সারিতে বসা দর্শকদের দেখি। শাবানা নাক কুঁচকে আমাকে ভ্যাঙ্গায়। ওর এইসব দুষ্টুমি আমার ভাল লাগে।

তখুনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জোশীজী এসে পৌঁছান। কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সুযোগ বুঝে চুপচাপ গিয়ে দ্বিতীয় সারিতে ঠিক শাবানার পেছনে বসে পড়ি। দত্তা সাহেব নিজে উঠে গিয়ে এখন মাইক সামলান। তিনি জোশী খানদান আর সরকারের প্রশংসার রামধনু তৈরী করেন। মন্ত্রীজীর কপালে তিলক চকচক করে। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী, কাঁধে সিল্কের উত্তরীয় পরে মন্ত্রীজীকে দারুণ লাগছে। দত্তা সাহেব এখন মন্ত্রীজী সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা শোনান। ওর ঘরের গল্প, পারিবারিক টুকিটাকি আর রাজনীতি মেশানো এইসব অভিজ্ঞতার গল্প ওর পরিবারের সঙ্গে মন্ত্রীজীর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা প্রকট করে। মন্ত্রীজী তাই শুনে হেসে হেসে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কখনো চশমা ঠিক করেন, কখনো ধুতির কোঁচা পরিপাটি করেন।

এই এস কে দত্তা-ই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি সিনেমা জগতের হোমরা চোমরা, আজকাল সিনেমা ছেড়ে দূরদর্শনের জন্যে সিরিয়াল বানাচ্ছেন। ওর তৈরী 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' একটি বহুচর্চিত ধার্মিক সিরিয়াল। এই সিরিয়ালও দত্তা সাহেবকে অনেক প্রসিদ্ধি এনে দিয়েছে। আজকের এই আয়োজনের উদ্দেশ্যও এখন আমি পরিষ্কার বুঝে গেছি।

এখন তিনি দূরদর্শনে প্রদর্শিত অন্য সিরিয়ালগুলি নিয়ে বলছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দূরদর্শনে কেবল ভারতীয় সংস্কৃতি ভিত্তিক সিরিয়ালই দেখানো উচিত। ওর ভাষণ এখন একঘেয়ে লাগছে। আমি অন্যদিকে মন দিই।

এই প্রেক্ষাগৃহের গায়ে লাগা ওপেন এয়ার থিয়েটারে শ্রীমতী দত্তা সহ আরো অনেক উদ্যোক্তা, অধিকাংশই মহিলা। ওরা ব্যস্ত। ওরা কী নিয়ে ব্যস্ত বুঝতে পারি না। আমি শুধু নাটক দেখতে এসেছি। নাটকের বিষয় ডাইনোসরের উৎপত্তি, বিকাশ আর বাসস্থান। স্ক্রিপ্ট আমার লেখা। ভেবেছিলাম

এদেরকে স্ক্রিপ্ট দেব না। কিন্তু নির্দেশক হরতেশ চৌধরীর অনুরোধ ফেলতে পারিনি। এমনিতে ও প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্টের কনভেনর এবং খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। ইউনিভার্সিটিতে এম এ করার সময় থিয়েটারে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সূত্রে ওর সঙ্গে পরিচয়। ও-ই আমাকে থিয়েটারের নেশা ধরিয়েছেন। তারপর আমি আর থিয়েটার থেকে আলাদা হতে পারিনি। এভাবেই সিনেমা জগতের সঙ্গেও জুড়ে যাই।

দত্তা সাহেবের ভাষণ কানে আসছে। তিনি নিজস্ব সিরিয়াল 'মর্যাদা পুরুষোত্তম'-এর বাহানায় সরকারের প্রসারণ নীতির প্রশংসা করছেন। 'মর্যাদা পুরুষোত্তম'-এর স্ক্রিপ্ট লেখার অফার আমিও পেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া দিই নি। আসলে কোন পৌরাণিক বিষয় নিয়ে আমি কাজ করতে চাই না। আমার মতে এই ধর্মশাস্ত্র নির্ভরতা আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। আমার প্রিয় বিষয় ভবিষ্যৎ। আমি ভবিষ্যৎকে অতীতে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে। কোন ঋষি, পরমাসুন্দরী কোন কন্যার দিকে কামদৃষ্টিতে তাকালেই সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে,...কোন দেবতা বা তাঁর দূত আকাশে তীর মেরে বর্ষা নামিয়ে আনে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হুলুস্থূলু অথচ আমি পৃথিবীকে স্থির দেখি— এইসব বর্ণনে হাসি পায়। অন্ধবিশ্বাসী লোকদের ঘৃণা করি।

আমি প্রোফেসর যশপাল শর্মাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের ক্লোন অনুসন্ধানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনিই প্রথম আমাকে ক্লোনিং-এর পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন। নিজের গবেষণাগারে শুয়োরের ক্লোন তৈরীর সময় এবং শুয়োরের ডেভেলাপমেন্টের সময় আমাকে সঙ্গে রেখেছেন। প্রাণী চাষের এই গবেষণায় দারুণ খুশী ও অবাক হই। সুন্দর একটা প্রাণী থেকে যত খুশী প্রাণী বানিয়ে নাও। হুবহু!

শুরুতে এ নিয়ে নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু আর প্লটের বিস্তার আমাকে দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে নেয়। 'আনবর্ণ চাইল্ড' তৈরী হতেই সারাদেশে হৈ হৈ শুরু। এমনকি বিদেশেও 'আনবর্ণ চাইল্ড' জনপ্রিয় হওয়ায় এই ফিল্ম আমাকে উৎকৃষ্ট স্ক্রিপ্ট লেখক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়।

প্রোফেসর যশপাল শর্মা যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, জোশী সাহেব ও তাঁদের সরকার ওকে পছন্দ করে না। সরকারের পারমাণবিক বিস্ফোরণে সহমত না হওয়ায় এই মনোমালিন্যের সূত্রপাত। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি। এখন ডাইনোসর নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ হবে, এর স্ক্রিপ্ট আমি ওর সাহায্য নিয়ে লিখেছি। যেদিন তিনি একটি মৃত মশার রক্ত থেকে ডাইনোসরের ডি এন এ আলাদা করে এক অভিনব গবেষণা শুরু করেন, এই প্রাগৈতিহাসিক জীব নিয়ে আজকের প্রেক্ষিতে নাটক লেখার আইডিয়াও সেদিনই আমার মাথায় ঢোকে।

দত্তা সাহেবের ভাষণ শেষ হওয়ার পর তিনিই সবাইকে বাইরের যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান। যজ্ঞের কথা শুনে আমি থ। এদের কি মাথা খারাপ? সবাই উঠে গিয়ে ওপেন এয়ার থিয়েটারের সিঁড়িতে বসেন। মন্ত্রীজীর পুরো পরিবার, চিত্রতারকা ও উদ্যোক্তারা গিয়ে মঞ্চে বসেন। শ্রীমতী দত্তা ও অন্য মহিলারা যজ্ঞভূমি তৈরী করতে ব্যস্ত। মহিলারা চিত্রতারকাদের মতনই সেজেগুজে এসেছেন। দু'জন মহিলা পুরোহিতকে নানা যজ্ঞসামগ্রী এগিয়ে দিচ্ছেন। পুরোহিত সবাইকে মন্ত্র উচ্চারণ করায়। শ্রীমতী দত্তা মন্ত্রীজীর সামনে ঘিয়ের পাত্র এগিয়ে দেন। তিনি চামচ দিয়ে ঘি ঢালেন। আগুন লকলকিয়ে ওঠে। তারপর কুন্ডলীকৃত ধোঁয়া চারপাশে ছড়িয়ে ক্রমে চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আমার চোখে জল চলে আসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসি।

কিন্তু পুরোহিতের ইশারায় দত্তা সাহেবের পি এ আমাকে আবার যজ্ঞকুন্ডের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে কেউ আহুতি দেয়, কেউবা ঘি ঢালে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশে কেবল পুরোহিতের মন্ত্র

আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী সম্মিলিত নারীপুরুষের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ আমার মাথায় ঝনঝন করে বাজতে থাকে। আমার আবার দমবন্ধ হয়ে আসে।

ওদিকে বেচারা নির্দেশক হরতেশ চৌধরী অধীর অপেক্ষায়। আমার বেশী চিন্তা অভিনেতাদের জন্যে। ওরা মেকআপ করে পর্দার পেছনে ছটফট করছে। প্রেক্ষাগৃহ থেকে শিল্পীদের হৈ-হল্লার আওয়াজ ভেসে এলে দত্তা সাহেবের স্ত্রী আরো জোরে মন্ত্র পড়তে থাকেন। চৌধরী সাহেব কখনো আমার দিকে আবার কখনো ওদের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকান। আমার সামনে শাবানা বসে আছে। মাঝেমধ্যে আমার দৃষ্টি ওর পিঠে গিয়ে ঠেকে। কিন্তু তখুনি চোখ সরিয়ে নিই। মনে হয়, ওর পিঠেও চোখ গজিয়েছে। এরকম চোখকে আমি ভয় পাই। এমনিতে আমি আর শাবানা অবশ্য আলাদা-আলাদা নই।

যজ্ঞানুষ্ঠান এখন শেষের দিকে। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ এখন উচ্চগ্রামে। জোশীজী ধ্যানমগ্ন। বাকী জনতাও মন্ত্রে নিমগ্ন। চৌধরী, শাবানা, শিল্পীবৃন্দ ও আমি অস্থির অপেক্ষায়। আমি শাবানার পিঠে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করতে চাই। কিন্তু ওর পিঠে গজানো চোখ.....!

প্রোফেসর যশপাল শর্মার কথা মনে পড়ে। যখনই ওর কাছে যাই তিনি ভারতীয়দের প্রস্তর-যুগীয় মানসিকতা নিয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেন। ওর এই দুশ্চিন্তা তো আর অমূলক নয়। একদিকে ক্লোন গবেষণা চলছে আর অন্যদিকে......!

পুরোহিত শেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করলে শ্রীমতী দত্তা ও অন্য সহযোগিনীরা পুষ্পবৃষ্টি করেন। মন্ত্রীজীই যেন দেবতা, ওর উপরেই যত পাপড়ি বর্ষণ! পুরোহিতমশাই ধর্মের সংকট নিয়ে ভাষণ দেন। এরপর মন্ত্রীর পালা। মন্ত্রীর ভাষণ ভীষণ আবেগমথিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস, এ দেশের সংস্কৃতিকে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা বিস্মৃতপ্রায় করে তোলায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। ওর মতে এদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বহিরাগতদের সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে বেশী গবেষণা হয়েছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এখন আর এই বেদ আর উপনিষদসমূহের পুণ্যভূমিতে অন্য সমস্ত আবর্জনার প্রচার হতে দেবেন না। শ্রোতারা হাততালি দিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানায়। জয়জয়কার শুরু হয়ে যায়। এতক্ষণে দত্তাসাহেব সবাইকে আবার প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

দর্শকরা গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। সুযোগ পেতেই হরতেশ চৌধরী শিল্পীদের নির্দেশ দিতে শুরু করেন। মন্ত্রীজী, অন্য আমলাবৃন্দ ও সিনেমাস্টাররা ওদের জন্যে নির্ধারিত বিশেষ চেয়ারে বসে পড়েন। সশস্ত্র কমান্ডোরা দুপাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। তখন প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতের ধুন শুরু হয়। পর্দা ওঠে। মঞ্চের এককোণায় লাইটের ফোকাস হয়। নাটকের প্রধান চরিত্র 'ভি রেক্স' দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ও গর্জন করে। চৌধরী সাহেব ডলফিন, কচ্ছপ আর হাঁসের ডাকের আওযাজ মিশিয়ে এই অদ্ভুত কল্পিত ডাইনোসরের আওয়াজ তৈরী করেছেন। এই গর্জনে কিম্ভূতদর্শন ভয়ানক ডাইনোসরের উপস্থিতি দর্শকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। দেখতে দেখতে বিশাল মঞ্চে আরো ডাইনোসর আসে। দাপাদাপি শুরু হয়। মুহূর্তে মঞ্চে এক প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসলীলা মূর্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দৃশ্যটি ফেড আউট হয়ে যায়। অন্ধকারে শুধু বিকট সব আওয়াজ চলতে থাকে। দর্শকরা সিঁটিয়ে জড়সড় হয়ে থাকে।

এবার ফ্ল্যাশ-ব্যাক প্রক্রিয়ায় গল্প শুরু হয়। পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগের ইতিহাস। হরতেশ চৌধরী বাস্তবিকই দারুণ নির্দেশক। জ্ঞানের বিষয় নিয়ে তৈরী এহেন নাটককে এত সুন্দর ও রোমহর্ষকভাবে পরিবেশন করা চাট্টিখানি কথা নয়। অথচ তিনি বেশ মুন্সিয়ানা সহ দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রাখেন। দৃশ্যের পর দৃশ্য এগিয়ে যায়। মন্ত্রীজী আমার কাছেই বসে আছেন। শাবানা আমার ঠিক সামনে। ওর খোলা পিঠের দিকে তাকাতেই আমি ওর পিঠে নির্গত চোখ দেখতে পাই।

ঐ চোখ দিয়ে ও পেছনের সবাইকে দেখছে। বিশেষ করে মন্ত্রীজীকে দেখছে। নাটক দেখায় মন্ত্রীজীর তেমন রুচি নেই। প্রতি মুহূর্তেই ওর মুখভঙ্গী পাল্টাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। মাঝেমধ্যেই চেহারায় ক্রোধের রেখা ফুটে উঠছে। আমি নাটকের একটা দৃশ্যও মিস্ করতে চাই না। কিন্তু শাবানার পৃষ্ঠচক্ষু লাগাতার আমার নজর কেড়ে নিচ্ছে।

দত্তসাহেব এবং শ্রীমতী দত্তও নাটকে মন দিতে পারছেন না। এই দম্পতি কেবল মন্ত্রীর খোশামোদে ব্যস্ত। মন্ত্রীজী হাই তোলেন। ওর খোলা মুখে আমি সুদর্শন চক্র হাতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই। ওর জিহ্বায় যজ্ঞকুন্ড। যজ্ঞকুন্ডে আহুতি চড়ানো হচ্ছে। মন্ত্রীজী ঢেকুর তোলেন। তারপর চোখ বন্ধ করেন। ঢেকুরের বিশাল আওয়াজে অনেকেই ওর দিকে ঘুরে তাকায়। কেউ কেউ হেসে ফেলে। মন্ত্রীজী আরো বিরক্ত হন।

এ আমার কী হলো? আমার চোখের রঙ ঠিক আছে তো? কিছুই বুঝতে পারছি না। সব উল্টোপাল্টা দেখছি কেন? আমি তো কোনরকম অলৌকিক কর্মকান্ডে বিশ্বাসী নই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং নিজেকে কেবল বিজ্ঞানেরই সেবক ভাবি।

স্টেজে তখন আমিশাষী ও নিরামিশাষী ডাইনোসরের মধ্যে তুমুল লড়াই। নিরামিশাষী অপেক্ষাকৃত দুর্বল। দেখতে দেখতে লড়াই একপেশে হয়ে পড়লে নিরামিশাষী এক কোণে দাঁড়িয়ে কেবল প্রতিরক্ষা করতে থাকে। মন্ত্রীজীর দিকে তাকাই। তিনি বিরক্ত হয়ে সোফায় একটা ঘুষি মারেন। ওর চোখ লাল। মুখ ক্রমে বনমানুষের মত হয়ে উঠছে। জোরে হাই তুলছেন। শ্রীমতী দত্ত নিজেই উঠে গিয়ে ওর জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে আসেন। মন্ত্রীজী চো চো করে গ্লাস খালি করে দেন। আমার মনে হয় তিনি গণ্ডূষ ভরে সমুদ্র পান করে নেবেন। এভাবেই দেখতে দেখতে সামনের পৃথিবী মরুভূমি হয়ে পড়বে।

মন্ত্রীজী হাই-এর পর হাই তোলেন। চোখ লাল। মাছির ডানার মতন ওর গোঁফ জোড়া উপর-নীচে হচ্ছে। দত্তসাহেব ও অন্য কর্মকর্তারা চিন্তিত। ওদের মুখ কাঁচুমাচু। মন্ত্রীজী আবার হাই তোলেন। আমি আবার ওর জিহ্বায় অগ্নিকুন্ড দেখতে পাই। এ আমার কী হলো? কেবল উল্টোপাল্টা দেখছি কেন? আমার মনে হয় আহুতি পেয়ে ওর জিহ্বায় আগুন লকলকিয়ে উঠবে, ক্রমে মন্ত্রীর আকার ধারণ করবে। এসব কী দেখছি? আমি দুহাতে চোখ রগড়াই।

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? অথবা সত্যি সত্যি মন্ত্রীজী কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী? এখন তিনি আকাশে উড়ছেন। এক হাতে পাহাড় উঠিয়ে অন্যহাতে আকাশের তারা পেড়ে আনছেন। তারপর প্রতিবেশীর গ্রামে পাহাড়টাকে ফেলেন। বিস্ফোরণ হয়, বোমা বিস্ফোরণ। কাতারে কাতারে মানুষ মরে। সারি সারি লাশ দেখে মানুষ হাহাকার করে। দেখতে দেখতে লাশগুলির উপর শক্তিপীঠ তৈরী হয়। অনেক লোক ইজের প্যান্ট পরে মাথায় তিলক কেটে শক্তিপ্রদর্শনকে প্রণাম জানাতে ছুটতে থাকে।

এখন পঁয়তাল্লিশ টন ওজনের ডাইনোসর, নাটকের মুখ্য চরিত্র 'টি রেক্স' বড়সড় টিকটিকি আকারের একটি নিরামিশাষী ডাইনোসরকে টেনে হিঁচড়ে স্টেজে তুলছে। নিরামিশাষী ডাইনোসবটি অনেকটা হাতজোড় করার ভঙ্গীতে কাকুতি মিনতি করছে। নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু 'টি রেক্স' বিশাল হা করে বড়সড় টিকটিকি আকারের ডাইনোসরটার মাথাটা মুখে পুরে নেয়। তখনই অন্য ডাইনোসররাও ঝাপিয়ে পড়ে। ওদের লম্ফঝম্পে পুরো প্রেক্ষাগৃহে আতঙ্ক ছড়ায়। দর্শকরা ভয়ে কাঁপে।

শাবানার পিঠে আলোর চমক দেখে অবাক হই। মন্ত্রীর দিকে তাকাই। মন্ত্রীজী হাই তোলেন। বাইরের যজ্ঞকুন্ড থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়ার প্রভাবে হলের অন্ধকার আরো বেড়ে গেছে। বাতাস ভারী, চোখ জ্বালা করছে। দর্শকরা কেমন করে বসে আছে? ওদের নিশ্চয়ই নাটকটা দারুণ

লাগছে। একটু পরেই এরা সবাই দমবন্ধ হয়ে প্রদূষণে মারা যাবে।

অবশ্য আমি ভাবলেই যে এরকম হবে তার কোন মানে নেই। দর্শকরা তো বেশ আরামেই বসে রয়েছে। ওদের কবে জ্ঞান হবে, বুদ্ধি হবে? মন্ত্রীজী আবার হাই তুললে আমি আবার যজ্ঞকুন্ড দেখি। সেখানেও ঘৃতাহুতি চলছে। আগুন থেকে থেকে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে। অগ্নিকুন্ড থেকে খানদানশাস্ত্র ও সূর্যশাস্ত্র বেরিয়ে আসে। লঙ্কাদাহন সম্পূর্ণ প্রায়। এবার অগ্নিকুন্ড থেকে ডাইনোসর বেরুতে শুরু করে। 'ভি রেক্স' আর ওর সঙ্গী। টিনোসরাস, রিনোসরাসরা এক এক করে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে হরতেশ চৌধুরীকে দেখা যায় না। মন্ত্রীজীর হা আরো বড় হয়ে যায়। তার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা অনেক মানুষ আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

ইজের পরা লোকেরা কপালে তিলক কেটে শক্তিপীঠের দিকে যাচ্ছে। সবাই ছুটছে। শাবানা এবং হরতেশকেও এখন অন্য শিল্পীদের সঙ্গে ঐ হা-এর মধ্যে ছটফট করতে দেখি। ওদেরকে ডাইনোসররা পিষে ফেলছে। তারপর সব অন্ধকার। পৃথিবী রক্তাক্ত। আমার দিকে আগুনের গোলা ধেয়ে আসছে। আমাকে কে বাঁচাবে? অগ্নিকুন্ড থেকে আরো অনেক শাস্ত্র বেরিয়ে আসতে থাকে।

রচনাকাল: ১৯৯৯

দেশরাজ কালী

টিকটিকি

ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে আছি। বাবা হুক্কা খাচ্ছেন। আমার হাতে তুলি। ক্যানভাসের বিন্দুটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। রাতের সমস্ত উত্তেজনা তেমনি রয়ে গেছে। বউ-এর পারদ এখনও নামেনি। ক্যানভাসে এখন শুধু বিন্দু। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। অনেকদিন কিছুই খাননি। এখন নাভিশ্বাস উঠছে। থেকে থেকে জ্ঞান ফিরছে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। এখন শিবের প্রতীক্ষা। শিব আমার ছোট ভাই।

শিব যখন এসেছিল, বাবার হুঁশ ছিল। এখন নাভিশ্বাস উঠছে। আমার মাথা ঘোরায়। না জানি কখন কী হয়! ক্যানভাসের বিন্দু এখন মাংসপিণ্ড হয়ে পড়েছে। আমি মাংসে হাত ফেরাই। কখনো পেন্সিল দিয়ে নম্বর লিখি। দুই-তিনবার নম্বর পাল্টাই, কখনো আটাশ, কখনো ত্রিশ, কখনো বত্রিশ।

শিব বাবার মুখে চামচ দিয়ে জল দেয়। ..... আমার পিপাসা পায়..... ক্যানভাসের বিন্দু স্থির। আকাশভরা কালো রঙ।

আমার মাথা ঘোরায়। ..... বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। ছোট ছোট হাতের গন্ধ পাই। আমার বউ বাবার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মুখের ভঙ্গী দেখেই ওর মনের ভাব বোঝা যায়। ও বাবার হুঁকোর দিকে তেরছা চোখে তাকায়। আমি তুলি দিয়ে ক্যানভাসে কিছু আঁকার চেষ্টা করি।...... ভাল করে দেখি, আমি বাবার ছবি আঁকছিলাম........ ঠিক ঐরকম খাটে শুয়ে আছেন। চেহারা একদম ভারশূন্য, কোন ইচ্ছা নেই, কোন উত্তেজনা নেই....... কিন্তু হুক্কাটা গায়েব।

আমি আরো ভাল করে দেখি — একদম ফাঁকা। আমার ভ্রম? আমি আঁকার কথা ভাবছিলাম, এখনো আঁকিনি, এখন আঁকবো। আমি বউকে নিয়ে বেশী ভাবি না কেন? আকাশটা কালো দেখি কেন?

আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে অথবা বউ মরে যাক... অথবা আমাদের একটা ছেলে হোক যাকে ও খাওয়াতে থাকবে। ব্যস, আর কিছুই না হোক। শুধু মৃত্যু হোক। অথবা দু'জনেই মরে যাই। অথবা বাবার এমন ছবি বানাই যা থেকে হুক্কা গায়েব হয়ে যাবে। তখন বউ-এর খুব ভাল লাগবে। ও আমাকে ভালবাসবে। ঐ ছবিটা আমাকে বানাতেই হবে।

ক্যানভাসে মাংসপিণ্ড আর মাংসপিণ্ড আর কেবল মাংসপিণ্ড ঝুলতে শুরু করে। প্রত্যেকেই যেন বাঁদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। ভয়ঙ্কর চেহারা। ওদের মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। আমি নিজের

হাত ঐরকমই একটা মুখে সঁপে দিই। বাবা ছবি আঁকা ভালবাসেন, তবে ছবি যদি বোঝা যায়। নাহলে 'এ আর কী!' বলে নিন্দা করে দেন। বউও আমার ছবি ভালবাসে, তবে যেসব ছবি বুঝতে কারো মাথা ঘামাতে হয়।

বাবা বলেন, দেখে আপনাআপ মুখ দিয়ে 'বাহ্' বেরিয়ে আসা উচিত! .... বউ বলে, লোকে ছবিটা নিয়ে ভাবুক, বেশ কিছুদিন ধরে ভাবুক।..... আমি দু'জনের মাঝখানে। ..... বাবা আমাকে শোকগ্রস্ত করেন, বউকে শোকহেতু পেয়েছি।

গ্রামের জাটেরা বাবার সঙ্গে দেখা করে না। ওরা বলে বাবা নাকি জাটের নামে কলঙ্ক। ওর চিন্তাভাবনা ভাল না লাগলে হয়তো আমিও দেখা করতাম না। ওরা দেখতে এলে বাবা কি খুশী হতেন? তিনি বলেন, ওরা এলে আসবে, না এলে না আসবে, আমার যা ইচ্ছে করে করবো। বাবা কমিউনিষ্ট। ওর রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার কারণেও অনেক গ্রামবাসী বেশ অসন্তুষ্ট।

বাবা যখন মজুরদের হয়ে কথা বলেন, ওদের ন্যায্য পাওনার কথা বলেন তখন আমার ভাল লাগে। কিন্তু বাবা যখন কাউকে বলেন যে, আমার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখি মজুরদের বাসন আলাদা, ওরা রুটি খেয়ে ধুয়ে নিজের হাতে তাকে রেখে যায়। তাই দেখে মামার বাড়ির সবাইকে বকি। বলি যে এরকম প্রথা কত অন্যায়, সেই থেকে আমি মজুরদের পক্ষে হয়ে যাই!..... বাবা বারবার ঐকথা অনেককে শোনায়, তখন ওর চোখগুলি জাটদের মতন দেখতে লাগে! আমার তখন ওকে ভাল লাগে না।

আমাদের বিয়ে কোর্টে হয়েছে। বউ আমাদেরই স্বজাতীয়। ও আগে আমার ছবির খুব প্রশংসা করতো। এখন ওগুলিকে শুধরানোর পরামর্শ দেয়। উৎপটাং ছবি আঁকতে বলে, যা নিয়ে দর্শক শুধু ভাবতে থাকবে। বাবার স্বভাব ঠিক এর বিপরীত। আমি ক্যানভাসে বাবার ছবি আঁকি। রাতের একাকীত্ব গ্রাস করতে শুরু করে। আমি ছবিটায় জলের ছিটে মারি .... তুলি নিয়ে কিছু দাগ টেনে দিই।

শ্বশুরমশাই দেখা করতে আসেন। শহরে গিয়ে থাকার জন্যে বলেন। বউ -এরও একই ইচ্ছে। কিন্তু আমার গ্রামে থেকেই ছবি আঁকার ইচ্ছে। আমাকে দিয়ে ছবি আঁকাতে হলে গ্রামেই থাকতে হবে।' ছবি নিয়ে বউ-এর সঙ্গে তর্ক হয়ে যায়। তর্ক করতে করতে আমরা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যাই। ও আমার বাবার বিরুদ্ধে বলে। তুলিতে গাঢ় রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকলে ও রেগে যায়। আমি মাথা নীচু করি। ছবি ঝাপসা লাগে। কখনো কখনো রঙকানা হয়ে যাই। নিজের লাগানো রঙগুলি আর দেখতে পাই না। ছবি চুলোয় যাক। আমি বউকে জড়িয়ে চুমু খাই।

বাবাকে নিয়ে কথা হলে বউ বলে, ওর কথা বলার ঢঙ আমার ভাল লাগে না, ঐসব কথা আমাদের বেদশাস্ত্র অনুযায়ী অশ্লীল। তারপর ও মহাভারত থেকে উদাহরণ দেয়। .... রাজা পাণ্ডু রাণী মাদ্রীর সঙ্গে মনোহর তপোবনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কামুক হয়ে ওঠেন। মাদ্রীর সৌন্দর্যে অভিভূত পাণ্ডু সংযম হারিয়ে ঋষির অভিশাপ ভুলে জোর করে ইচ্ছাপূরণ করতে যান। অভিশাপের কথা ভেবে মাদ্রী কাঁপতে থাকেন। বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাণ্ডুর প্রবল ইচ্ছার জোয়ারে ওর সমস্ত আপত্তি খড়কুটোর মতন ভেসে যায় আর পাণ্ডু যৌন সংগম করতে গিয়ে মারা যান। এই দেখে মাদ্রী পাণ্ডুকে জড়িয়ে বিলাপ করতে শুরু করেন। কান্নার আওয়াজ শুনে কুন্তী আর ওদের পাঁচ ছেলে ওখানে চলে আসে। দূর থেকে ওদের দেখে মাদ্রী বলেন, দিদি তুমি ছেলেদের ওখানে রেখে একা এসো.........

ঐ "একা" শব্দটায় জোর দিয়ে আমার বউ যেন নিজের কথাকে ঠিক প্রমাণিত করতে চায়। এরকম করলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমি তুলি দিয়ে উল্টোপাল্টা আঁকতে শুরু করি। বউ আমার উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। আমার ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যায় । অনেক অসম্পূর্ণ।

রাতেও বাবা প্রসঙ্গে উত্তেজনার শুরু। আমার শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয় দেখা করতে এসেছিল। বাবা ওর সঙ্গে গল্প করছিলেন। গল্পে গল্পে বাবা নিজের পালোয়ান মামার কথা শোনাতেই আমার বউ-এর মেজাজ খিঁচরে যায়।

পালোয়ান মামা এলাকার নামকরা পালোয়ান ছিলেন। নাম মহাবীর। একবার কোথাও ও কুস্তি লড়তে গিয়ে গ্রামের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কাপড় খুলতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত কাপড় খুলে ধুমধুমা ল্যাংটা হয়ে পড়েন। তারপর ল্যাঙ্গট কষে বেঁধে কুস্তির মাঠে এসে উরুতে থাপ্পড় মারেন।

আমরা এই গল্প কয়েকবার শুনেছি। রাতে বাবা আবার গল্পটা শোনালে বউ রেগে যায়। — আমার শ্বশুর সম্পর্কে ও কী ভাবলো! ক্রোধে ওর চোখ বড় বড় বয়ে যায়।

আমার মহাবীরের ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে। কখনো ইচ্ছে করে বাবার ছবি আঁকতে, সঙ্গে মহাবীরও থাকবে।....... কখনও ভাবি মহাবীরের ঐ আখড়ার ছবি আঁকি, সঙ্গে প্রেক্ষাপটে গোপিনীদের আঁকি....... নীচে লিখে দেব — কুদরৎ কবন কহাঁ বিচারু! বাবা খুশী হয়ে পড়বে। আমি তুলি নিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকতে শুরু করি।

চোখে অনেক চেহারা ভাসে। অনেক রঙ। তুলি নাচতে শুরু করে। আগে পৃথিবী আঁকি। সম্পূর্ণ পৃথিবী নদী-পাহাড়-অরণ্য-সমুদ্র-শামুক-ঝিনুক সব কিছু! অনেক গাড়ি। হাল্কা রঙে তার মধ্যে বাবাকে আঁকি .... হাল্কা..... হুক্কা খাচ্ছেন...... চোখে রয়েছে বিশালত্ব।

ছবিটাকে যখন অন্তিম ছোঁয়া দিচ্ছি তখনই বউ ভেতর থেকে আওয়াজ করে ডাকে। একাগ্রতা নষ্ট হয়। আমি ভেতরে যাই। তাকে রাখা হীর-রাঞ্ঝার যুগল ছবিটি ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। ও সেটাকে ঝাড়পোছ করছিল। এই ছবিটা অনেক বছর পুরনো। আমি ওটা অনেক একাগ্র হয়ে বানিয়েছিলাম। তখন থেকেই ওটা সামনের তাকে রাখা ছিল। বিয়ের আগের একটি স্মৃতি এসময় আমার মনে পড়ে।

..... এই ছবিটার পেছনে রোজ একটি টিকটিকি লুকিয়ে থাকতো। আমি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতাম। ঘরের দরজা খুলতেই দেখতে পেতাম আমার বিছানায় রাখা বালিশের উপর টিকটিকিটি বসে রয়েছে। নিশ্চয়ই ও আরাম করতো আর দরজার শব্দে ও মাথা উঁচিয়ে দেখতো। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও দ্রুত গিয়ে ছবিটার পেছনে লুকিয়ে পড়তো। আমি কখনো ঐ টিকটিকিকে পোকা খেতে দেখিনি। তারপর ওর সঙ্গে একটা ছোট্ট বাচ্চা আসতে শুরু করে।

বিয়ের পর আমার বউ পুরো কামরাটাকেই পাল্টে দেয়। ঐ খাটের জায়গায় এখন ডবলবেড। পুরনো বালিশটা বাবার ঘরে চলে গেছে। বাবার বালিশে হেলান দেওয়ার দরকার ছিল। সব পরিষ্কার করার সময় এই ছবিটার পেছন থেকে আমি নিজে টিকটিকির ডিমের খোসা বাইরে ফেলে দিই। বউ-এর সে কী ঘেন্না! ও আমাকে ঝাড়ুর উপর ডিমের খোসা রেখে বাইরে ফেলতে বলে। কিন্তু আমি হাত দিয়েই তুলে ফেলেছি।

বউ-এর কথা না ভেবে আমি আবার ছবি আঁকতে শুরু করি। এখন ছবিটা পুরো হয়ে গেছে। আমি সম্পূর্ণ বর্তমান। ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখি। বউ ওপাশে দাঁড়িয়ে দেখে। ছবিটায় প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, বাবার ছায়া রয়েছে যেন অর্ধনগ্ন ...... ঘোর তপস্বী ..... যেন কোন ঋষি....... অথবা মহাবীর..... কিন্তু হুঁকো উধাও। আর গাঢ় রঙে টিকটিটি আঁকা। ছবিটা দেখছি। বউও দেখছে। আমি শান্ত। যা চেয়েছি তাই হয়েছে। আমি স্থির দাঁড়িয়ে থাকি। বউ বলে, ছবিটা তো দা-রু-ণ হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে টিকটিকির কী ভূমিকা?

রচনাকাল: ১৯৯৫

লেখক পরিচিতি

যশবন্ত সিং কঁবল : পাঞ্জাবের মোগা জেলার ঢুডীকে গ্রামে ১৯১৯ সালে জন্ম। এই সংকলনের জ্যেষ্ঠতম লেখক। সাতাশটি উপন্যাস ও তেরটি গল্প সংগ্রহের জনক। পাঞ্জাবী সাহিত্য আকাদেমী, ভাষা বিভাগ পাঞ্জাব এবং ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত। অনূদিত গল্পটি বহুচর্চিত। কখনো বহুনিন্দিত। যোগাযোগ : Vill. + P. O Dhudike, Dist : Moga, Punjab-142053.

রামসরূপ আণখী : জন্ম : ১৯৩২। আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের আঙ্গিনায় এক সুপরিচিত নাম। বর্তমানে পাঞ্জাবের বার্ণালার অধিবাসী। বিশিষ্ট ভাষা, প্রখর যুক্তি এবং শব্দ গঠনের নৈপুণ্যের জন্য শুরু থেকে তিনি স্বতন্ত্র। মানুষের জীবনের চার পাশে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কাহিনীগুলো জীবন্তরূপ পায় তাঁর সাহিত্য কর্মে। তাঁর বহু গল্প পরবর্তীকালে সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই মননশীল সাহিত্যিকের প্রকাশিত মোট গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশ। সাহিত্য কর্মের জন্য ভূষিত হয়েছেন বহু পুরস্কারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাই বীর সিং গালাপ পুরস্কার (১৯৮৫), ভারতীয় ভাষা পরিষদ, কলকাতা (১৯৯২), ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৭) ইত্যাদি। প্রকাশিত গল্পটি তাঁর অন্যতম ছোট গল্প 'হাড্ডিয়া'-র অনুবাদ। Gali No. II, K. C. Road, Barnala, Dist. : Sangrur, Punjab.

গুরদিয়াল সিংহ : ফরিদকোট জেলার জাইতো গ্রামে ১৯৩৩ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। নয়টি উপন্যাস, দশটি ছোট গল্প সংকলন, একটি সম্পূর্ণ নাটক ও একটি একাংক নাটক সংকলনের জনক এই লেখকের পঞ্চাশেরও বেশি গল্প ও গদ্য নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলবোর্ডের দ্বারা বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৫ সালে নানকসিংহ পুরস্কার ও ভারতীয় সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার, ১৯৭৯ ও ১৯৮৯ সালে দু'বার পাঞ্জাব সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার, ১৯৯২ সালে গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাই বীর সিংহ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। 4/54, Jaitu-151202, Faridkot, Punjab.

অমৃতা প্রীতম : জন্ম ১৯২৩ সালে। আঠেরটি কবিতা সংকলন, নটি নির্বাচিত কবিতা সংকলন পাঞ্জাবীতে প্রকাশিত। এছাড়া হিন্দি, উর্দু, গুজরাতি, মারাঠি, কন্নড়, মালয়ালম, ইংরেজি, রাশিয়ান, আলবেনিয়ান, পোলিশ, বুলগেরিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষায় ওর কবিতা সংকলন প্রকাশিত। একত্রিশটি উপন্যাস পাঞ্জাবীতে প্রকাশিত এবং সবকটিই বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত। ছত্রিশটি গল্প সংকলন পাঞ্জাবীতে প্রকাশিত, এছাড়া চৌত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। তিনটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত। বিরাশি সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। যোগাযোগ : Nagmani Publishers : Ok-25, ROSE KHAS, New Delhi- 110016.

কর্তার সিংহ দুগ্গল : জন্ম : ১৯১৯ সালে। আধুনিক পাঞ্জাবী ছোটগল্পের জনক সন্তসিংহ সেঁখোর পরই যার নাম উচ্চারিত হয় তিনি কর্তার সিংহ দুগ্গল। প্রকৃত যথার্থবাদী গদ্যকার। সামগ্রিক পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট রূপকার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগির ফলে পাঞ্জাবী জনমানসে যে দ্বেষ হিংসার সৃষ্টি হয়েছিল তার নির্মূলীকরণে তাঁর কর্মকাণ্ড এবং সাহিত্যরচনা এক অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তার গল্পে পাঞ্জাবের মাটি ও মানুষের সঘন সুন্দর রূপ নতুনভাবে ফুটে

উঠেছে। রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হিসেবে কাজ করার ফাঁকে তার গল্পচর্চা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যোগাযোগ :

সন্তোখ সিংহ ধীর : জন্ম ১৯২৩। ১৯৪০ সাল থেকেই কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে আবির্ভাব। পাঞ্জাবী ও উর্দুতে সমানভাবে কবিতা ও গদ্য লেখেন। চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ, ছয়টি গল্পগ্রন্থ, ছয়টি উপন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরো নয়টি পুস্তকের প্রণেতা। ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী, পাঞ্জাবী সাহিত্য অকাদেমী সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। পাকিস্তানেও সমান জনপ্রিয়। যোগাযোগ : 689, Phase- 10, SAS Nagar (Mohali), Dist. Ropar, Punjub. 160059।

প্রেম প্রকাশ : হিন্দী ও উর্দু ভাষার জনপ্রিয় লেখক ১৯৩২ সালের ২৬শে মার্চ পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার খান্নায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে গুরুমুখীতে জ্ঞানী পাশ করে জলন্ধর জেলার রণধাওয়া মাসন্দর গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে উর্দুতে এম এ পাশ করেন। দীর্ঘ একুশ বছর 'পঞ্জাব কেশরী'র উর্দু সংস্করণ 'হিন্দ সমাচার'র সহসম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার (১৯৯২) ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট পুরস্কার লাভ করেন। 593 Mota Sing Nagar, Jalandhar, Punjab-144001.

বরিয়ম সিংহ সন্ধু : পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ, এম ফিল, পি এইচ ডি। লায়লপুর খালসা কলেজ, জলন্ধরে অধ্যাপনা করেন। পাঁচটি গল্প সংকলন, একটি সমালোচনাগ্রন্থ, একটি জীবনীগ্রন্থ ও সাহিত্য সংক্রান্ত গদ্যের একটি সংকলন, পাঞ্জাবীতে প্রকাশিত একটি গল্প সংকলন ও জীবনীগ্রন্থ, হিন্দীতে প্রকাশিত নয়টি গল্প বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল বোর্ডের নানা ক্লাশের পাঠ্যবই-এ অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী (২০০১) হীরা সিংহ দর্দ পুরস্কার (১৯৭৯), ভাইবীর সিংহ গল্প পুবস্কার (গুরুনানকদেব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০), পাঞ্জাবী সাহিত্য অকাদেমী পুবস্কাব (১৯৮০) ও আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। যোগাযোগ : 153, Golden Avenue, Phase-1, Garha, Jalandhar, Pin-144022, Phone (R)-0181-227441.

মোহন ভাণ্ডারী : ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ পাঞ্জাবের সংগ্রুর জেলার রণতৌরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী (২০০০) পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। পাঞ্জাবীতে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ছয়, হিন্দীতে অনুদিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা দুই। এছাড়া বারোটি ভারতীয় ভাষায়ও কয়েকটি গল্প অনুদিত হয়েছে। যোগাযোগ : 3248/1, Sector 44 D, Chandigarh - 160047/ Phone - 0172/613284

হরভজন বটালভী : জন্ম ২২ মার্চ, ১৯৪৩। এম এ (পাঞ্জাবী, হিন্দি ও ইংরেজি), এম এড, এম আই এস। পেশা ডাইরেক্টর, আকাশবাণী, জলন্ধর। তিনটি গল্প সংগ্রহ, তিনটি জীবনী গ্রন্থ ও একটি আত্মজীবনীর প্রণেতা। এছাড়া পাঁচটি উপন্যাস ইংরেজি ও হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছেন ও একটি জীবনী গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। যোগাযোগ : 297, Master Tara Singh Nagar, Jalandhar, Phone : 230264/235889.

গুরুবচন সিংহ ভুল্লর : জন্ম ১৮ মার্চ ১৯৩৭ ভাতিন্ডা জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চন্ডিগড় থেকে এম. এ। পাঞ্জাবীতে চারটি গল্প সংকলন, উর্দুতে একটি, পাঞ্জাবীতে দু'টি নির্বাচিত গল্প সংকলন, একটি কবিতা সংগ্রহ ছাড়াও একটি পাঞ্জাবী ছোটগল্পের সমালোচনা গ্রন্থ, দু'টি সচিত্র শিশুপাঠ্য কবিতার বই, তিনটি বয়স্কশিক্ষার উপযোগী বই (একটি হিন্দী ও দু'টি পাঞ্জাবীতে), অর্থনীতি ও রাজনীতির শব্দকোষ, দশজন বিখ্যাত পাঞ্জাবী লেখকের শব্দচিত্র তিনি লিখেছেন। প্রায়

পঁচিশটা গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছেন। কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটেল' সহ অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও শিশু সাহিত্যের উপর পঁচিশটা গ্রন্থ তিনি ইংরেজী থেকে পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও প্রায় ষাটটি গল্প সংকলনে ওর গল্প সংকলিত। 'খুন' নামক একটি গল্প 'কবতারা' নামে টেলিফিল্ম হয়েছে। ND-50, Vishakha Enclave. Delhi-34.

অজিত কৌর ঃ জন্ম ১৯৩৩ । ন'টি গল্প সংগ্রহ, তিনটি নভলেট রচনা করেছেন । আত্মকথার প্রথম ভাগ 'খানা বাদোষ' ১৯৬৬ সালের ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। আত্মকথার দ্বিতীয় ভাগ 'কোড়া কাগজ' ইদানীং প্রকাশিত। ভ্রমণকথা : কাচ্চে রঙ্গো দা শহর, লন্ডন । গবেষণাগ্রন্থ : "কুলবন্ত সিংহ ভির্ক" সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত এর বিভিন্ন গল্প ও নভলেট তিনটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, গুরু নানকদেব বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগ : C/o. Academy of Fine Arts & literature, 4/6 Siri Fort Institutional Area, opt. Khel Gaon Marg New Delhi-110049, Phone : 6498070, 6494444, Fax : 6496542

গুলজার সিংহ সন্ধু ঃ ১৯৩৬ সালে এক সমৃদ্ধ পাঞ্জাবী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও এই লেখকের কলম বরাবর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর মানবপ্রেম, মেধা ও মননের ত্রহ্যস্পর্শ ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী, পাঞ্জাবী সাহিত্য অকাদেমীসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। ইতিমধ্যে চারটি গল্প সংগ্রহ ও দুটি উপন্যাস ছাড়াও দুটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত। যোগাযোগ ঃ 1538. Sector 360, Chandigarh.

রাজিন্দর কৌর ঃ ইতিহাসে এম এ। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। এ যাবৎ এর লেখা আটটি গল্প সংকলন (এর মধ্যে দু'টো সংকলন শিশুপাঠ্য গল্পের) প্রকাশিত হয়েছে। এব প্রয়াত স্বামী কুলদীপ সিংহ বাগ্গাও পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু গল্প ও উপন্যাসের জনক। পাঞ্জাবী সাহিত্য অকাদেমী সহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত। H 350 Naraina Vihar, New Delhi-28.

জসবন্ত সিংহ ভিরদী ঃ হিন্দী ও পাঞ্জাবী কথা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক জসবন্ত সিংহ ভিরদী জলন্ধর শহরে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় রেলের কুলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে দিল্লী ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। চল্লিশটি নাটক, বারোটি গল্প সংগ্রহ, দু'টি প্রবন্ধ সংকলন ও ছয়টি উপন্যাসের রচয়িতা। একশোজন অগ্রণী ও সমসাময়িক পাঞ্জাবী লেখকের জীবনী, দশজন শিখ গুরু ও কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মায়ের জীবন এবং এই উপমহাদেশের সমস্ত প্রধান নদীর শব্দচিত্র তিনি লিখেছেন। পাঞ্জাবী সাহিত্য একাদেমীর কর্তার সিংহ ধালীওয়াল (১৯৯৪) পুরস্কার সহ এগারোটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার তিনি দু'টো উপন্যাস, দু'টো নাটক ও বিভিন্ন গল্প সংগ্রহের জন্যে পেয়েছেন। যোগাযোগ 96, Golden Avenue, Phase-I, Jalandhar. Punjab. Pin : 144001

দলীপ কৌর টিওয়ানা ঃ ১৯৩৫ সালে জন্ম । ছোটগল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন মিলিয়ে প্রায় পনেরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, উর্দু এমনকি কয়েকটি বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ইতিমধ্যে । ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পান ১৯৭২ সালে তাঁর উপন্যাস 'এহু হামারা জীবন'-এর জন্য । পাতিয়ালাস্থিত পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ডিন হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন । যোগাযোগ : B-13, Punjabi University Campus, Patiala-147002, Punjab, Ph. (0175)282239

গুরুমেল মডাহড় ঃ পাঞ্জাবের সাংগ্রুরে ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। দশটি গল্প সংগ্রহ, দুটি

উপন্যাস, দুটি ভ্রমণকাহিনী, দুটি জীবনীগ্রন্থ একটি কাব্য সংগ্রহ ছাড়াও বারোটি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। ওর গল্পের হিন্দী অনুবাদের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত। পেশা : সরকারী চাকরি। যোগাযোগ : B-4/91. Astabal. Patiala Gate, Sangrur, Punjib. Pin : 148101. Phone : 01672/32093.

জিন্দার : জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪। ইংরেজীতে এম. এ। ডিভিশনাল ম্যানেজার, পাঞ্জাব রোডওয়েজের জলন্ধর অফিসে অডিটর। এখন অব্দি পাঞ্জাবীতে তিনটি গল্প সংগ্রহ ও হিন্দীতে একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছু গল্প হিন্দী, গুজরাতি, উর্দু এবং ইংরেজীতে অনূদিত। 'তুসী নহীঁ সমঝ সকতে' সংকলনটি ১৯৯৬ সালের সর্বোত্তম পাঞ্জাবী গল্প সংগ্রহ রূপে 'গুরদেব সিংহ বিরহা' সম্মান পেয়েছে। যোগাযোগ : 984, Model House, Jalandhar-3 Punjab. Phone : 460585

অবতার সিংহ বিলিংগ : জন্ম ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫২ লুধিয়ানা জেলার সেহ্ গ্রামে। শিক্ষা এম এ (ইংরেজি) ও বি এড। পেশা লুধিয়ানা জেলার মানকি গ্রামে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত পুস্তক : তিনটি গল্প সংকলন, একটি উপন্যাস ছাড়া পাঞ্জাবী ভাষা বিভাগ প্রকাশিত ছোটদের জন্য গল্প সংকলন ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। Address : Vill. + P. O. Sch. Dist. Ludhiana (Punjab)

অমর গিরি : জন্ম : ১৯শে জুলাই ১৯৫৪। পেশা : পাঞ্জাব সরকার-এর শিক্ষা বিভাগ (স্কুল) এর সম্পাদক। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : ১. দুপহির আউটর দহিশত ২. মতাড়, ৩. পশু অন্দর পশু। এছাড়াও দশটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা। ঠিকানা : House No 1172 Sector-56. Chandigarh.

গীতা ডোগরা : জন্ম : ফিরোজপুরে ১৯৫৫ সালের ৮ই জানুয়ারী। শিক্ষা : বি এ সাহিত্যরত্ন, সার্টিফিকেট কোর্স ইন জার্নালিজম। প্রকাশিত বই : আগলে পড়াও এক (কাব্য সংগ্রহ), ধুপ উদাস হে (কাব্য সংগ্রহ), শক্তিপুঞ্জ অটলবিহারী বাজপেয়ী (জীবনযাত্রা), পঞ্জাব কী শ্রেষ্ঠ হিন্দী কহানিয়াঁ (সম্পাদিত গল্প সংগ্রহ), অ্যায় বতন তেরে লিয়ে (গবেষণা গ্রন্থ) বয়ান দর্জ হো (আত্মকথা)। পুরস্কার : অরবিন্দ সাহিত্য পুরস্কার (মুম্বাই), দিশা সাহিত্যমঞ্চ (পাঠানকোট), পাঞ্জাব কলা সাহিত্য অ্যাকাদেমী (জলন্ধর), কাব্য কৌস্তভ (গোয়ার রাজ্যপাল কর্তৃক), পাঞ্জাব সাহিত্য কলা মঞ্চ (লুধিয়ানা)। যোগাযোগ : WG 119 ISLAM GANJ. JALANDHAR. Punjab. Phone : 236776

তেজিন্দর গুজরাল : জন্ম : ১লা জানুয়ারী ১৯৫০, সাংগ্রুর,পাঞ্জাব। শিক্ষা : বি এ। ইতিমধ্যে দুটো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত। যোগাযোগ : B-4/91. Astabal. Patida gatc, Sangrur-148001.

জোগিন্দর সিংহ নিরালা : জন্ম ১০ অক্টোবর ১৯৪৫ বাবনাঙ্গায়। এম. এ, পি এইচ ডি (পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে)। কাউনী স্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোম সায়েন্স কলেজ-এর ভাষার অধ্যাপক। হিন্দী ও পাঞ্জাবী দুই ভাষাতেই সমানভাবে গল্প লেখেন এবং সাহিত্য সমালোচনা করেন। এই গল্পটি ওর হিন্দী সংকলন 'বিখর রহা মানব' থেকে অনূদিত। B-11/744 Sahid Marg, Barnala, Dist : Sangrur.

কৃষণলাল গর্গ : জন্ম পাঞ্জাবের সাংগ্রুর জেলার ধুরী শহরে ১৩ এপ্রিল ১৯৪৩। শিক্ষা এম. এ (হিন্দী ও ইংরেজী) পেশা অধ্যাপনা এযাবৎ পাঁচটি গল্প সংগ্রহ, ছয়টি ব্যঙ্গ সংগ্রহ, চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া হিন্দীতে দু'টি গল্পসংগ্রহ এবং গুজরাতীতে একটি ব্যঙ্গ সংগ্রহ প্রকাশিত। হাসিমজা ও অরণ্য সংক্রান্ত চারটি গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজী থেকে বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন গল্পের জন্যে নাগমণি পুরস্কার, লাভ সিংহ চত্রিক পুরস্কার, বলজীত চরেরবী পুরস্কার পেয়েছেন। ঠিকানা Gali no-9 Kishanpura Near VN Model School. Moga. Punjab.

দেব ভরদ্বাজ : সম্পূর্ণ নাম দেবরাজ ভরদ্বাজ। জন্ম ১৯৪৮-এ গুরুদাসপুর জেলার মাহার-এ। তেরটিরও বেশি মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা। যেগুলির মধ্যে ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস — সবই রয়েছে। এছাড়া সাতটি বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করার গৌরব অর্জন করেছেন। মে, ১৯৯২ সালে তার নৃত্যনাটক 'সারে কারনান দা করণ' চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন শহরে মঞ্চস্থ হয়েছে। 'কাফলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল' নামে শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। যোগাযোগ: House No 3437, Sector 46-C. Chandigarh-47. Phone : 0172-605783

জস্বীর ভুল্লর : জন্ম ১৯৪১ সালেব ৪ঠা অক্টোবর। পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ। লোকগীতি নিয়ে স্নাতক। এগারোটি গল্প গ্রন্থ, পাঁচটি উপন্যাস, সাতটি শিশু পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়াও দুটি অনুদিত বা সম্পাদিত গ্রন্থের প্রণেতা। এগারোটি তথ্যচিত্র ও টিভি ফিল্মের নির্দেশক। ভাই বীর সিংহ গলপ পুরস্কার (১৯৭৪), সাহিত্য সমীক্ষা বোর্ড পুরস্কার (১৯৭৭), নাগমণি পুরস্কার (১৯৮৩), হান্সিবল সাহিত রতন পুরস্কার (১৯৯০), চাচা নেহরু শিশু সাহিত্য পুরস্কার ও ডঃ এম এস রণধাওয়া পুরস্কারে ভূষিত। ২৩ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সৈনিক এই অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এখন 582, Phase 3-A. SAS Nagar (Mohali), Dist : Ropar. Punjib. Pin : 160059. Phone : 0172/671241.

কাশ্মীর সিংহ পন্নু : জন্ম : ৩রা নভেম্বর ১৯৫০ গুবদাসপুর জেলার রামপুর তঙ্গবাড়া গ্রামে। শিক্ষা : বি এ, পেশা : পাঞ্জাব সরকারের সচিবালয়ে অধীক্ষক। গল্প সংগ্রহ (১) গুমীআঁ হোইয়াঁ চাবীআঁ (২) হাদসেআঁ দে আর-পার (৩) সজাবটী খিডোনা। পুবস্কার : সন্ত অমরীক সিংহ পুনী, মুখ্য সচিব, পাঞ্জাব সরকার দ্বারা বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে ১৯৯৫ সালে সম্মানিত। যোগাযোগ Kothı no-876. Phase-10 SAS Nagar. Mohalli. Dist · Ropar. Punjab.

ভগবন্ত রসুলপুরী : পাঞ্জাবের জলন্ধর সন্নিকটস্থ ধবমপুর গ্রামে ১৯৭০ সালের ১০ ই মে জন্ম। ইতিমধ্যে ওর দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত। ইদানীং 'সুর সাঞ্ঝ' নামক একটি সংগীত বিষয়ক পাঞ্জাবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। যোগাযোগ. Vill : Dharampur. P O Khambra Dist : Jalandhar. Pin - 144026, Punjab.

বিন্দর বাসরা : জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ জলন্ধরে। পাঞ্জাবী দৈনিক 'আজ দা আওয়াজ'এর সাহিত্য সম্পাদক। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ দুটি। পাঞ্জাবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গল্পকার। যোগাযোগ : Jandiali. P. O Jamsher. Jallandhar-20

বলবীর পরওয়ানা : জন্ম · হোসিয়ারপুর পাঞ্জাব। ১৭ মার্চ ১৯৫৭। একটি গল্প সংগ্রহ, একটি অনুগল্প সংগ্রহ (সম্পাদিত) একটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। পাঞ্জাবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গল্পকার। যোগাযোগ : Sub-Editor. Naya Jamana. Rail Road. Jallandhar. Punjab.

জোগে ভঙ্গল : পাঞ্জাবের নবাঁশহর জেলার ভঙ্গলকলাঁ গ্রামে জন্ম ১০ই অক্টোবর ১৯৫৪, পাঞ্জাবী এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে এম এ, পেশা : স্কুলে কেরানী। তিনটি কাব্য সংগ্রহ ও একটি একাংকী সংগ্রহ। ভাষাবিভাগ পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে তিনবার ওর একাংকী পুরস্কৃত হয়েছে। যোগাযোগ Vill. Bhangal Kalan. Sahlo, Nawajshahar. Punjab Pin-144421

তলবিন্দর সিংহ : জীবন আর বিড়ম্বনার সংঘর্ষ নিয়ে লেখা এই গল্পটি ১৯৯৭ সালে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কহানী পঞ্জাব' এর পক্ষ থেকে ঐ বছরের এস এস ভট্টল পুরস্কার পেয়েছে। লেখক তলবিন্দর

সিংহ ১৯৫৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী উত্তরপ্রদেশের দেহরাদুনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবী ও অর্থশাস্ত্রে এম. এ.। পেশায় সরকারী অডিটর। প্রকাশিত বই : লো হোণ তক (উপন্যাস : ১৯৮৭ইং), রাত চানণী (গল্প সংগ্রহ : ১৯৯২ইং), নায়ক কী মৌত (গল্প সংগ্রহ ১৯৯৭ইং) যোদ্ধে (উপন্যাস : ১৯৯৮ইং)। পুরস্কার : ভাষা বিভাগ পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে 'লো হোণ তক' উপন্যাসের জন্যে ১৯৮৯ সালের নানক সিংহ পুরস্কার পেয়েছেন। লোক লিখারী সভা, গুরুদাসপুরের নো, প্রি. সুজান সিংহ পুরস্কার পেয়েছেন 'রাত চানণী'র জন্যে। যোগাযোগ 61, Friends Colony, Majithha Road, Amritsar, Punjab.

মাখন মান : তরুণ পাঞ্জাবী গল্পকার মাখন মান ১৯৬১ সালে ১০ই মার্চ জলন্ধর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে পাঞ্জাব সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগে চাকরি করেন। ১৯৯৪ সালে ওর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'খৌলতে পানী' প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে তরুণ গল্পকারদের গল্পসংকলন 'বগতে পানী'-র সম্পাদনা করেন। ২০০০ সালে ওর হিন্দী গল্প সংকলন 'মৃত্যুদণ্ড' দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যোগাযোগ : E.S. 284, Mohalla Abad Pura, Jalandhar City, Punjab. Phone-276953.

মনমোহন কৌর : জন্ম : ৭ই মার্চ ১৯৫৪, পাটিয়ালায়। শিক্ষা : এম এ, বি এড, ডিপ্লোমা ইন পাবলিক রিলেশনস অ্যান্ড অ্যাডভারডাইজিং। পেশা : পাঞ্জাব বিজলী বোর্ডে সিনিয়র সহায়ক। চারটি গল্প সংগ্রহ দুটি কবিতা সংগ্রহ একটি উপন্যাস, একটি আত্মজীবনী ও একটি অনুগল্প সংগ্রহের প্রণেতা। যোগাযোগ : 586 E Sirhind Road, Azad Nagar, Patiala, Punjab -147001, Phone 0175/220448.

প্রেম গোরখী : জন্ম ১৯৫৫, শিক্ষা : পাঞ্জাবী ভাষায় জ্ঞানী। পেশা : সাংবাদিকতা, সহায়ক সম্পাদক, পাঞ্জাবী ট্রিবিউন, চন্ডীগড়। গল্প সংগ্রহ : মিট্টী রঙ্গে লোক, জীবন-মরণ, অর্জুন সফেদীওয়ালা। উপন্যাস : তীতর লম্বী জুহ, আত্মকথা গ্যার হাজির আদমী (প্রথম ভাগ)। পুরস্কার · কথা পুরস্কার, প্লাস মঞ্চ পুরস্কার, ভাইবীর সিংহ কথা পুরস্কার, জনসাহিত্য অ্যাকাদেমী পুরস্কার, ডাঃ রবীন্দ্র রবি পুরস্কার ও নাগমণি পুরস্কার। যোগাযোগ : 305, Sector-29, Chandigarh.

বুটা সিংহ চৌহান : পাঞ্জাবের সাংগ্রুর জেলার তাজো গ্রামে ১৯৬৩ সালের ১৪ নভেম্বব জন্ম। শিক্ষা : মেট্রিক ও জ্ঞানী। তিনটি কাব্য সংগ্রহের প্রণেতা এই কবি ইদানীং ভাল ভাল গল্প লিখছেন। যোগাযোগ · Shahid Bhagat Singh Nagar, Nanakgar By Pass, Barnala -148101

রাজীব শেঠ : জন্ম ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ (অমৃতসর)। শিক্ষা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ, পেশা ভাষা পরীক্ষক, সেনা মুখ্যালয়, রক্ষা মন্ত্রণালয়, নতুন দিল্লী। প্রকাশিত বই নেই। বেশ কিছু গল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৮ থেকে আকাশবাণী জলন্ধরে বেশ কিছু গল্প পাঠ করেছেন। যোগাযোগ : C/o Smt. Vinita Seth, Nabodaya Vidyalaya. Mothuka, Tingaon, Ballamgarh (Faridabad) Haryana-121101, Phone-0129-209216

আজমের সিদ্ধু : শিক্ষা বি এস সি, এম এ (পাঞ্জাবী), বি এড। পেশা অধ্যাপনা। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : নচিকেতা কী মৌত (১৯৯৮), প্রবন্ধ গ্রন্থ : চমৎকারা দী দুনিয়া (২০০০), সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ : নবক কুন্ড (১৯৯৭), সম্পাদিত পত্রিকা : বিজ্ঞান জ্যোতি (ত্রৈমাসিক)। যোগাযোগ : C/o. Jandey Hair Dressers, Chandigarh Road, Nawashahar-144514, Punjab

দেশরাজ কালী : ১৯৭২ সালের ১৬ই মার্চে জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেছেন। ১৯৯৫ সালে তার প্রথম গল্প সংগ্রহ 'চানন দী লীক' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবী পাঠকমহলে

সাড়া পড়ে যায়। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গল্প সংগ্রহ 'কথকলী'। এছাড়া 'বারহ বাৎ' ও 'প্রাপী রুহ' নামে দুটি উপন্যাস যথাক্রমে 'নয়া জমানা' ও 'অকালী' দৈনিক পত্রের রবিবারের পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। গদর পার্টির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার ফলস্বরূপ এখন জলন্ধরস্থিত দেশভগত ইয়াদগার হল ও গবেষণাগারের মাসিক মুখপত্র 'বীরসা' ও 'Heritage' এর সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন। Address : Vill : Meethapur, Jalandhar, Punjab.

কুলদীপ সিংহ বেদী : পাঞ্জাবের জলন্ধরে ১৯৫১ সালের ২৫শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি গল্প সংগ্রহ ও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত। হিন্দী ভাষায় একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশের পথে। ১৯৭৪ সাল থেকে বিভিন্ন পাঞ্জাবী দৈনিকে সহ-সম্পাদক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে কাজ করছেন। যোগাযোগ : 12. Basant Nagar. Sodal Road. Jalandhar - 144004. Phone 0181/295392.

অজয় শর্মা : ১৯৬০ সালের ৩১শে আগষ্ট জলন্ধর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় চিকিৎসক। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ একটি। যোগাযোগ : 24. Madhuban Colony. Jalandhar City. Punjib

বীনা ভার্মা : পাঞ্জাবের মানসা জেলার বুদলাডা গ্রামে ১৯৬০ সালের ২রা অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ, বি. এড, ডিপ্লোমা ইন সোস্যাল সার্ভিস। 'মূল দী তী বী' নামক একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং লন্ডনের ব্রিটিশ সোস্যাল সার্ভিসেসে চাকরি সূত্রে প্রবাসী। সেখান থেকেও পাঞ্জাবী সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন। যোগাযোগ : Desh Pardesh Heakly. Southal. U K

কেসরা রাম : হরিয়ানার সিরসা জেলার তলওয়াড়া খুর্দ গ্রামে ১লা জানুয়ারী ১৯৬৬। শিক্ষা হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে এম এ, সাংবাদিকতা ও জনসঞ্চারে ডিগ্রী, পেশা : সরকারী কর্মচারী, পাঞ্জাবী ভাষায় একটি গল্প সংগ্রহ ও একটি কাব্য সংগ্রহ, হিন্দী ভাষায় একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত। Qtr No. 2. Telephone Exchange Premises. Sangrur - 148001. Punjab. Phone - 01672/33345 (R)